ISSN 2349-7343

সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ২০১৯

সম্পাদক

সৌমেন রক্ষিত

পত্রিকা দপ্তর

হরিগ্রাম, পোঃ-কাঁটাপাহাড়ী

বাঁকুড়া-৭২২১৩৬, পশ্চিমবঙ্গ

সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ২০১৯

ISSN 2349-7343

সম্পাদক : সৌমেন রক্ষিত

প্রচ্ছদ : দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্ষরবিন্যাস : স্বরলিপি

সম্পাদকীয় দপ্তর
'স্বরলিপি'
দামোদরপুর, পোঃ ভাগাবাঁধ, বাঁকুড়া-৭২২১৪৬
পশ্চিমবঙ্গ, ফোন- ৯৪৭৭৮৯৫৪৪৮
ই-মেল: sreejanipotrika@gmail.com

১২৫ টাকা

সূ চি প ত্র

প্রসঙ্গ : বাঁকুড়া

ক্রোড়পত্র

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা ও পাশ্চাত্য অনুষঙ্গ

সম্পাদকীয়

....

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর পুনরায় প্রকাশ পেল সৃজনী-সাহিত্য সন্ধানে। সাহিত্যের আঙিনায় কতটা এর গুরুত্ব তা সময় হয়তো বলবে, তবে সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলির একান্ত চাওয়া-পাওয়ার জায়গায় সৃজনী একটা অবদান রেখেই যায়। এবারের সংখ্যা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রকাশ পেল। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা ও পাশ্চাত্য অনুষঙ্গকে ক্রোড়পত্র করে এই সংখ্যার একটি সুনির্দিষ্ট পথ চলার প্রচেষ্টা রাখা হয়েছে। লেখা পেতেও বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে। কিছু পুরানো লেখাও পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। নির্দিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট লেখার অভাব মনকে সময়ান্তরে বিষণ্ণও করেছে। ফলে জ্ঞানত কিছু ত্রুটি থেকে গেল। পরবর্তী সংখ্যার জন্য আরও সচেতন হওয়ার অবকাশ থেকে যায়। তা সত্ত্বেও নতুন এটাই যে, সৃজনী প্রকাশিত হতে পেরেছে নবরূপে, নবকলেবরে।

এই প্রকাশে অনেক মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান আমাদের কৃতার্থ করে। বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। লেখকদের জানাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

খ্যাতকীর্তি শিল্পী ও নীরব কর্মযোগী রথীন্দ্রনাথ

স্বপনকুমার ঘোষ

দেশের বিশিষ্ট শিল্পসাধক, কৃষিবিজ্ঞানী, উদ্যানবিদ এবং প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১) তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর সার্বিক উন্নয়নের কাজে একজন 'নেপথ্যচারী মানুষ'হিসেবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে তাঁতের কাজে, দারুশিল্পে, চামড়ার কাজে যে দৃষ্টিনন্দন শিল্পশৈলী তৈরি হয়েছে তার অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন তিনি। রথীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বিজ্ঞানী, তাঁর মনটা ছিল স্বপ্নসন্ধানীর।

তিনি ছিলেন একজন প্রয়োগমুখ্য শিল্পী। ধীরে ধীরে তিনি দৈনন্দিন জীবনযাপনে শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর আপন বৈশিষ্ট্যে এবং অভিনবত্বের গুণে। তিনি প্রাত্যহিক জীবনযাপনের শিল্পকে সহজ, দৃষ্টিনন্দন ও সচল করে তুলেছিলেন আসবাব-স্থাপত্যে, পরিবেশ নির্মাণে আর শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক সবুজিমার সুচারু বিন্যাসে। ল্যান্ডস্কেপিং এবং গ্রিনস্কেপিং-এর কাজে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় সাধনে তিনি ছিলেন একজন অনন্য ব্রতী শিল্পী।

রুচি–যে কত উন্নত, মার্জিত ও পরিশীলিত হয়ে উঠতে পারে ও তাঁর আদর্শ ও ঐতিহ্য আমাদের কাজে স্থাপিত হয়েছে। আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্মে তিনি

যেমন অসামান্য দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাক্ষর রেখেছেন, তেমনি আবার শান্তিনিকেতনের মঞ্চসজ্জায় তাঁর অবদান অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত কর্মজীবন, সাহিত্য, বিদেশ-ভ্রমণ, পল্লি পুনর্গঠন ও সমবায় ইত্যাদি নিয়ে আজও গবেষণার অন্ত নেই। সেকালে, তিনি ভাবীকালের প্রজন্মের কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, আঁকা ছবি, ফটোগ্রাফ–সবমিলিয়ে গবেষণাকর্মের প্রাথমিক উপাদান সবকিছুই সংগ্রহ বিন্যস্ত করে রেখেছিলেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও নানান পত্র-পত্রিকায় কবির সম্পর্কে লেখার ক্লিপিং দিনের পর দিন, যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করবার কাজে আন্তরিকভাবে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি নিরলসভাবে জীবনভর এ সব কিছুরই সংরক্ষণ করেছিলেন যথাযথভাবে।

মনে আছে, ভুবনডাঙ্গায় ‘গবেষণার কারখানা’-তে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলাম রবীন্দ্র জীবনী লেখবার প্রেরণা পেয়েছিলেন কিভাবে। প্রভাতকুমার বলেছিলেন : বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে বসে যখন কাজ করতাম, তখন ঠিক আমার পেছনে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকার বাঁধানো ক্লিপিংগুলো সাজান থাকত। দেখতাম আর ভাবতাম–এগুলোর সদ্ব্যবহার করব না? এই ছিল আমার রবীন্দ্র জীবনী লিখবার মূল প্রেরণা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্র গবেষণা ও চর্চার জন্য রথীন্দ্রনাথের এইসব বিশাল সংগ্রহ প্রভাতকুমারের রবীন্দ্র জীবনী (চার খণ্ডে) রচনার বড় সহায়ক হয়েছিল, সন্দেহ নেই। কবিপুত্র প্রয়াণের পর, একটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রথীন্দ্রনাথের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গে অতি স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন : “এগুলি ছিল বলে ‘রবীন্দ্র জীবনী’র অনেক অংশ লেখা সহজ হয়েছিল।”

রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবীর দ্বিতীয় সন্তান জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম জোড়াসাঁকোতে ১৮৮৮ সালের সাতাশে নভেম্বর। তাঁর ছেলেবেলা ও কৈশোরের রঙিন দিনগুলো অতিবাহিত হয়েছে ঠাকুরবাড়ির এক সদাচঞ্চল সাংস্কৃতিক পারিবারিক পরিমণ্ডলে। ভাইবোনদের সঙ্গে নানা গল্পগুজব, গানবাজনা আর খেলাধূলার মধ্য দিয়েই কেটেছে তার কৈশোর। পুত্রকে নিয়ে বাবার ভাবনা চিন্তার শেষ ছিল না। কেবলমাত্র লেখাপড়া পঠন-পাঠন শুধু নয়, কবি তাঁর পুত্রের জন্য গানের চর্চা এবং এস্রাজ ও পিয়ানো শেখানোর জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

শিলাইদহে জমিদারির কাজ করবার সময় রথীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ছেলেমেয়েদের পড়াতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথের অন্তরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার কথা দারুণভাবে জেগেছিল। এ প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন : “আমাদের ভাইবোনদের পড়াতে গিয়ে, প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন কি করা যায় সে বিষয়ে তাঁর মনে নানারকম কল্পনা ঘোরাফেরা করত। এগুলিকে আকার দিতে গেলে একটি বিদ্যালয় চাই। তিনি স্থির করলেন, তিনি যেরকম বিদ্যালয় গড়ে তুলতে চান তার পক্ষে শান্তিনিকেতন উপযোগী স্থান। কলকাতায় এসে মহর্ষিদেবকে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন। মহর্ষি শুনে খুশি হলেন, বিদ্যালয়টি শান্তিনিকেতন আশ্রমেরই অঙ্গ হবার অনুমতি দিলেন।”

সমস্ত রকম বাধা বিপত্তিকে জয় করে কবি তাঁর আন্তরিক ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। পত্নীর গয়না বিক্রি করে, পিতামহের ব্যবহৃত ঘড়ি, এমনকী পুরীর বাড়ি বিক্রি টাকা সংস্থান করে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এক বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাত্র পাঁচ জন ছাত্রকে নিএ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম পাঁচ জন ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা পর্বে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীও ছিলেন শান্তিনিকেতনে। রথীন্দ্রনাথ কিন্তুই থাকতেন ছাত্রাবাসে, কবির ইচ্ছাতেই তাঁকে থাকতে হয়েছিল। এটা স্বাভাবিক যে, পুত্র কাছে না থাকায় মা মনে মনে কষ্ট পেতেন। বিদ্যালয়ের ছুটির দিনে কেবলমাত্র রথীন্দ্রনাথকে নয়, ছাত্রাবাসের সব ছাত্রদের নিজে রান্না করে খাওয়াতেন রবীন্দ্র-পত্নী মৃণালিনী দেবী।

সেই যে একেবারে তাঁর ছেলেবেলায় আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে এসেছিলেন তখন থেকেই আশ্রম-গুরু রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচেছিলেন সেই ১৯৪১ সাল পর্যন্ত, রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেবের প্রতিটি কাজ ও পরিকল্পনার যথার্থ রূপায়নের 'ছায়াসঙ্গী' ছিলেন। প্রচ্ছন্নভাবে নিজে আড়ালে থেকে নীরবে নিঃশব্দে বাবার সমস্ত নির্দেশ পালন করেছেন কোনোরকম প্রতিদান বা প্রত্যাশার কথা না ভেবেই।

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্তির পর কলকাতার একটি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। এরপর কবি রথীন্দ্রনাথকে মার্কিন দেশে পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ পাঠ নেবার জন্য। কৃষিবিজ্ঞানী হয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। কবির গ্রাম উন্নয়ন ও পল্লি পুনর্গঠনের পরিকল্পনাকে সফল করে তোলবার কাজে 'ঐতিহাসিক পল্লী উন্নয়ন সংস্থা' শ্রীনিকেতনে প্রতিষ্ঠার কাজে রবীন্দ্রনাথ ও এলমহোর্স্টের সহযোগী ছিলেন কালীমোহন ঘোষ ও কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ।

১৮৯৭ সালে রথীন্দ্রনাথের নয় বছর বয়সে উপনয়ন হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় শান্তিনিকেতনে। এই উপনয়নকে ঘিরে দেশ-বিদেশের বহু পণ্ডিত মানুষজনের সমাগম ঘটেছিল। উপনয়ন উপলক্ষে মহর্ষিদেবের নির্দেশ ছিল যে, উপনিষদের মন্ত্র আবৃত্তি করে শোনাতে হবে। রথীন্দ্রনাথ খুবই কুণ্ঠিতভাবে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে আবৃত্তি করেছিলেন, তা সকলেরই অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক সৃষ্টির যজ্ঞে রথীন্দ্রনাথ আরও একটি মাত্রা যোগ করেছিলেন। তিনি এই বাড়িতেই কর্ণধাররূপে অথচ অন্তরালে থেকে দেশের আধুনিক শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান 'বিচিত্রা ক্লাব' গড়ে তুলেছিলেন।

পুত্র রথীন্দ্রনাথকে গড়ে তোলবার জন্য পিতা রবীন্দ্রনাথের প্রয়াস ছিল অন্তহীন। প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম ও নানা ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও কবির কখনোই একাজে কোনোরকম শিথিলতা ছিল না। ধনীর সন্তানের স্বাচ্ছন্দ বা তদানীন্তন প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতিতে মানুষ হওয়ায় স্ব-বিরোধী মনোভাব নিয়ে সংবেদনশীল পিতা

রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে সব মিলিয়ে একজন 'মানুষ' হিসেবে গড়ে তোলবার কাজে সফলতা লাভ করেছিলেন। ঠিক তেমনভাবেই গড়ে উঠেছিলেন রথীন্দ্রনাথ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছেন, তখন রথীন্দ্রনাথ পিতৃদেবের পাশে আছেন। **১৯১৮** সালের এগারই নভেম্বর যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়। সেই বছরের বাইশে ডিসেম্বর, আটই পৌষ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। পিতৃদেবের এই বিশদ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদানের কাজে একাদিক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের নানান পরিকল্পনা ও কর্মধারায় একেবারে উৎস থেকে অন্ত পর্যন্ত তিনি নীরবে আত্মনিয়োগ করে গেছেন। তারপর প্রতিষ্ঠা হয় বিশ্বভারতী।

স্বাধীন ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে **১৯৫১** সালে ভারত সরকার বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। রথীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্যর দায়িত্ব পান। বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পেছনে রথীন্দ্রনাথের যে আন্তরিক উদ্যোগ ও বিশাল প্রচেষ্টা ছিল, তা আজ হয়তো অনেকেরই অজানা।

উপাচার্য থাকাকালীন প্রতিদিন সকালে নিয়ম করে যন্ত্রপাতি নিয়ে তিনি শিল্পসাধনা করতেন। তিনি বরাবরই ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ। কর্মীমণ্ডলীর এক সভায় রথীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "জন্মেছি শিল্পীর বংশে, শিক্ষা পেয়েছি বিজ্ঞানের, কাজ করেছি মুচির আর ছুতোরের।"

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভারশ্মির আড়ালে চাপা পড়েছেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ, একথা স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। রথীন্দ্রনাথ অবশ্যই রবীন্দ্র-পুত্র হিসেবেই স্মরণযোগ্য, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিশৈলী ও গুণবৈচিত্রও কম নয়। রথীন্দ্র-প্রতিভার অন্যান্য দিকগুলির দিকে আমরা ফিরে তাকাব। শিল্পচর্চা, সাহিত্যচর্চা, উদ্যানচর্চা, বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে প্রশাসনিক দক্ষতায় এক বহুমুখী প্রতিভার সৃজনশীল অথচ ব্যতিক্রম মানুষ ছিলেন।

শ্রীনিকেতনের অন্যতম রূপকার, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃষিবিজ্ঞানী ও রবীন্দ্র সহযোগী লেনাউ নাইট এলমহার্স্ট রথীন্দ্রনাথকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন : "রথীদা-ও নিজের হাতে কাঠের কাজ করতে ভালোবাসতেন। তিনি একজন কুশলী কারুশিল্পী ছিলেন। তাঁর আঁকা যারা দেখেছেন, তাঁর রচনা পড়েছেন, তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি, তাঁর প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করবেন। উত্তরায়ণের উদ্যানও তাঁর এক বিশেষ সৃষ্টি। তাঁকে ঘিরে সেকালের অনেক স্মৃতি আজ মনে পড়ছে। নানা উৎসব অনুষ্ঠান টেনিস খেলা, দীনেন্দ্রনাথের চায়ের আসর, কলাভবনের ছাত্রদের বনভোজনে আগুন পোহানো, চন্দ্রালোকিত রজনীতে দুমকা পাহাড় অভিযান–সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে শ্রীনিকেতনকে, প্রথম থেকে গড়ে তোলবার দিনে সমিতিতে আলাপ-আলোচনা।"

শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন-বোলপুর তথা কর্মী-শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রী-আশ্রমিকরা রথীন্দ্রনাথের মতন একজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের সান্নিধ্য লাভ করতে পেরেছিলেন। শৈশব থেকেই চারু ও কারু শিল্পের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মেছিল। তেমনি আবার ছেলেবেলা থেকেই রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সখ্যতা গড়ে ওঠে।

নিজের হাতে নিয়মিতভাবে বাগান করেছেন। আশ্রমের অনেক গাছপালা তাঁর নিজের হাতে লাগানো। উত্তরায়ণের পরিবেশ ও বাগান তিনি নির্মাণ করেছেন।

কারুশিল্পের কাজে রথীন্দ্রনাথ ছিলেন অনন্য সাধারণ। দারু ও কারু–এই শিল্পে তিনি তাঁর স্বকীয়তা, অভিনবত্ব, শিল্প-শৈলী ও নান্দনিকবোধ সমাদৃত হয়েছে বিজ্ঞানের কাছে। এসব আজও আমাদের দারুণভাবে প্রাণিত করে, অভিভূত করে। কাঠের ওপর 'ইনলে'-র কাজ তাঁর অসাধারণ কীর্তি, ভারতে তিনিই এটি প্রবর্তন করেছিলেন। রথীন্দ্রকৃত কাঠখোদাইয়ের শিল্প নিদর্শনগুলি সত্যিই যার তুলনা মেলা ভার।

আসবাবপত্র নির্মাণে আধুনিক ডিজাইন, সৌখিন, সুন্দর সাজসজ্জার সঙ্গে সঙ্গে অল্প পরিসর জায়গায় প্রয়োজনমাফিক কাঠের জিনিসপত্র রাখবার বিন্যাস ও প্রকৃত প্রয়োগের প্রবর্তনে রথীন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রপথিক। তিনি তাঁর উদ্ভাবন শক্তি দিয়ে ডেস্ক, বসবার চেয়ার, ডিভান, পোর্টেবল খাবার টেবিল–এধরনের আসবাবপত্রে আধুনিক ভাবনা, শিল্পশৈলী ও রুচিতে এক অন্যমাত্রা এনে দিয়েছেন। শ্রীনিকেতনে সুরুল কুঠিবাড়িতে কবিকক্ষে এর নিদর্শন আছে। তাঁর তৈরি ল্যাম্প-স্ট্যান্ড, ঘড়ি-স্ট্যান্ড, দোয়াতদান, সিগারেট-কেস প্রভৃতি জিনিসের নিদর্শন উত্তরায়ণে রথীন্দ্র সংগ্রহশালায় রাখা আছে।

একসময় অসুস্থতার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজনে রথীন্দ্রনাথকে বিদেশের একটি নার্সিংহোমে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবার পর তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন লেদার ক্রাফটে–চর্মশিল্পের কাজে। আমাদের দেশে তিনি প্রথম চামড়ার এক বিশেষ ধরনের সৌখিন কাজের চর্চা প্রবর্তন করেছিলেন শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে। যন্ত্রপাতি এসেছিল বার্মিংহাম থেকে। সেকালে ছাত্রছাত্রীরা এই নতুন ধরনের শিল্পকর্মে প্রাণিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে 'শিল্প সদন' রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী প্রতিমা দেবী পরম যত্নের সঙ্গে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলেন। প্রথমদিকে এই বিভাগটির জন্য তিনি নিজে প্রচুর টাকা ব্যয় করেন। বলতে গেলে, তাঁদের দুজনের প্রবল উৎসাহ ও আগ্রহে শ্রীনিকেতনে চামড়া, বাটিক ও মৃৎশিল্পের কাজ শুরু হয়। শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। ব্যবসায়িক দিক থেকে নানান সম্ভাবনা জেগে উঠেছিল।

ছবি আঁকাতেও রথীন্দ্রনাথ অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর আঁকা ছবিগুলিতে প্রকৃতির এক বিশেষ অস্তিত্ব লক্ষ করার মতন। চিত্রগুলিকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে এক স্বাতন্ত্রের পরিচয় মেলে। তিনি অনেক ফুলের ছবি এঁকেছেন। তাঁর আঁকা ফুলের ছবিগুলি নানান দিক থেকে বৈচিত্রময়। প্রতিটি ফুলের ছবিতে রঙের অসামান্য ব্যভারে তা আমাদের কাছে জবন্ত ও বর্ণময় হয়ে আছে।

নিজেকে প্রচ্ছন্নভাবে আড়ালে রেখে কিভাবে বই লিখতে হয়, তার আদর্শ মনে হয় রথীন্দ্রনাথের লেখা 'পিতৃস্মৃতি' বইটি, যা আসলে On the Edges of Time বইটির অনুবাদ। তিনি দু'খণ্ডে অনুবাদ করেছিলেন অশ্ব ঘোষের বুদ্ধচরিত। বিজ্ঞান বিষয়ে দুটি বই লিখেছেন 'প্রাণতত্ত্ব' ও 'অভিব্যক্তি'। এই দুটি বইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে খ্যাতকীর্তি রবীন্দ্র

গবেষক পুলিনবিহারী সেন লিখেছেন : ‘‘বাংলাদেশে আজ একটি প্রবল তর্ক, বাংলায় বিজ্ঞান শেখানো যেতে পারে কিনা। রথীন্দ্রনাথ যদি অভিনিবেশ সহকারে উদ্‌যোগ করতেন তবে তাঁর অধীত বিজ্ঞান বিষয়কে বাংলা ভাষায় বহুজনবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করে প্রকাশ করতে পারতেন।’’

পিতৃদেব রবীন্দ্রনাথের নির্দেশমত পুত্র রথীন্দ্রনাথ প্রশিক্ষিত হয়ে নিজেকে জীবনে গড়ে তুলেছিলেন। পিতার প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর আনুগত্য ছিল অপরিসীম। তাঁর সমগ্র জীবনটাই ছিল রবীন্দ্রময়। বরাবর আড়ালে থেকেই কবির স্বপ্ন ও শিক্ষা দর্শনকে বাস্তবায়িত করবার জন্য নিরন্তর প্রয়াস করেছেন। বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের এই বিশাল কর্মকাণ্ডে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান স্থপতি।

১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হবার পর তিনি ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রধান উপাচার্য। রথীন্দ্রনাথ ছিলেন শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর একজন যোগ্য পরিচালক। প্রতিষ্ঠানের নানা সংকটে তিনি ছিলেন নিঃশব্দ রূপকার। এটা ছিল তাঁর চরিত্রের বহিরঙ্গ। সময়-সুযোগ বের করে তিনি নিয়মিত ব্যাপৃত হতেন শিল্পচর্চায়—যা তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়। এই দুইয়ের সম্মিলন সচরাচর দেখা যায় না। রবীন্দ্র প্রয়াণের পর শান্তিনিকেতনে ‘রবীন্দ্র ভবন’-কে সংগঠিত করবার পেছনে রথীন্দ্রনাথের অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

শিল্প-সাধকের স্মরণে, শিল্পীর জন্মশতবর্ষ বছরে **১৯৮৮** সালের সাতাশে নভেম্বর শ্রীনিকেতনের শিল্পসদনে ‘রথীন্দ্র মেলা’-র সূচনা হয়। রথীন্দ্রনাথ এসেছিলেন ছেলেবেলায়, একেবারে এই আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে এবং রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন পিতৃদেবের সমস্ত কাজে ছায়ার মতন অনুগত থেকেছেন। কোনোরকম প্রতিদান তিনি চাননি এবং পানও নি। বিশ্বভারতীর এই অক্লান্ত সেবক রথীন্দ্রনাথ নিজেকে গোপন রেখেছিলেন কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। বিশ্বভারতীর উপাচার্যর পদ থেকে অব্যহতি নিয়েছিলেন মনে মনে অনেক দুঃখ আর অভিমান নিয়ে। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ বছরে **১৯৬১** সালের ৩ জুন তিনি একেবারে নীরবে নিঃশব্দে চলে গিয়েছেন। রথীন্দ্রনাথের অনন্য ভূমিকার কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি আমাদের সম্যক মূল্যায়ন করবার একান্ত জরুরী কাজটি—আমরা যেন ভুলে না যাই।

রিপুজয়ী মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

"কামঃ ক্রোধো লোভো মদো মাৎসর্য এব চ।
শরীর স্থায়িনশ্চৈতে রিপবঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ।।"
অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ (অবিদ্যা), মদ্ (মত্ততা), মাৎসর্য (পরশ্রীকাতরতা)—এই ছয়টিকে শরীর-স্থায়ী রিপু বলে।

ষড়রিপু হল মানুষের জীবনের প্রধান শত্রু। শুধু ব্যক্তিজীবনেই নয়, ষড়রিপুর প্রভাবে সমগ্র মানবসমাজ হয় জর্জরিত ও কলুষিত। 'গীতা'য় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ থেকে মুক্ত, তিনিই ভগবানের প্রিয় ভক্ত তথা আত্মজ্ঞানী বা রিপুজয়ী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সেই রিপুজয়ী মহামানব। তবে তিনি অবতারপুরুষ হয়েও ষড়রিপুর প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পাননি। প্রত্যেকটি রিপুকে তিনি ঈশ্বরমুখী করে দিয়ে ঐশ্বরিক অনুভূতি লাভ করেছিলেন। তিনি নিজের জীবনে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কিভাবে ষড়রিপুর প্রভাব ঈশ্বরমুখী করে দিলে সুখে জীবনযাপন করা যায়। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন

: "ছয় রিপু একেবারে তো যাবে না ; তাই ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কামনা করতে হয়, লোভ করতে হয়, তবে ঈশ্বরে ভক্তি কামনা করতে হয়, আর তাঁকে পাবার লোভ করতে হয়। যদি মদ্ অর্থাৎ মত্ততা করতে হয়, অহংকার করতে হয়, তাহলে আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের সন্তান এই বলে মত্ততা, অহংকার করতে হয়।" নির্বোধ মানবের এসব কথা কর্ণে ঢোকে না।

মানুষের জীবনে প্রথম রিপু হল–কাম। কামজয় ভয়ংকর শক্ত পথ। অধিকাংশ মানুষই ভয়ে, সঙ্কোচে, ভদ্রতার কারণে ইন্দ্রিয়কে সংযত করে। আসলে 'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ'–সঙ্গ বা আসক্তি থেকে কামের সৃষ্টি হয়। কাম বলতে সমস্ত কামনা-বাসনাই বোঝায়। তবে ইন্দ্রিয় উপভোগ অর্থেই 'কাম' শব্দটির বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। মানুষের মনে এই কামানল দাউ দাউ করে জ্বলে। এটি সাধারণত স্বাভাবিক যৌন আবেগকে ভুলপথে পরিচালিত করে, ফলে মানুষ শরীর ও মনের সৃষ্টিশক্তি হারায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "কাম চলে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার! আমারই ছয়মাস পরে বুক কি করে এসেছিল! তখন গাছতলায় পড়ে কাঁদতে লাগলাম। বললাম, মা! যদি তা হয়, তাহলে গলায় ছুরি দিব।" তিনি আবারও বলেছেন, "ভগবদ্দর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। তাহলেও শরীর যতদিন থাকে, ততদিন একটু-আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না।" শ্রীরামকৃষ্ণের কাম ছিল। তাঁর প্রথম বাসনা ছিল ঈশ্বরদর্শন, আর দ্বিতীয় বাসনা ছিল লোকশিক্ষা। এছাড়া অন্য কোন বাসনা তিনি মনে স্থান দেননি।

মানুষের জীবনে দ্বিতীয় রিপু হল–ক্রোধ। ক্রোধ তমোগুণ থেকে উৎপন্ন ও নীচ প্রবৃত্তি সম্পন্ন। ক্রুদ্ধ মানুষ পাপ কাজ করে, গুরুজন ব্যক্তিকে হত্যা করে, অপরকে কর্কশবাক্য প্রদান করে অবমাননা করে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি পারে না এমন কোন কাজ নেই। মনীর সমস্ত শুভ গুণকে নষ্ট করে ক্রোধ পাশবিক করে তোলে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পড়লে চিন্তা ভাবনা করার শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। ফলে সে জীবনের সর্বোত্তম গুপ্ত রহস্যটা জানতে পারে না। আবেশের বশবর্তী হয়ে অসঙ্গত কাজ যেমন ঝগড়াঝাটি, মারামারি, খুনোখুনি, হত্যার মতো নৃশংস ঘটনাগুলির সূত্রপাত দেখা যায়। ক্রোধ তাই মানুষের প্রধান শত্রু।

শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রোধ ছিল। তিনি বহুদিন কঠিন সাধনার পরও যখন মাতৃদর্শন পাননি, তখন ক্রোধগ্রস্থ হয়ে মায়ের সামনে তিনি আত্মহননে উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, ক্রোধ যদি করতেই হয়, তবে ঈশ্বরের ওপর ক্রোধ করা ভাল। তাতে ঈশ্বরের কৃপা বর্ষিত হয়। ভগবানকে পাওয়ার জন্য ক্রোধ করা ভাল, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে ক্রোধ সত্যিই খুব খারাপ। কারণ আমরা সকলেই যে তাঁরই সন্তান। তিনি বলতেন, "উচ্চস্বরে ভগবানের নাম করলে ক্রোধ কমে যায়।"

মানুষের জীবনে তৃতীয় রিপু হল–লোভ। লোভের জন্য মানুষ সমস্ত পার্থিব জিনিসের ওপর দখল পেতে চায় এবং নিজেদের স্বার্থে অন্যের ওপর নিজের ক্ষমতা খাটাতে চায়। যে মানুষ লোভে পূর্ণ, সে কখনো সার্থকভাবে জীবনের পথ অতিক্রম করতে পারে না। কারণ যখন সে অন্যদের অধিকারকে খর্ব করে, তখন আসলে সে নিজের স্রষ্টার

সঙ্গেই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। লোভে মন অসংযত হয়, চরিত্রে সততা থাকে না এবং জীবন সর্বদা নীচ প্রবৃত্তিময় হয়ে থাকে। কথায় বলে, "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।" তবুও মানুষেরা ধনলোভী, বিষয়লোভী, যশলোভী, নারীলোভী হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের লোভ ছিল ঈশ্বরদর্শনের। জাগতিক লোভকে তিনি জয় করেছিলেন। মথুরবাবুর দেওয়া মূল্যবান কম্বল তিনি মুহূর্তের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলে অর্থকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছিলেন। এক মারোয়াড়ি ভক্তের প্রদত্ত দশ হাজার টাকা প্রণামী তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি শুধু একপথে ঈশ্বরদর্শন করে তৃপ্ত হননি, বিভিন্ন পন্থায় সাধনা করে ঈশ্বরদর্শন করেছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "কাম, ক্রোধ, লোভ–এসব জয় করলে তবে তাঁর কৃপা হয়, তাঁর দর্শন হয়।" হিতোপদেশে আছে, লোভ হতে ক্রোধের উদয় হয়, লোভ হতে কাম জন্মে, লোভ হতে মোহ ও বিনাশ উপস্থিত হয়, লোভই পাপের কারণ।

মানুষের জীবনে চতুর্থ রিপু হল–মোহ বা অবিদ্যা। অধিকাংশ মানুষই মোহগ্রস্থ। মোহ হল আসক্তির অপর নাম। মানুষ মোহে থাকে, কেউ কেউ সারাজীবন মোহাচ্ছন্ন থেকে হয়তো মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মোহ ভাঙ্গে। মনে রাখতে হবে এই জগৎটাই একটা মোহ, মরীচিকার পেছনে ছোটা মাত্র। মোহগ্রস্থ মানুষেরা হয় চরম স্বার্থপর। আমার স্ত্রী, আমার সন্তান, আমার বাড়ি, আমার জমি, আমার শরীর বলে মোহতেই অভিমান করে বেড়ায়। মোহ মানুষকে প্রলোভূত করে সমস্ত জীবনীশক্তি হরণ করে নেয়। মোহগ্রস্থরা তাই সর্বদা দুঃখ, যন্ত্রণা, শোক ও তাপ ভোগ করে। সহজেই নানা রোগ-ব্যাধিতে ভুগে কষ্ট পায়।

মোহ-মায়ার বশেই মানুষ 'আমি', 'আমার' করে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং কখনো 'আমি, 'আমার'শব্দ ব্যবহার করেননি। তাঁর জীবনদর্শন পাঠ করলে বোঝা যায়, তিনি মায়ামোহের কত ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, " 'আমি'যখন যায় না, তখন শালা থাক ঈশ্বরের দাস আমি হয়ে।" তিনি বলতেন, "মানুষের যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে, ততদিন সংসসার জলে পড়ে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খসলে–জ্ঞান হলে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে সংসারে থাকতে পারে।" মোহ-রোগকে দূর করতে হলে তাই সৎসঙ্গ, সৎশাস্ত্র অনুশীলন, সৎশিক্ষা ও সুসংস্কৃতি প্রয়োজন।

মানুষের জীবনে পঞ্চম রিপু হল–মদ বা অহংকার। অহংকার নেই এমন মানুষ বিরল। অহংকারী মানুষের অন্তরে খলতা, নীচতা, ক্রুরতা, নির্দয়তা, পাপের ভাগ বেশি থাকে। কথায় আছে, অহংকার পতনের মূল। মানুষের জীবনে উন্নতির পথে অহংকার বিশাল বাধার সৃষ্টি করে। অহংভাবের দোষে মানুষের লোভের পরিধি বেড়ে যায়। অহংদোষে মতিভ্রম দেখা যায়, যার ফলে অনুচিত কাজও ঠিক করা হয় না। অহংকারী মানুষেরা দেবদেবী, সাধু-সন্ন্যাসী, শাস্ত্র ও ধর্মকথায় বিশ্বাস করে না এবং সারা জগতকেই তারা মন্দ দেখে। টাকার অহংকার, জ্ঞানের অহংকার, মানের অহংকার, পদের অহংকার প্রভৃতি বহুবিধ অহংকার মানুষের শুদ্ধসত্ত্ব মনের ওপর একটি মোহের আচ্ছাদন ফেলে রাখে। এ থেকে মুক্ত না হলে পরিত্রাণের উপায় নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের অহংকার অবশ্যই ছিল। তবে সেটি ঈশ্বরদর্শনের অহংকার। শুধু নিজে ঈশ্বরদর্শন করেছেন—এই অহংকার নয়, অপরকেও ঈশ্বরদর্শন করাতে পারেন—এই অহংকারও ছিল। নরেনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরদর্শন করেছি। যেমন তোকে দেখছি, ঠিক সেইভাবে মা'কে দেখেছি। যেমন তোর সাথে কথা বলছি, ঠিক সেইভাবে মা'র সাথে কথা বলেছি।" নরেনকে ঈশ্বরদর্শন করাতে পারেন কিনা জানতে চাইলে তিনি গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, "অবশ্যই পারি। তুই দেখবি নি? তোর ওমন চোখ!" শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলতেন, "এমন ভাব রাখবে যে আমি ঈশ্বরের নাম করি, আমার আবার পাপ কি?" তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, জাগতিক বিষয়ে অহংকার না করে 'আমি ঈশ্বরের সন্তান'—এই অহংকার করা ভাল। অহংকার খর্ব করার অন্যতম উপায় হল সাধুসঙ্গ ও গুরুসেবা। সদগুরুর প্রাথমিক কাজ হল শিষ্যের অহংকারকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য আকৃতিতে কমিয়ে আনা। ভগবানের নামজপ, সৎগ্রন্থপাঠ করলেও মোহগ্রস্থ মানুষের মনের অহংকার কেটে যায়।

মানুষের জীবনে ষষ্ঠরিপু হল—মাৎসর্য বা ঈর্ষা। পরশ্রীকাতরতা হল মনে শান্তি না পাওয়ার বড় শত্রু। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির সবচেয়ে বড় পরিচয় হল, সে কখনো কারো সুখ-শান্তি দেখতে পারে না, কারো উন্নতি সহ্য করতে পারে না। সে পরের ক্ষতিসাধনেও সচেষ্ট হয়। পরপীড়ন ও পরনিন্দা হল ঈর্ষার মূল কথা। ঈর্ষা মনের নিয়মশৃঙ্খলা নষ্ট করে, যা একটি মানসিক রোগ। মন ঈর্ষায় পূর্ণ হলে যেমন সহজে নিদ্রা আসে না, তেমনি অনেক রোগ-ব্যাধিও তাদের শরীরে আসে। প্রথমেই ঈর্ষার বীজ নষ্ট করতে হয়। ঈর্ষার ভাব উদ্রেক হলে আগে তার সদগুণগুলি পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও আলোচনা করা উচিত। সেবা, সহানুভূতি ও ভালোবাসার ভাব বৃদ্ধি করলে ঈর্ষা আর থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন—একথা ভাবাই যায় না। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য হলেও তিনি একসময় ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি কেঁদে কেঁদে মায়ের কাছে অনুযোগ করতেন, "মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিস আমায় তবে কেন দেখা দিবিনে?" তাঁর এই অনুযোগকে সেই অর্থে ঈর্ষা বলা চলে না। কারণ তিনি সকলেরই গুণকীর্তন করতেন, কারো নিন্দা করতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছিলেন, "আমি ষোল আনা করেছি, তোরা এক আনা কর, তাতেই তোদের হবে।" আমরা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান। তাঁর কথায় বিশ্বাস করে কাজ করে যেতে হবে, সফলতা একদিন আসবেই আসবে। আধ্যাত্মিক ভাষায় এই সফলতা অর্জনকে বলা হয় সিদ্ধিলাভ করা। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "সিদ্ধিলাভ করলে কি দুটো শিং গজায়? তাদের দ্বারা মানুষের মনের পশুভাবের বিনাশ ঘটে, যার ফলে দেবত্ব প্রাপ্তি হয়।"

লিটল ম্যাগাজিন ও মফঃস্বলের লেখক লেখিকা
কৃষ্ণেন্দু পালিত

'লিটল ম্যাগাজিন' নামেই পরিচয় তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের। 'লিটল' অর্থাৎ ছোট মাপের পত্রিকা, প্রকাশিত হয় অনিয়মিত এবং অবশ্যই বিশুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে—যে সাহিত্য বাজার চলতি বাণিজ্যিক পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর। বাজার খাওয়ানো বা মুনাফা অর্জন নয়, নতুন কিছু সৃষ্টির উন্মাদনাই তার প্রাণশক্তি। বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে প্রথম লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে স্বীকৃত 'সবুজপত্র', তার আবির্ভাব সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, "এ পৃথিবীটা যথেষ্ট পুরনো, সুতরাং তাকে নিয়ে নতুন কিছু করা বড়োই কঠিন বিশেষত, এদেশে। যদি বহু চেষ্টায় নতুন করে তোলা যায়, তা হয় জলবায়ুর গুণে দু-দিনেই পুরনো হয়ে যায়, নয়ত পুরাতন এসে তাকে গ্রাস করে ফেলে।"

প্রমথ চৌধুরীর উক্তিটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যেই লিটল ম্যাগাজিনের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন আছে। পুরানো পৃথিবীর বিরুদ্ধে জেহাদ, নতুনকে আবাহন, পুরানো পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তোলার যে ক্রিয়াকর্ম শুরু হয় জনমানসে, বিশেষত নতুন প্রজন্মে, তার শিল্পরূপ, চিন্তন মননের নতুন নতুন উদ্ভাসন লিটল ম্যাগাজিন ধারণ করে, প্রচার করে। এখান থেকেই শুরু হয় তার প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা। লিটল ম্যাগাজিনের জন্ম

প্রক্রিয়ার মধ্যেই 'তৎকালীন' পুরানো পৃথিবীর বিরুদ্ধে একটা জেহাদ থাকে, সে যত মৃদুই হোক।

লিটল ম্যাগাজিন স্থিতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার মুক্তাঞ্চল। এখানে লেখক যেমন মত প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পান, বিষয় অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারেও তাকে যথোচিত স্বাধীনতা দেওয়া হয়। লিটল ম্যাগাজিনের লেখকেরা তাই বারবার সাহিত্যের প্রচলিত ছকগুলি ভেঙে দেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে লিটল ম্যাগাজিনের অবস্থান। আসলে লিটল ম্যাগাজিন করার পেছনে থাকে ব্যক্তিগত বা একদল বন্ধুর স্বতঃস্ফূর্ত সাহিত্য প্রয়াস, যাদের মধ্যে প্রতিবাদী মনোভাব কোন না কোন ভাবে কাজ করে। মানসিকতায় এঁরাও কোথাও না কোথাও এক সূত্রে বাঁধা। সেই সূত্র ধরেই সদ্যোত্থিত বিক্ষিপ্ত-চঞ্চলতা একটা জায়গায় সঙ্ঘত ও মূর্ত হয়।

২

বাঙালি সত্তায় আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে সাহিত্যচেতনা। হয়তো বাংলার জলবায়ু, ভৌগোলিক পরিবেশ, জীবনধারণ আর প্রবহমান কৃষ্টি-চেতনাই এর অন্যতম প্রধান কারণ। বাঙালি তাই সাহিত্যের ধারক ও বাহক। লিটল ম্যাগাজিন তার অন্যতম মাধ্যম। আর রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যেহেতু গ্রাম এবং মফঃস্বলে বাস করে, বেশিরভাগ লিটল ম্যাগাজিন তাই এইসব অঞ্চল থেকেই প্রকাশিত হয়। যাদের অধিকাংশ প্রচারের আলো না দেখলেও প্রচেষ্টার খামতি থাকে না। ক্ষুদ্র আর্থিক সংগতি এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ লড়াই চালিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমার আলোচনার বিষয়বস্তু 'লিটল ম্যাগাজিনে মফঃস্বলের লেখক লেখিকা'। সাহিত্যে শহর মফঃস্বল ভেদাভেদ অনেকে আপত্তি তুলতে পারেন, কারণ সাহিত্য জীবনের কথা বলে— স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে তা শাশ্বত—একথা স্বীকার করেও বলতে হয়। শাশ্বত সত্যের পাশাপাশি আরও অনেক সত্য আছে, যাকে অস্বীকার করে জীবন চলে না।

মানুষের সভ্যতা আবহমান কাল ধরেই শহরকেন্দ্রিক। এই শহরকেন্দ্রিকতা আর্থ-সামাজিক কারণে। শহরের জীবনযাপনের মান অনেক বেশি উন্নত, অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে তারা অভ্যস্ত—গ্রাম বা মফঃস্বলে যা স্বপ্নাতীত। বহু প্রতিবন্ধকতার উজান ঠেলে চলে জীবনপ্রবাহ। বঞ্চনা তাদের স্বাভাবিক প্রাপ্তি। এমনকী স্বীকৃতির ক্ষেত্রেও। এই বঞ্চনাই জন্ম দেয় ক্ষোভ, ক্ষোভ থেকে প্রতিবাদ। সেহেতু যিনি সাহিত্য সৃষ্টি করছেন, তিনিও রক্তমাংসের মানুষ, জৈবিক আত্মিক ও পার্থিব চাওয়া-পাওয়াকে উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়—স্বাভাবিকভাবেই এই বঞ্চনা তারও চেতনায় প্রভাব ফেলে। প্রভাবিত হয় তার সৃষ্টি-কলমটিও। একজন প্রান্তিক লেখকের কলমে তাই স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে তার দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি। তার বঞ্চনা, ক্ষোভ আর প্রতিবাদ। মফঃস্বলের লিটল ম্যাগাজিনগুলি এই প্রতিবাদ ধারণ করে, যেহেতু লিটল ম্যাগাজিনই এখন অন্যরকম। এ প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি কবিতা স্মরণ করা যেতে পারে—

এবার কবিতা লিখে আমি একটা রাজপ্রাসাদ বানাবো
এবার কবিতা লিখে আমি চাই পনটিয়াক গাড়ি
... কবিতা লিখছি তাই আমার সহস্র ক্রীতদাসী চাই—
[এবার কবিতা লিখে / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়]

বাংলা সাহিত্যে এ ঘটনার বড় উদাহরণ বোধহয় 'কৃত্তিবাস'। তরুণ কবিদের মুখপত্র হিসেবে ১৯৫৩এর বর্ষাকালে কৃত্তিবাস পত্রিকার আবির্ভাব। কৃত্তিবাসকে কেন্দ্র করে যে শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালে তারা প্রায় সমগ্র সাহিত্যজগৎ শাসন করেছে। এদের দাঁড় করিয়ে দিয়েই কৃত্তিবাসের অন্যতম সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই বলে প্রথম পর্বের কৃত্তিবাস বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন, 'পত্রিকা সম্পাদনা যৌবনের কাজ। যৌবন পেরিয়ে এসে তা না করাই উচিত।'

কেউ কেউ আবার লিটল ম্যাগাজিনকে লেখকদের আঁতুড়ঘর ভাবেন। ভাবনাটা অমূলক নয়। বাণিজ্যিক কাগজগুলো যেহেতু অর্থের বিনিময়ে লেখা ছাপেন, ভালো লেখাই তারা ছাপবেন। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নামজাদা লেখকেরাই সেখানে অগ্রাধিকার পান। শিক্ষানবিশ লেখকেরা সেখানে ব্রাত্য। বাধ্য হয়ে লিটল ম্যাগাজিনকে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিতে হয় তাদের। লিটল ম্যাগাজিনে হাত পাকিয়ে তারা পরিণত হতে চান এবং মনে মনে ভবিষ্যতে বড় বড় বাণিজ্যিক কাগজগুলিতে লেখার স্বপ্ন লালন করেন।

এটা গেল মফঃস্বলীয় লেখক-মানসিকতার একটা দিক। অন্যদিকে আজীবন লিটল ম্যাগাজিনে লেখার মানসিকতা বিরল নয়। তাঁদের মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য অমিয়ভূষণ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ। আজীবন লিটল ম্যাগাজিনে লিখেই এঁরা স্বীকৃতি আদায় করেছেন। পেয়েছেন অসংখ্য জাতীয়, আন্তর্জাতিক পুরস্কার। অর্থাৎ লিটল ম্যাগাজিন যে কেবল লেখকদের আঁতুড়ঘর, এ ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। প্রয়োজনে লিটল ম্যাগাজিন সারা জীবনের বিচরণ ক্ষেত্রও হতে পারে। সবটাই নির্ভর করছে লেখকের মানসিকতার ওপর।

লিটল ম্যাগাজিনের দুনিয়ায় আর একটি ভয়ঙ্কর সিস্টেমের নাম 'লেনদেন প্রথা'। অর্থাৎ আমি তোমার লেখা ছাপবো, তুমি আমারটা। আমার পিঠ তুমি চুলকাবে, আমি তোমারটা। অসংখ্য পত্রিকার মধ্যে গোপনে চলে এই ধরনের বোঝাপড়া। বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দেওয়া বা দশ কপি পত্রিকা বিক্রি করে দেওয়ার বিনিময়ে লেখা ছাপানোর ঘটনাও বিরল নয়। ছকবাজি আরও আছে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে পুরস্কার পাওয়া এবং মিডিয়ার প্রচার পাওয়ার জন্য ছকবাজি।

কোনও কোনও লেখক জীবনের শুরুতেই বড় কাগজের আনুকূল্য পেয়ে যান। যদিও তাঁদের সংখ্যা হাতে গোনা, তবে বিরল নয়। শুরুতেই বড় কাগজের আনুকূল্য পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞানে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন লিটল ম্যাগাজিনকে। লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকরা এদের কাছে লেখা চাইতে গিয়ে অপমান-অপদস্ত হয়ে ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে বাণিজ্যিক কাগজগুলোতে যখন এদের প্রয়োজন ফুরায় (ততদিন এদের কদর, যতদিন ব্যবসা দিতে পারেন), তখন এদের অবস্থা না ঘরকা না ঘটকা। ততদিনে

লিটল ম্যাগাজিনগুলিও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তখন এদের করুণ পরিণতি চোখে পড়ে। বাধ্য হয়ে লেখা ছেড়ে কেউ কেউ অন্য কাজে মনোনিবেশ করেন।

মফঃস্বলের লেখক-লেখিকাদের কাছে একটি বড় প্রতিবন্ধক তাদের ভৌগোলিক অবস্থান। শহরের লেখকেরা ব্যক্তিগত পরিচয় এবং যোগাযোগের সূত্রে যত তাড়াতাড়ি বাণিজ্যিক কাগজগুলির শক্ত আগল খুলতে পারেন, দূরত্বের কারণেই মফঃস্বলের লেখক-লেখিকাদের পক্ষে তা অসম্ভব। বাধ্য হয়ে বাড়ে তাদের লিটল ম্যাগাজিন নির্ভরতা। সাম্প্রতিককালে মোবাইল এবং ফেসবুকের কল্যাণে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা হলেও শারীরিকভাবে উপস্থিত হয়ে যোগাযোগ রক্ষা করার গুরুত্ব অনেক বেশি কার্যকর।

তবে বাধ্য হয়ে হোক বা অন্য কারণে—মফঃস্বলের লেখক-লেখিকাদের লিটল ম্যাগাজিন নির্ভরতার এইসব কারণ অনস্বীকার্য হলেও মূলত তা গৌণ। প্রধান কারণ অবশ্যই নতুন আঙ্গিকে নতুন কথা বলার স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতা তার জেহাদকে মূর্ত করে তোলে। সাহিত্য তার চিরপ্রচলিত পথ ছেড়ে নতুন পথের সন্ধান পায়, দিক পরিবর্তন করে। সৃষ্টি হয় নতুন রীতির। একসময় পাঠকও তাকে স্বাগত জানায়। কারণ নতুনের প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত। নতুন কিছু করার বাসনাও নতুন নয়। সেই বাসনা থেকেই লিটল ম্যাগাজিনের জন্ম। লিটল ম্যাগাজিন তাই ছিল, আছে, থাকবে। মরসুমি ফুল কিংবা পরিযায়ী পাখির মতো নতুন নতুন লিটল ম্যাগাজিনের জন্ম হবে, মৃত্যু হবে, আবার জন্ম হবে। নতুন সম্পাদকদের সঙ্গে আসবেন নতুন নতুন লেখক। তাদের নতুন চিন্তা-ভাবনায় রাঙিয়ে তুলবেন এইসব পত্রিকার পৃষ্ঠা। আগামী দিনের সাহিত্য নতুন গতি পাবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১. লিটল ম্যাগাজিন এখন প্রতিপক্ষ, সুরঞ্জন প্রামাণিক, দিবারাত্রির কাব্য, গল্পসংখ্যা, ২০০৪।

২. লিটল ম্যাগাজিন : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, আলোক রায়, কোরক, প্রাক শারদ সংখ্যা, ১৪১৩।

৩. লিটল ম্যাগাজিন : চিরযুবা ও চিরজীবী, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, কোরক, প্রাক শারদ সংখ্যা, ১৪১৩।

৪. লিটল ম্যাগাজিন : এর চরিত্র ও সমস্যা, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, কোরক, প্রাক শারদ সংখ্যা, ১৪১৩।

বিভূতিভূষণের অপু-আখ্যান : গ্রাম-শহর পরিচলন

বর্ষা চক্রবর্তী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে সাহিত্য সৃষ্টির মূল যে দুটি ধারা কে অন্যকে সম্পৃক্ত করে রেখেছিল, তা হল স্বদেশ-জিজ্ঞাসা ও জীবন-জিজ্ঞাসা। এই দুই বোধবীক্ষার ধারায় আচমন করেও এই বাংলাদেশ থেকে সামান্যই দূরে ভাগলপুরে বসে সম্পূর্ণ পৃথক একটি জঁরা'র সৃষ্টি করছিলেন লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সে জঁরা মানব-প্রকৃতিকে বিশ্বপ্রকৃতির সাথে মেলবন্ধন ঘটায় তাঁর প্রথম উপন্যাসে। 'পথের পাঁচালী'-র আখ্যান মূলত অপুর জীবন পরিক্রমণকে বিস্তৃতি দিলেও এই কাহিনির আধার আসলে পথ। বিভূতিভূষনের আরাধ্য পথের দেবতার এক গীতিমাল্য রচিত হয় এই উপন্যাসে। তিরিশের দশকের বাংলাদেশের বাস্তব জীবন যখন অর্থনৈতিক সঙ্কট, বেকার-সমস্যা, স্বদেশ-চেতনার হারানো দিশায় মুক্তির পথ খুঁজছিল, যখন ফ্রয়েডের জীবন-জিজ্ঞাসা ও মার্কসের সমাজ-জিজ্ঞাসা বাংলার সচেতন মানুষের বোধকে জটিলতর প্রশ্নে আচ্ছন্ন করছিল, ঠিক সেইসময় বিভূতিভূষণ এমন এক আখ্যান রচনা করলেন, যার কথাভাগে সময়ের বাস্তববোধ কোনো প্রশ্ন তোলেনা, কেবল নিরীক্ষণ করে ; অতিক্রম করে। জীবনকে এক সাধারণ গতিময়তায় অতিক্রম করাই এই উপন্যাসে আনন্দ-বিধানের পথ দেখায়। ইন্দির ঠাকরুন, হরিহর-সর্বজয়া, দুর্গা-অপু প্রতিটি জীবন-কথনেই বঙ্গদেশের এক অতি সাধারণ গৃহস্থবাড়ির

গড়পরতা ভাঙন-গঠনের চিত্রলিপি পাওয়া যায়। অথচ বিশেষ করে কোনো সময় আরোপিত করা যায়না এই যাপনে। দারিদ্র্য এই পরিবারটির সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনকে লাঞ্ছিত করতে করতে বিপর্যয়ের অনিমেষ গহ্বরে নিক্ষেপ করে, কিন্তু তাও দারিদ্র্য কখনোই লেখকের বয়ানে নায়ক হয়ে ওঠে না। অন্তর্গত স্রোতের মতন সে চলে বটে, কিন্তু তাকে চালনা করে সময়। বিশ শতকের তৃতীয় দশক যখন জীবন-বিমুখতার জন্ম দিচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই এই উপন্যাস যেন জীবনেরই কথা বিধৃত করে যায় অক্ষরে অক্ষরে।

এক

এখানেই অন্বেষণ শুরু করা যায় যে, জীবনবীণার প্রতিটি তারকে আনন্দ-গানের স্বরলিপিতে বাঁধন দিলেও বিভূতিভূষণের অমোঘ চেতনার স্তরে অত্যন্ত নিস্তরঙ্গে যে সমাজবীক্ষা ধরা পড়ে সেই কাহন কি কোথাও দুই সভ্যতার দ্বন্দ্ব প্রভাবের বৃত্তকে ছুঁয়ে যায়না? নিশ্চিন্দিপুর থেকে কাশী, কাশী থেকে বর্ধমান, বর্ধমান থেকে মানসপোতা – এই পরিক্রমার নির্বাচন, যা এক অর্থে নির্বাসনও, সেই অধ্যায় কি ততটাই সহজ ছিল? অপুর বালক মন যে কষ্টের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারেনি, সর্বজয়ার পরিণত চেতনও কি সেই পীড়ার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারেনি? অর্থনৈতিক মন্দার সর্বগ্রাসে একটি পরিবারের গ্রাম থেকে বাস উঠিয়ে অন্যত্র জীবন নির্মাণের যে আখ্যান এই উপন্যাস নির্মাণ করে, তার পথ-পরিক্রমার প্রত্যেক বাঁকে রয়ে যায় সেই নিঃসীম দ্বন্দ্ব। জীবন এইরকম যাপনে বাধ্য করে, কিন্তু মন-চেতনা এই যাপন মেনে নিতে কতখানিই বা সক্ষম হয়!

উপন্যাসের প্রাথমিক অধ্যায়গুলিতে বাংলাদেশের নিস্তরঙ্গ এক গ্রামের চিত্র পরিবেশিত হয়। যেহেতু এই উপন্যাস এক বালকের মধ্যে দিয়ে পথের দেবতার জীবন পরিক্রমাকেই মহাসমারোহে সাজায়, সেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ে এই গ্রামজীবনের সাধুকল্প আশ্রয়টুকু দেখানো হয়তো প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীতে, বর্তমান উপন্যাসে, বা তার পরবর্তী ভাগ 'অপরাজিত'-তেও এই নিশ্চিন্দিপুরের মায়াকল্প-বিন্যাস বারংবার উঠে আসে কাহিনি বা চরিত্রের মাধ্যমে, লেখকের কলমে। একথা অনস্বীকার্য, অর্থনৈতিক সংকটের যে ভয়ানক প্রাবল্য হরিহরের পরিবারে আরোপ করেন লেখক, তার অভিঘাতটা পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের কাছে ভিন্নতর হয়ে দেখা দেয়। রোজগারের চেষ্টায় শিষ্যবাড়ি পরিক্রমা, দিনের পর দিন কার্যত বে-রোজগেরে অবস্থায় আশাহত হয়ে বাড়ি ফেরা, পুনরায় 'কিছু একটা হয়ে যাবে' ভেবে পথে নামা – এই যদি ছিল হরিহরের অবস্থা, অন্যদিকে সর্বজয়ার পরিস্থিতি ছিল আরও করুণ। সর্বজয়া সংসার ছেড়ে অন্যত্র মুখ ফেরাতে পারেনি। দু-দুটো সদ্য কৈশোরের ছেলেমেয়ের মুখে খাবারটুকু তুলে দিতে হীন থেকে হীনতর স্বভাবের আসামী হতে হয়েছে তাকে। এর ওর বাড়ি থেকে চেয়ে আনা মোটা চাল, লাউটা, কলাটা, কিংবা শরিকের বাগান থেকে চুরি করে আনা নারকোল, নোনা, কিংবা পুকুরের ওলশাক-কচুশাকটা, এই দিয়েই কোনোক্রমে দিন চালাতে হয়েছে সর্বজয়াকে। হরিহরের অনুপস্থিতিতে দুর্গার অসুখের সময় নিজে দিনের পর দিন উপোস দিয়ে সামান্য একটু চালভাজাই সে অতিকষ্টে অপুর পাতে দিয়েছে। বিনা চিকিৎসায় মৃতপ্রায় দুর্গা প্রবল

অনীহাতেও নিমছালসিদ্ধ দিয়ে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করেছে। এই অতীব কষ্টের মধ্যেও অপু-দুর্গার শৈশবকে, তাদের প্রকৃতি প্রবণতাকে, বিস্ময়ের পৃথিবীর চির-রস আস্বাদনকে লেখক এতটুকুও ক্ষুণ্ণ করেন না। বাড়িতে ভরপেট খাওয়া মেলেনা, দুর্গা অপুর হাত ধরে বনে বাদারে বুনোফল খেয়ে বেড়ায়, ছিনিবাস ময়রা পাড়ায় এলে তার পিছন পিছন ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির দাওয়ায় গিয়ে ওঠে, যদি অন্যদের সাথে তাদেরও এক আধকণা মিঠাই জুটে যায়। পাড়ায় বিয়ে, অন্নপ্রাশন, কিংবা নিছক কোনো পূজায় পুঁটুলি বেঁধে অতি গর্বে বড়ি ফেরে অপু, তার মা যদি কিছু খেতে পায়, এই ভেবে। দরিদ্র ঘরে চিকিৎসা নেই, ওষুধ নেই, কার্যত বিনা চিকিৎসায় বেঘোরে মারা যায় দুর্গা। বিদেশ বিভুঁইয়ে পরে থাকা হরিহর জানতেও পারেনা মেয়ের বিধির লিখন। উপন্যাসের প্রথম আঠারোটি অধ্যায় জুড়ে এই চরম দারিদ্র্যের অঞ্চলছায়ায় ঢেকে যেতে দেখি একটি পরিবারকে।

দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় দুর্গার মৃত্যুর অনতিবিলম্বে হরিহর বাড়ি ফিরলে। তার অনুপস্থিতিতে পরিবারটির ভয়াবহ দুর্গতির স্বরূপ অনুধাবন করে হরিহর স্বয়ং নিশ্চিন্দিপুরের বাস উঠিয়ে কাশী যাওয়ার প্রস্তাব তোলে সর্বজয়ার কাছে। সে দেশের সকলই ভালো, সেখানে গেলে ক্ষুধার কষ্ট তো দূর, এমনকী হরিহরের কবিসত্ত্বারও যথার্থ সম্মাননা পাওয়া যাবে, এমনই সব আশার কথা স্বামীর কাছে শুনে সর্বজয়াও খানিক প্রলোভনে হারিয়ে যায় – "তাহার মা খুব আগ্রহ প্রকাশ করিল, সে সব সোনার দেশে কখনও কাহারও অভাব নাই – দুঃখ এ-দেশে বারোমাস লাগিয়াই আছে, সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারিলেই সব দুঃখ ঘুচিবে। মা আজ যাইতে পাইলে আজই যায়, একদিনও আর থাকিবার ইচ্ছা নাই।"[১] অতি অল্পদিনের মধ্যেই যাবতীয় তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। কিন্তু নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাওয়ার বিষয়ে সবথেকে দ্বন্দ্বমুখর অনীহাটি দেখা যায় বালক অপুর মধ্যে। অপুর শৈশবকে আদরে-অভিজ্ঞতায় লালন করেছিল যে দুটি সত্তা, তার একটি হল দুর্গা, অন্যটি নিশ্চিন্দিপুর। দুর্গার মৃত্যুতে নিশ্চিন্দিপুরও খাঁ খাঁ লাগতে থাকে বালক অপুর মনে। চরকের মেলায় সে উৎসাহ পায়না, আগের বছরে দিদির মেলা ঘিরে আনন্দের কথা মনে পরে। তাদের কোঠাবাড়ির ভিতরে, বাঁশবাগানের পথে, আমবাগানের ভিতরে, তাদের চড়ুইভাতির সেই স্থানটিতে সর্বত্র তার দিদির কথা স্মরণে আসে – "তাহাদের বেড়ার গায়ে রাংচিতা ফুল লাল হইয়া ফুটিলে, তাহার মুখ মনে পড়ে, পাখির ডাকে, সদ্যফোটা ওড়কল্মির ফুলের দুলুনিতে – দিদির জন্য মন কেমন করে। মনে হয় যাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলে খুশি হইত, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে – কতদূর!"[২] অপুর মানসচেতনায় তার দিদি আর নিশ্চিন্দিপুর কখনো যেন পৃথক অংশে আবির্ভূত হয়নি। এমনকী দুর্গার মৃত্যুর পরেও তাদের ভাঙাচোড়া কোঠাবাড়ির প্রতি গৃহ-কোণে, চালতাতলার পথে, সোনাডাঙা মাঠের ভিতর, আমবাগানে, গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলায়, আতুরি ডাইনির বাড়ির পথে সর্বত্র সে তার দিদিকে অনুভব করেছে। যেন নিশ্চিন্দিপুরে থাকা মানেই তার দিদির স্মৃতিটুকুর সঙ্গে থাকা। অথচ, সেই গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার দিন তার প্রথম মনে হল, এবারই যেন তার দিদির সাথে সত্যিকারের বিচ্ছেদ হল। এই বিচ্ছেদ অপুর বালক মন মেনে নেয়নি কখনোই। অথচ ওই নিষ্পাপ সারল্যও যেন কোথাও

অনুধাবন করেছিল, নিশ্চিন্দিপুর না ছাড়লে তাদের আর কোনো ভবিষ্যত নেই। রানুদিকে বড় দুঃখের সাথে সে জানায়, – "আমি কি করবো, আমি তো আর বলিনি যাবার কথা? বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদের চলেনা যে?"[৩] অথচ এই সহজ বাস্তব নিজেকে বোঝানোর পরেও অপুর নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যেতে মন চায়না – "এই তাহাদের বাড়ি-ঘর, ওই বাঁশবন, সলতে-খাগীর আমবাগানটা, নদীর ধার, দিদির সঙ্গে চড়ুইভাতি করার ওই জায়গাটা – এ সব সে কত ভালোবাসে! ওই অমন নারিকেল গাছ কি তাহারা যেখানে যাইতেছে সেখানে আছে? জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত এই নারিকেল গাছ সে এখানে দেখিতেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে পাতাগুলি কি সুন্দর দেখায়! সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রে এই দাওয়ায় বসিয়া জ্যোৎস্নাঝরা নারিকেল শাখার দিকে চাহিয়ে কত রাত্রে দিদির সঙ্গে সে দশ-পঁচিশ খেলিয়াছে, কতবার মনে হইয়াছে কি সুন্দর দেশ তাহাদের এই নিশ্চিন্দিপুর! যেখানে যাইতেছে, সেখানে কি রান্নাঘরের দাওয়ার পাশে বনের ধারে এমন নারিকেল গাছ আছে? সেখানে কি সে মাছ ধরিতে পারিবে, আম কুড়াইতে পারিবে, নৌকা বাহিতে পারিবে, রেল রেল খেলিতে পারিবে, কদমতলার সায়েবের ঘাটের মতো ঘাট কি সে দেশে আছে? রানুদি আছে? সোনাডাঙার মাঠ আছে? এই তো বেশ ছিল তাহারা, কেন এসব মিছামিছি ছাড়িয়া যাওয়া?"[৪] দেখা যায়, এর পরবর্তীতে গোটা উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে যতবার শহুরে তৎপরতায় অপুর মন বিচলিত হয়েছে, যতবার সে নিজেকে আরও খানিক বিষাদকল্পে আবিষ্কার করেছে সেই প্রত্যেকবার তার নিভৃত অন্দরে ছায়া বিছিয়েছে নিশ্চিন্দিপুর। অবস্থার অবনতি-উন্নতি সবটুকুতে সে ফিরে আসতে চেয়েছে তার সেই নিশ্চিন্ত অতীত আশ্রয়-ভিটায়। যেন নিশ্চিন্দিপুরে ফিরলেই কেবল মিলে যায় সব পাওয়ার ঠিকানা। অপুর সেই দ্বন্দ্ব কৈশোরে-বাল্যে 'পথের পাঁচালী'-তে আবিষ্কৃত হয়নি ততটা, যতটা হয়েছিল 'অপরাজিত'-তে গিয়ে।

অন্যদিকে, সম্ভবত অপার শিল্পীমন ও বালকসুলভতায় অপুর নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে না যাওয়ার ও বারংবার সেখানেই ফিরে আসার তাগিদকে যতটা একমুখী দেখি, ততখানি হরিহর বা বিশেষ করে সর্বজয়ার মধ্যে একেবারেই দেখা যায়না। একথা মনে হয়, বয়সে বালক হওয়ার কারণেই বাস্তবের যে নিপীড়ন, চেতনার যে দ্বন্দ্ব অপু উদঘাটন করতে পারে না, পথের দেবতা যেন তার সবটুকু পূরণ করে নেন সর্বজয়ার ক্রমবিড়ম্বনার মধ্যে দিয়ে। হরিহরের সাথে দেশ-গাঁ ছেড়ে অন্যত্র বাস ওঠানোর ব্যাপারে তার উৎসাহ ছিল সর্বাধিক। অপু লক্ষ্য করে, তার মা যেন আজ যেতে পারলে আজই যায় গ্রাম ছেড়ে। কেবল তাই নয়, উনবিংশ-বিংশ শতকের সাধারণ ধর্ম অনুসারে গ্রামের আর পাঁচজন মুরুব্বি-মাতব্বররা এসে যখন নিশ্চিন্দিপুরের বাস ওঠানোর ব্যাপারে নিবৃত্ত করতে থাকে হরিহরকে, তখন হরিহরের মধ্যেও ভাবান্তর দেখা যায়, - "হরিহর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, তাহার যেন কেমন ঠেকিতেছিল। কাজটা কি ভালো হইল? কতদিনের পৈতৃক ভিটা, ওই পাশের পোড়ো ভিটাতে সে সব ধূমধাম একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিলই তো, যা-ও বা মাটির প্রদীপ টিমটিম করিতেছিল, আজ সন্ধ্যা হইতে চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল। পিতা রামচাঁদ তর্কবাগীশ স্বর্গ হইতে দেখিয়া কি মনে করিবেন?"[৫] – হরিহরের দ্বিধাটি স্পষ্টতই

বোঝা যায়। এর আগেও সে অনেকবার দেশ ছেড়ে গেছে ভাগ্যান্বেষণে। কিন্তু কখনও এমন বাস উঠিয়ে সকল পিছুটানকে মুহূর্তে নেই করে দিয়ে ভাগ্যঠাকুরের ভরসায় তাকে গ্রাম ছাড়তে হয়নি। কিন্তু দুর্গার মৃত্যু তাকে বুঝিয়েছে, যে আশ্রয়কে সে পরমরমণীয় ভেবে দিনের পর দিন নিরুদ্দেশ থাকার সাহস নিয়েছিল, সেই কোরকটিই ধীরে ধীরে তার অন্তঃস্থলে আঘাত হেনেছে। পিতৃপুরুষের ভিটে হওয়া সত্ত্বেও একপ্রকার ভাগ্যের অনির্দেশ্য হাতছানিকে পাথেয় করেই নিশ্চিন্দিপুরের বাস উঠিয়েছে সে। হরিহরের দ্বন্দ্ব হয়তো প্রাথমিক বলেই পরবর্তীতে তার বিস্তার লেখক করেননি। কিন্তু সর্বজয়ার ক্ষেত্রটি কিছু পরিসর পায়। গ্রাম ছাড়ার সময় যে দ্বন্দ্ব হরিহরকে আচ্ছন্ন করেছিল, গরুর গাড়িতে ঠিক তার পাশে বসেই সর্বজয়ার অনুভূতি ছিল কিছু ভিন্ন। শহর সম্পর্কে সর্বজয়ার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিলনা। অন্যদিকে গ্রাম তাকে কেবল অসহায়তা, অপমান ও হারানোর বেদনা ছাড়া আর কিছুমাত্র দিতে পারেনি। উপরন্তু দারিদ্র্য এসে ঘরে সহাবস্থান করে দুর্গাকেও ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সাধারণ এক দরিদ্র গৃহবধূর এর থেকে বেশি না পাওয়া আর কিসেই বা থাকতে পারে! সম্ভবত, সর্বজয়ার মনে কোথাও এই ভয়ও ছিল যে, এই গ্রামে থাকলে এই দারিদ্র্যের কবলে হয়তো অপুকেও সে হারাতে পারে। বিভূতিভূষণের আলেখ্য পড়ে একথা বুঝে নিতে এতটুকুও অসুবিধা হয়না, দুর্গাকে হারানো সর্বজয়া তবু হয়তো ভুলতে পারে, কিন্তু তার জীবন থেকে অপুর চির-বিচ্ছেদ সে কখনোই হতে দিতে পারবেনা। অতএব, নির্দ্বিধায় নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ করে সর্বজয়া, - "গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বজয়ার মনে হইল যা কিছু দারিদ্র্য, যা কিছু হীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া – এখন সামনে শুধু নতুন সংসার, নতুন জীবনযাত্রা, নব সচ্ছলতা!..."[৬]

সর্বজয়ার এই আশা কাশী-জীবনের নবপরিচয়ে অচিরেই ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। দারিদ্র্য কখনো তার পিছু ছাড়েনি। ভাগ্যাণ্বেষণে এলেও কাশীতে এসে হরিহর খুব একটা সুবিধা করতে পারেনা। মন্দিরে মন্দিরে নিত্য পুরাণ-পাঠ, কিংবা দশাশ্বমেধ ঘাটে পুঁথিপাঠের মাধ্যমে আয় কিছুটা বাড়ে ঠিকই, কিন্তু সেই আয় দিয়ে কাশীর মত জায়গায় জীবন-প্রণালিকে খুব সহজে আয়ত্ত করতে পারা যায়না। গ্রামের মতন খোলামেলা ঘরবাড়ির অভাব, নিত্য পরিচিত দুটো মানুষের সাথে কথা বলার অভাব এসবকিছুই সর্বজয়াকে অন্তত তুলনামূলক দ্বন্দ্বে হলেও নিশ্চিন্দিপুরের কথা স্মরণ করায় – "এরকম স্থানে সর্বজয়া কখনো বাস করে নাই, তাহাদের দেশের বাড়ি পুরানো হইলেও রৌদ্রহাওয়া খেলিবার বড় বড় দরজা জানালা ছিল, সেকালের উঁচু ভিতের কোঠা, খট খট করিত, শুকনা। এ বাসার স্যাঁৎস্যাঁতে মেজে ও অন্ধকারে সর্বজয়ার মাথা ধরে।"[৭] অপুর অবস্থাও তথৈবচ, - "অপু তো মোটে ঘরেই থাকেনা, সূর্যালোকপুষ্ট নবীন তরুর ন্যায় শুধু আলোর দিকে তার মুখটি থাকে ফিরানো, নিশ্চিন্দিপুরের মুক্ত মাঠে, নদীর আলো হাওয়ায় মানুষ হইয়া এই বদ্ধঘরের অন্ধকারে তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে, একদন্ডও সে সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না।"[৮] পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয় কাশী আসার এক বছরের মধ্যেই হরিহরের মৃত্যু সংঘটিত হওয়ায়। হরিহরের অসুস্থতার সময় আরও একটি ঘটনা সর্বজয়াকে বিপদের মধ্যে অকুল পাথারে এনে ফেলল। বাসাবাড়ির উপরতলার পাঞ্জাবি ভদ্রলোকটি নানা ছুতোয়

হরিহরের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে সর্বজয়ার ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। বিদেশ বিভুঁইয়ে সর্বজয়ার এই উটকো বিপদ পাঠককে স্মরণ করায়, দুর্গার মৃত্যুর রাত্রে অঝোর বৃষ্টি, ঘরদোর ভেঙে পরার সেই ভয়াবহ রাতেও হরিহরের অনুপস্থিতিতে সহায় হয়েছিল পড়শী নীলমণি মুখুজ্যের পরিবার। ডাক্তার ডাকা, ওষুধের ব্যবস্থা করার যাবতীয় সমস্ত দায়িত্ব তারা পালন করে নিছক পরিজনের বিপদমুক্তির কথা মাথায় রেখেই। গ্রামদেশের এই অপার হাত বাড়ানোর মধ্যে কোনো কুটীলতা-কৌশল পাঠক হিসাবে চোখে পড়েনা ; যেমনটা পড়ে কাশীতে পাঞ্জাবি ভদ্রলোকটির সর্বজয়ার প্রতি কু-দৃষ্টি নিক্ষেপে।

হরিহরের মৃত্যুর পর দিনাতিপাতের ঘোর দুশ্চিন্তা সর্বজয়াকে প্রথমবার নিশ্চিন্দিপুর ফেরার কথা ভাবতে বাধ্য করে। কিন্তু সাথে এ দ্বন্দ্বও সমচেতনা অধিকার করে যে, গ্রাম ছেড়ে আসার সময়ে দিন ফিরে পাওয়ার যে প্রবল গর্ব সর্বজয়া চোখেমুখে ছড়িয়ে গোটা নিশ্চিন্দিপুরে বিলি করেছিল, আজ সহায়সম্বলহীনতার বৈধব্যবেশে কিভাবে সে গিয়ে দাঁড়াবে সেই ফেলে আসা পথে! উপরন্তু, নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে আসার সময়ে অধিকাংশ জিনিসপত্র বেচে দিয়ে এসেছে, কেবল ওই পোড়ো বাড়িটুকুর আশ্রয়ে বয়সের ছেলেকে নিয়ে কোন আশায় ফিরবে সে গ্রামে! এই গ্রাম তো পূর্বেও কিছুমাত্র করুণা করেনি তাকে, এখনই বা কেন করবে! গ্রামে ফেরা সর্বজয়ার আর হয়না। কিন্তু পেট চালানোর তাগিদে তাকে এক প্রতিপত্তিশীল গৃহস্থ বাড়িতে রাধুনির কাজ নিতে হয়। সেখানে আশ্রয় জোটে, পেটে দুবেলা খাবারও জোটে, কিন্তু সম্মান জোটেনা। পরের বাড়িতে দিনগত পাপক্ষয়ে সর্বজয়া অনুধাবন করে নিশ্চিন্দিপুরে সে ছিল হরিহরের গৃহলক্ষ্মীটি। দুঃখে দারিদ্র্যে অবসরে সে দরিদ্রের ভাঙা কুটিরের গৃহবধূ হওয়ার যে একদা সম্মান সে অর্জন করেছিল, আজ পরের বাড়ির দাসী সেবায়, অসম্মানের অন্ন গ্রহণে সেই অতৃপ্তি বড় বিদ্ধ করে সর্বজয়াকে, - "পরের বাড়ি, নিতান্ত পরাধীন অবস্থায় চোরের মতো থাকা সর্বজয়ার জীবনে এই প্রথম। সুখে হৌক, দুঃখে হৌক, সে এতদিন একা ঘরের একা গৃহিণী ছিল। দরিদ্র সংসারীর রাজরানী – সেখানে তাহার হুকুম এই এত বড় বাড়ির গৃহিণী, বৌ-রানীদের চেয়ে কম কার্যকরী ছিল না। এ যেন সর্বদা জুজু হইয়া থাকা, সর্বদা মন যোগাইয়া চলা, আর একজনের মুখের দিকে চাহিয়া পথ হাঁটা, পান থেকে চুন না খসে! ছোটর ছোট তস্য ছোট! ...এ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল।"[৯] সর্বজয়ার এই পরিণতি গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষগুলোর বিত্ত-কৌলিন্যের অভিঘাত, বৃত্তি-বদলের ইতিহাসকেই সূচিত করে, যে ইতিহাসকে সাহিত্য রূপ দেয় গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্বচিত্রে। সর্বজয়ার এই অসহনীয় অবস্থা এই দ্বন্দ্বকেই সূচিত করে সাহিত্য-বীক্ষায়। অপুর মধ্যেও অনুরূপ দ্বন্দ্ব ক্রমশ পরিণত হয়, - "এই বিদেশ, এই গিরিশ সরকার, এই চোর হইয়া থাকা – না হয় মায়ে ছেলে হাত ধরিয়া ছন্নছাড়া পথে চিরকাল – এরাই কি কায়েম হইতে আসিয়াছে?"[১০] লক্ষণীয় যে, নিজ ভূম ত্যাগ করে এসে পরের বাড়ির বছর দুয়েকের আশ্রয়বাস অপুকে এই সদ্য কৈশোরে বিত্ত-চেতনার উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়। বস্তুত সমস্ত জগতই যে আসলে শ্রেণি-চেতনার, কায়েমি অধিকারের, এই ভাষাটি বুঝে নিতে অপুকে বিলম্ব করান না লেখক। এই চেতনা বিপ্লবের পরবর্তী ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে সর্বজয়া

অপুর কাছে ফের তাদের গ্রামে ফেরার বাসনার কথা জানায়, - “একটা কথা ভাবচি, এখান থেকে চলে যাবি? সে আশ্চর্য হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। পরে হঠাৎ খুশি হইয়া বলিয়া উঠিল – কোথায় মা, নিশ্চিন্দিপুর ? সেই বেশ তো, চলো, আমি সেখানে ঠাকুর-পুজো করবো – পৈতেটা তো হয়ে গিয়েচে – নিজেদের দেশ, বেশ হবে – এখানে আর থাকবো না-”[১১] মা’র সম্মতিটুকু পাওয়া ইস্তক অপু পুনরায় তার স্বপ্ন জগতকে মোহাবেশে সজ্জিত করে তুলতে আরম্ভ করে। লেখকের অন্তর্লীন চেতনাস্রোত অপুর মধ্যে দিয়ে কোথাও বিস্তার লাভ করে এ কাহিনি অংশের উপসংহারে। অপুর উপলব্ধিতে উঠে আসে সামূহিক নিশ্চেতনার সেই অন্তর্লীন চোরাস্রোত ; গ্রামে ফিরে যাওয়ার সেই চিরবাসনা, যা বাস্তবিক সেই সমস্ত গ্রাম ছেড়ে আসা মানুষগুলোর অন্তহীন ইচ্ছের সমনাম মাত্র – “এতদিন যেন তাহার মনের কোন কোণে সব সময়ই স্পষ্টভাবে জাগিয়া থাকিত যে, এ সবের শেষে যেন তাহাদের গ্রাম অপেক্ষা করিয়া আছে – তাহাদের জন্য! যদিও সেখান হইতে চলিয়া আসিবার সময় ফিরিবার কোনো কথাই ছিল না – সে জানে, তবুও এ মোহটুকু তার একেবারে কাটে নাই।”[১২] – এ মোহ বিভূতিভূষণের মোহ, এ মোহ উনিশ-বিশ শতকের লক্ষ লক্ষ কর্মানুসন্ধানী শহর অভিমুখী গ্রামের স্রোতের মোহ, এ মোহ অপুর মোহ – এই মোহাবেশে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, রক্তাক্ত অপু তার অবচেতনে প্রবল সমারোহে ফিরে যেতে চায় নিশ্চিন্দিপুর – “ও কাস্তে হাতে কাকা, শুনচো, নিশ্চিন্দিপুরের পথটা এট্টু বলে দ্যাও না আমাদের?”[১৩] – “কিন্তু এখন নির্জন ঘরের জানালাটাতে একা-একা দাঁড়াইয়া হঠাৎ সে কাঁদিয়া আকুল হইল, উচ্ছ্বসিত চোখের জল ঝর-ঝর করিয়া পড়িয়া তাহার সুন্দর কপোল ভাসাইয়া দিতেই চোখ মুছিতে হাত উঠাইয়া আকুল সুরে মনে মনে বলিল – আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুর ফেরা হয় – ভগবান – তুমি এই কোরো, ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুর যাওয়া হয় – নৈলে বাঁচবো না – পায় পড়ি তোমার-”[১৪]

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির এই দ্বন্দ্ববীক্ষা নজরপথে শামিল করার প্রেক্ষিতেই আরও দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা চোখে পরে, যেগুলির অভিঘাতও গ্রাম এবং শহরের দ্বন্দ্ব-চেতনার প্রেক্ষাপটকেই উদ্ভাসিত করে। ‘বল্লালী বালাই’ অংশে হরিহরের বাড়িতে সর্বজয়ার অবহেলা, অসম্মানে জর্জরিত ইন্দির ঠাকরুন বিকল্প আস্তানা খোঁজে নিশ্চিন্দিপুর থেকে ছয় ক্রোশ দূরে ভান্ডারডিহিতে। এর আগেও ইন্দির ঠাকরুন বাড়ি ছেড়েছে, কিন্তু গ্রাম থেকে এত দূরে, উপরন্তু এরম অবস্থাপন্ন জামাইবাড়িতে তার আবির্ভাব এই প্রথম। সম্ভবত যথেষ্ট ধনী হওয়ার সুবাদেই তার এককালের এই শাশুড়িকে চন্দ্র মজুমদার অনাদর করেনি। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত সুখের অবস্থানও ইন্দির ঠাকরুনের সহ্য হয়না। নিশ্চিন্দিপুরে ভাইয়ের সংসারের একটি ভাঙাচোরা কুঁড়ে, লাঞ্ছনার দুটি ভাত, সে-ও যেন এই অপরিচয়ের চারবেলার ক্ষুধা নিবৃত্তির থেকে ভালো – “কিন্তু দশ-বারো দিন কাটিয়া গেল, বুড়ির সব কেমন যেন নতুন নতুন ঠেকিতে লাগিল, তেমন স্বস্তি পাওয়া যায় না – নতুন ধরণের ঘরদোর নতুন পথঘাট, নতুন ভাবের গৃহস্থালি। কেমন যেন মনে হয় এ তো ঠিক তাহার নিজের নয়, সব পর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ই মনে পড়িত নিরিবিলি দাওয়া আর খুকি-খোকার মুখ। দিন কুড়িক পরে বুড়ি যাইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল।

এখানে আর মন টেকে না।”[১৫] চকিতেই আমাদের মনে পরে যায়, সর্বজয়ার পরের বাড়িতে রাধুনি বৃত্তির অপমানের দিনগুলির কথা। হয়তো ভান্ডারডিহি তেমন শহর নয়, কিন্তু ঠিক নিজ ভূমও যে নয়, ইন্দির ঠাকরুনের ফিরে আসার ঘটনা সেই সামূহিক নিশ্চেতনার বোধকেই সামনে এনে দেয়।

পরবর্তী ঘটনা এই দ্বন্দ্বের বিপরীত প্রান্তের অবয়বটিকে সুস্পষ্ট করে। দুর্গার মৃত্যুর কিছুদিন পরে হরিহরের এক জ্ঞাতি দাদা নীলমণি রায়ের বিধবা স্ত্রী তার দুই পুত্র-কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে নিশ্চিন্দিপুর আসে বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্য। লক্ষণীয় যে, হরিহর তাদের আত্মীয় হলেও নিছক বিত্ত-কৌলিন্যের বিভেদে গ্রামে পা ফেলা ইস্তক তারা হরিহরদের কার্যত অবজ্ঞা করতে থাকে। আত্মীয় হলেও, সুনীলের মা সর্বজয়ার উঠানে পা দেয়না, অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন প্রতিবেশি ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির একটি অংশে থাকতে শুরু করেন। তার স্বামী ‘কমিসারিয়েটে’ চাকরি করতেন, সন্তানদের তিনি কলকাতায় রেখে পড়াশোনা করান, প্রভূত গর্বচিত অহংকারে প্রথমাবধি সুনীলের মা আচরণে, অবহেলায় সর্বজয়াকে বুঝিয়ে দেন, যে সম্পর্কে জা হলেও সে কোনোভাবেই তার সমকক্ষ নয়। এমনকী সুরেশ, অতসিকে অপুর সাথে মেলামেশা করতেও বারণ করে দেন তিনি – “সুনীলের মা নিজের ছেলেকে গ্রামের কোনো ছেলের সঙ্গেই বড় একটা মিশিতে দেন না, অপুর সঙ্গেও নয় – পাছে পাড়াগাঁয়ের এই সব অশিক্ষিত অসভ্য ছেলেপিলের দলে মিশিয়া তাঁহার ছেলেমেয়ে খারাপ হইয়া যায়। .... সুরেশও এপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বড় একটা মেশে না। .... গাঁয়ের অন্য কোনো ছেলে মিশিবার যোগ্য বলিয়া সেও বোধ হয় বিবেচনা করে না।”[১৬] অর্থাৎ, গ্রামজীবনের গল্প রচনা করতে গিয়েও বিভূতিভূষণ অতি সংক্ষিপ্তে সেই গ্রামে আগত ক্ষণিকের এক শহুরে অতিথির অন্যবাসের ধারণাটিও রেখে যান, যে ধারণায় গ্রাম এবং শহর, দুটি পৃথক অস্তিত্বের প্রকটতাই নজরে আসে।

দুই

‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাস যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখানে একদিকে দেখা যায় নিশ্চিন্দিপুরে ফেরার জন্য অপুর সকাতর প্রার্থনা, আর অন্যদিকে সেই প্রার্থনা যার কাছে, সেই পথের দেবতার তাকে জীবন পরিক্রমণে সংলগ্ন করার বাসনা। ‘অপরাজিত’ উপন্যাসে ঠিক এই দোটানাটুকুই অপুর কৈশোর যৌবন জুড়ে পর্বায়িত হয়ে গেছে। রায়চৌধুরীদের বাড়িতে অপু, সর্বজয়ার পূর্বাপর অবস্থান বহাল রয়েছে এ উপন্যাসের শুরুতেও। ঠিক যেভাবে গত পর্বে সর্বজয়া বড়লোকের বাড়ির মজুর শ্রেণীতে ঠাঁই পেয়েও নিজের গ্রামীণ পরিসরের অস্বস্তিতে শহুরে ঝি-রাঁধুনীদের মধ্যে নিজেকে অভ্যস্ত করতে পারেনি, তেমনই অপুও এই প্রাসাদের আনাচে-কানাচে নিজের অবস্থানকে সহজ করে নিতে পারেনি। লীলার মতন বাল্যসঙ্গীও অপুর সেই ফিরে যাওয়ার স্রোতকে উলটো টানে ধরতে পারেনি কখনো। তাই মনসাপোতায় সর্বজয়ার জ্যাঠামশাইয়ের কাছ থেকে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব আসা মাত্র মা ও ছেলের মানসে পূর্বজীবনকে নতুন করে ফিরে পাওয়ার এক উদগ্রীব বাসনা নজরবন্দী হয়। অপুর মননে, ‘এদের এখেনে একদন্ড

ভালো লাগে না', এবং 'মুক্তি, এতদিন পরে মুক্তি', এই যুগপৎ চেতনার আনন্দ-বিস্ময় প্রকাশ পায়। সর্বজয়াও বুক বাঁধে আশায় – 'আবার গৃহ মিলিবে, আশ্রয় মিলিবে, নিজের মনোমতো ঘর গড়া চলিবে!'

এক দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তিতে অপুর জীবনের পরিচলনকে সম্বল করে এই উপন্যাস। এই কালচেতনায় সামিল হয় বহু মানবজীবন, অপুকে তারা ঋদ্ধ করে, রিক্তও করে, কিন্তু তার চলার পথ কোথাও রুদ্ধ হয়ে যায়না। যদিও চেতনার নিঃসীম আশ্রয়ে কোথাও বাসা করে নেয় নিশ্চিন্দিপুর। অপুর প্রবাস জীবন বারবার টুটি চিপে ধরে তার এই জীবনমুখীনতায়। সে বিড়ম্বিত হয়, শহুরে দৈন্যতা তাকে ক্লেদাক্ত করে, এই বদ্ধ জীবনের ক্রমাগত ক্ষয় তার স্বপ্নজালকে ছিন্ন করার থাবা বাড়ায় কতবার। অথচ এসবের মাঝেও অপু নিজের জীবনাচরণে কোথাও দীন হয়ে পরেনা। কারণ তার মানস প্রেক্ষাপটে আশ্রয় হয়ে থাকে নিশ্চিন্দিপুর। অপরাজিত অপুর পরাজয়ের শঙ্কাকে মুহূর্তে মলিন করে দেয় নিশ্চিন্দিপুরের স্মৃতি, সেখানকার জল-হাওয়াদের কাব্য, যা অপুর অন্তঃসারকে এক পরশপাথরের মহিমায় সদা অমলিন করে রাখে।

ঠিক এই কারণেই শৈশবের সেই নিশ্চিন্দিপুরের অন্বেষণ অপুর চেতনা থেকে কখনো বিলুপ্ত হয়না। ভ্রাম্যমান দিনরাতের মাঝেও অপু থেকে থেকেই খুঁজতে থাকে তার সেই নিশ্চিন্দিপুরকে। অথচ সেই অন্বিষ্ট অপুর সংলগ্ন হয় না কিছুতেই। মনসাপোতার জীবন সম্পর্কে তার মনে যে আনন্দের বীণা বেজেছিল, অচিরেই সেই সুর স্তব্ধ হয় সেখানকার বহুত্বের ব্যাপ্তির কারণে। মনসাপোতা সমৃদ্ধ গ্রাম ; নিশ্চিন্দিপুরে, প্রায় জঙ্গলের মধ্যে নির্জনে তাদের দরিদ্র সংসারটির মতন একটেরে অবস্থান এখানে তাদের নয়। নিশ্চিন্দিপুরে বালক বয়সের হেসে খেলে বেড়ানোর দিনগুলি যেন দুর্গার সাথেই বিলুপ্ত হয়েছে, মনসাপোতায় আর তেমনটা ঠিক হয়না। এখানে অপুদের বাস মূলত ব্রাহ্মণ হিসাবেই। নিত্যিপূজা, সত্যনারায়ন, লক্ষ্মীপূজা, ইতুপূজা, বিভিন্ন ব্রত উদযাপনসহ রকমারী আরও বামুনগিরিতে অপুকে নিয়োজিত হতেই হয়, পেট চালানোর দায়ে। অথচ অপু স্বপ্ন-প্রবণ, কল্পনা বিলাসিতায় সে বিশ্বভ্রামণিক, সর্বোপরি পাঠাভ্যাস তার কাছে যেন মুক্তির মতন, সেসবই এখানে বন্ধ হওয়ার উপক্রম। অচিরেই অপু বুঝতে পারে, মনসাপোতা গ্রাম হলেও নিশ্চিন্দিপুর যেমন তার কাছে এক স্বপ্নিল আশ্রয়ের মতন, তেমনটা কখনোই নয় – "অপুর কেমন মনে হয় নিশ্চিন্দিপুরের সে অপূর্ব মায়ারূপ এখানকার কিছুতেই নাই। এই গ্রামে নদী নাই, মাঠ থাকিলেও সে মাঠ নাই, লোকজন বেশি, গ্রামের মধ্যেও লোকজন বেশি। নিশ্চিন্দিপুরের সেই উদার স্বপ্নমাখানো মাঠ, সে নদীতীর এখানে নাই, তাদের দেশের মতো গাছপালা, কত ফুলফল, পাখি, নিশ্চিন্দিপুরের সে অপূর্ব বন-বৈচিত্র্য, কোথায় সে সব? কোথায় সে নিবিড় পুষ্পিত ছাতিম বন, ডালে ডালে সোনার সিঁদুর ছড়ানো সন্ধ্যা?"[১৭] এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, উনিশ ও বিশ শতকের সাহিত্যধারার প্রভেদও। গ্রাম এবং শহরের ভেদ যে কেবলমাত্র দুটি অবস্থানকল্পের ভেদ নয়, বিশ শতকে সেই নিবিষ্টতা সাহিত্যে আরও প্রগাঢ়তা পায়। অর্থাৎ গ্রাম মাত্রেই তা যে সামূহিক

নিশ্চেতনার আশ্রয় পটভূমি, তা যেন নয়, বরং গ্রাম হল সেই পূর্বাপর অবস্থান, যেখানে রয়ে যায় ছিন্নমূল হওয়ার ইতিহাস।

অপুর জীবনে 'বাহিরের ডাক' এসে পৌঁছায়। ছাত্রবৃত্তি পেয়ে মনসাপোতা থেকে দেওয়ানপুরের বোর্ডিং স্কুলে এসে ভর্তি হয় সে। সেখানেই একদিন দেখা হয়ে যায় শৈশবের সঙ্গী নিশ্চিন্দিপুরের পটুর সঙ্গে। উভয়ের কথোপকথন জুড়ে থাকে নিশ্চিন্দিপুর, সেখানকার পরিচিত মানুষজনের খোঁজখবর, বিনিময়। বোর্ডিং-এ অপুর নিজস্ব একটি জগৎ তৈরি হওয়া সত্ত্বেও পটুর হঠাৎ উপস্থিতি অপুর হৃদয়কে আর্দ্র করে তোলে – "এ সব কিচ্ছু না-স্বপ্ন। বাবার মৃত্যু, এই বিদেশে, এই স্কুলে পড়া- সব স্বপ্ন। কবে একদিন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখিবে সে নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে তাহাদের সেই বনের ধারের ঘরটাতে আষাঢ়ের পড়ন্ত বেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল-সন্ধ্যার দিকে পাখির কলরবে জাগিয়া উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভাবিতেছে, কী সব হিজিবিজি অর্থহীন স্বপ্নই না সে দেখিয়াছে ঘুমের ঘোরে!... বেশ মজা হয়, আবার তাহার দিদি ফিরিয়া আসে, তাহার বাবা, তাহাদের বাড়িটা।"[১৮] মনসাপোতায় একলা দিনাতিপাত করতে থাকা সর্বজয়ার মনেও নিশ্চিন্দিপুর পুনরায় ঘুরে ফিরে আসে – "কত সব কথা মনে পড়ে – নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ির কথা, দুর্গার কথা। এ জায়গা ভালো লাগে না, এখন মনে হয়, আবার যদি নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইত! একদিন যে-নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া আসিতে উৎসাহের অবধি ছিল না, এখন তাহাই যেন রূপকথার রাজ্যের মতো সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারকার ধরা-ছোঁয়ার বাহিরের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে!"[১৯] এই নিশ্চিন্দিপুরে বাস করবার আকাঙ্ক্ষা সর্বজয়া আমৃত্যু জিইয়ে রাখে। অসুস্থ হওয়ার আগে অপুর সাথে তার শেষ সাক্ষাতে ফিরে আসে গ্রামে ফেরার পুনর্বাসনা – "সর্বজয়া বলে, - তুই মানুষ হ'লে, তোর একটা ভাল চাকরি হ'লে, তোর বৌ নিয়ে তখন আবার নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে ভিটেতে কোঠা উঠিয়ে বাস করবো। বাগানখানা কিন্তু যদি নিতে পারিস – বড় ইচ্ছে হয়।"[২০] দেখা যায়, ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ অপুর প্রাণের সাথে সম্পর্কিত প্রায় প্রতিটি মানুষকেই তাদের নিজ নিজ গ্রাম থেকে শহরে এনে ফেলেন, এবং সেই সব মানুষদের মনের আয়নায় অপুর নিশ্চিন্দিপুর সম্পর্কিত আবেগকে প্রতিফলিত করে তোলেন। তাই সর্বজয়া বা অপর্ণার মনের ইচ্ছায় যেন অপুর আবেগই আরও দ্যোতনা লাভ করে। লক্ষণীয় যে, মৃত্যুর আগে যেমন সর্বজয়া নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ জানিয়েছিল অপুকে, অপর্ণার সাথে শেষ দেখাতেও সে-ও তাকে প্রায় একইরকম মনোবাঞ্ছা জানিয়েছিল – "দ্যাখো, মনসাপোতার ঘরটা এবার খুঁচি দিয়ে রেখো। নইলে বর্ষার দিকে বড্ড খরচ পড়ে যাবে, কলকাতার বাসায় তো চিরদিন চলবে না – ওই হ'ল আপন ঘরদোর। এবার মনসাপোতায় ফিরব, বাস না করলে খড়ের ঘর টেঁকে না।"[২১]

উপন্যাসের অন্তঃকরণে যেমন অপুর নিশ্চিন্দিপুর সম্পর্কিত রোমাঞ্চের ধারা সদাজাগ্রত ছিল, তেমনি বহিঃপ্রেক্ষাপটে ছিল জ্ঞানতৃষ্ণার কোরক, যা অপুকে শহরমুখী করে তুলেছিল প্রথম থেকেই। কেবলমাত্র পড়াশোনার কৌতুহলেই তাকে যে আরও আরও পথ অতিক্রম করে পৌঁছে যেতে হবে সেইখানে, যেখানে তার এই তৃষ্ণা মিটবে, এমন

সংবেদ প্রথমাবধি ঔপন্যাসিক তার মধ্যে রোপন করেছিলেন। কেবলমাত্র স্কলারশিপের বরাতে অপু সেই জট খুলতে খুলতে তার ইচ্ছাপূরণের দিকে এগিয়ে যায়। কলকাতা শহরের সম্ভাবনা সম্পর্কে অপুর মনে বরাবরই একটা প্রীতিজাত উন্মাদনা উৎসমুখ খুঁজেছিল। অবশেষে কলেজে পড়ার সুবাদে সেই দ্বারোদঘাটন সম্ভবপর হয়। স্বভাবতই দীর্ঘ উত্তেজনার ক্রমপ্রাপ্তি অপুর মনে মোহবিস্তার করে – "কলিকাতায় যাইবার পূর্বদিন রাত্রে আগ্রহে উত্তেজনায় তাহার ঘুম হইল না। মাথার মধ্যে যেন কেমন করে, বুকের মধ্যেও। গলায় যেন কী আটকাইয়া গিয়াছে। সত্য সত্য সে কাল এমন সময় কলিকাতায় বসিয়া আছে?...কলিকাতায়!... কলিকাতা সম্বন্ধে কত গল্প, কত কী সে শুনিয়াছে। অত বড় শহর আর নাই। কত কি অদ্ভুত জিনিস দেখিবার আছে, বড় বড় লাইব্রেরি আছে, সে শুনিয়াছে বই চাইলেই সেখানে বসিয়া পড়িতে দেয়।"[২২] কলকাতা সম্পর্কিত অপুর এই মোহদাগ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অবলুপ্ত হয়। উপন্যাসের রচনাকাল হিসাবে যে সময় অপু কলকাতায় আসছে, সেই মহামন্দার কালের সূত্রপাত। গ্রামের মানুষের কৃষিবিমুখতার কারণে ফসল উৎপাদন হ্রাস, উৎপাদিত ফসলের অধিক অংশে ব্রিটেনে সেনাবাহিনীর ভাগ, সর্বোপরি এক অর্থনৈতিক মহামন্দা সেই সময়ের বাংলাদেশকে কবলিত করছে। গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ কাজের আশায় শহরে এসে ঠাঁই নেওয়ায় বাড়ছে শহরের জনস্ফীতি। ফলত, কলকাতা সে সময় শহরের মুখোশ পরা এক অস্থিচর্মসার প্রেতচেহারায় পরিণত হয়েছিল বলা যেতে পারে। স্বভাবতই, আজন্ম নিশ্চিন্দিপুরের মায়াজাল বিছানো স্বপ্নিল দেশকে বুকে ধারণ করে এই প্রেতজীর্ণসার কলকাতাকে বেশিদিন ভালো লাগানো অপুর পক্ষে কার্যত অসম্ভব ছিল। খাওয়া, থাকার কষ্ট ছাড়াও আশেপাশের মানুষগুলোর সভ্যতাদীর্ণ বিকলতা তাকে কষ্ট দিত। এমনকী নিশ্চিন্দিপুর সম্পর্কিত মানুষেরাও যে শহরে এসে নিতান্তই অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহারে বিদ্ধ করতে পারে, এ ধারণা অপুর চেতনার অগম ছিল। কিন্তু নিশ্চিন্দিপুর অপুর কাছে এমন এক পরশপাথর, সে পাথরের কষ্টছোঁয়াও অপুর বোধে প্রীতির সঞ্চার করত। তাই, সুরেশের সাথে কলকাতার রাস্তায় অতি ঠান্ডা অবজ্ঞামিশ্রিত ব্যবহারও অপুকে চমকপ্রদ করেছিল কেবলমাত্র এই কথা ভেবে যে, যার সাথে প্রথম দেখা সেই নিশ্চিন্দিপুরে, আজ তার সাথে এই শহরের রাস্তায় হঠাৎ সাক্ষাৎ যেন নিশ্চিন্দিপুরের উপস্থিতিই নিজের অন্তকরণে আরও গভীর ভাবে জানান দিয়ে যায়। কিন্তু শহর এমন এক অবস্থান, যা এই মায়াবোধকে জাল বিস্তারের আগেই অনায়াসে ছিন্ন করতে পারে। অপুর ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। অর্থকষ্টে পড়াশোনা বন্ধ হওয়া, চাকরি-টিউশানের চেষ্টা, ক্রমব্যর্থতা এবং সাহচর্য্যের মতন অর্থকষ্টের পথ পেরিয়ে যে চাকরি অপু পেয়েছিল, তাও তার জগৎকে সুন্দর করতে পারেনি, বরং সেই বদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি, পরাধীনতা বোধ অপুর স্বকীয়তাকে পিষে দিচ্ছিল ধীরে – "অপুর মনে হয় তাহার জীবনের সব বৈকালগুলি এরা পয়সা দিয়া কিনিয়া লইয়াছে, সবগুলি এখন ওদের জিম্মায়, তাহার নিজের আর কোন অধিকার নাই উহাতে। .... এই আপিস জীবনের বদ্ধতাকে অপু শান্তভাবে, নিরুপায়ের মতো দুর্বলের মতো মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। ইহার বিরুদ্ধে, এই মানসিক দারিদ্র্য ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাহার মনে একটা যুদ্ধ

চলিতেছে অনবরত, সে হঠাৎ দমিবার পাত্র নয় বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে,-"।[২৩] এ বোধ সহজগম্য যে, কার্যত এই দ্বন্দ্ব, এই চির-বিরোধই অপুকে কালক্রমে কলকাতা থেকে বহুদূরে মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ বনভূমির নির্জনে স্থাপন করেছিল। কিন্তু তার এই দূরতর অবস্থান কখনো তার সেই ভিটের বোধকে পরাভূত করেনি। যত দূরে গেছে, যত সময় পেরিয়েছে, নিশ্চিন্দিপুর অপুর জীবন-বোধের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। ঠিক এই কারণেই কাজলের বেড়ে ওঠার ভরকেন্দ্র হিসাবেও অপু তার নিজের গ্রামকেই বেছে নেয়। বিদেশে পাড়ি দেওয়ার আগে নিশ্চিন্দিপুরে রানুদিদি'র কাছে কাজলকে রেখে যায় সে।

প্রায় বিশ বছর পরে সেই স্বপ্ন মাখানো রাত, সেই নিঝুম দুপুর অতিবাহিত করা নিশ্চিন্দিপুরের পোড়ো ভিটেয় ফিরে আসে অপু। অথচ এই ফিরে আসা ফিরিয়ে নেওয়ার নামান্তর হয়ে ওঠেনা আর। অপু উপলব্ধি করে, গ্রামে ফিরে এলেও সেই ফেরার অনুভূতি তাকে ততটা আনন্দ দিচ্ছেনা, যতটা দীর্ঘ বছর গ্রাম থেকে দূরে থাকা অবস্থায় তার শৈশবস্মৃতি দিত। যে বয়সোচিত বোধ নিয়ে সে গ্রাম ছেড়েছিল, আজ তার পরিমার্জনে সে এক অন্য মানুষ। তার চেতনা, তার বিশ্লেষণ-সমালোচনা-বিজ্ঞানমনস্কতা তাকে এক অন্য অপূর্ব রায় করে গড়ে তুলেছে দীর্ঘ বৎসরের সাধনায়। ফলে, অপুর বীক্ষায় গ্রামও তার চরিত্র পালটে ফেলেছে। নিশ্চিন্দিপুরে ফেরা ইস্তক সে তার শৈশবের মাঠ-প্রান্তর, বন-বাদাড়, নদীর ঘাট, সর্বোপরি তাদের সেই পোড়ো ভিটেটুকুর সর্বত্র তার শৈশবের মায়া মাখানো দিনগুলোকেই খুঁজে গেছে একাত্মভাবে, পায়নি – "......কিন্তু সে অপূর্ব জগৎটা আর নাই। এখন যা আনন্দ সে শুধু স্মৃতির আনন্দ মাত্র। এবার নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া অবধি সে ইহা লক্ষ্য করিতেছে – এই বন, এই দুপুর এই গভীর রাত্রে চৌকিদারের হাঁকুনি, লক্ষ্মীপেঁচার ডাকের সঙ্গে কী এক অপূর্ব স্বপ্নমাখানো ছিল, দিগন্ত-রেখার ওপারে এক রহস্যময় কল্পলোক তখন সদা-সর্বদা হাতছানি দিয়া আহ্বান করিত – তাদের সন্ধান আর মেলে না।"[২৪] এই স্বপ্ন-কল্পলোকের পাশাপাশি গ্রামের বাস্তব জগৎ-বোধটিও অপুর বীক্ষায় ধরা পড়ে – "সে নিশ্চিন্দিপুরও আর নাই। এখন যদি সে এখানে আবার বাসও করে সে অপূর্ব আনন্দ আর পাইবে না – এখন সে তুলনা করিতে শিখিয়াছে, সমালোচনা করিতে শিখিয়াছে, ছেলেবেলায় যারা ছিল সাথী – এখন তাদের সঙ্গে আর অপুর কোনদিকেই মিশ খায়না – তাদের সঙ্গে কথা কহিয়া আর সে সুখ নাই, তারা লেখাপড়া শিখে নাই, এই পঁচিশ বৎসরে গ্রাম ছাড়িয়া অনেকেই কোথাও যায় নাই – সবারই পৈতৃক কিছু জমি-জমা আছে, তাহাই হইয়াছে তাদের কাল। তাদের মন, তাদের দৃষ্টি পঁচিশ বৎসর পূর্বের সেই বাল্যকালের কোঠায় আজও নিশ্চল... কোন দিক হইতেই অপুর আর কোন যোগ নাই তাহাদের সহিত।"[২৫]

'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' এক বিশাল সময়ের ব্যাপ্তিতে জীবনের পরিগমনের কথা বললেও তার ছত্রে ছত্রে বিধৃত করে জীবনব্যাপী এক দ্বন্দ্বের কাহিনি। এই দ্বন্দ্ব, চেতনার এবং যে চেতনার উৎসমুখ নির্বাপিত থাকে অপুর শৈশবের নিশ্চিন্দিপুর ও পরবর্তী জীবনের স্থানগত অবস্থানের পরস্পর-বিরোধী মেরুকরণের ভিত্তিতে। ইন্দির

ঠাকরুন, হরিহর-সর্বজয়া, অপু, এমনকী কাজলের মধ্যে দিয়েও সেই দ্বন্দ্ব-স্রোতই প্রবাহিত হয়ে যায় পর্বের পর পর্ব জুড়ে।

তথ্যসূত্র :

১। বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, পথের পাঁচালী, বিভূতি উপন্যাস সমগ্র, প্রথম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ – মাঘ ১৪১১, চতুর্থ মুদ্রণ – বৈশাখ ১৪২২, পৃ. ১২৩
২। ঐ, পৃ. ১২৯
৩। ঐ, পৃ. ১২৮
৪। ঐ, পৃ. ১৩০
৫। ঐ, পৃ. ১৩১
৬। ঐ, পৃ. ১৩১
৭। ঐ, পৃ. ১৪১
৮। ঐ, পৃ. ১৪১
৯। ঐ, পৃ. ১৫৩
১০। ঐ, পৃ. ১৬৫
১১। ঐ, পৃ. ১৬৫
১২। ঐ, পৃ. ১৬৫
১৩। ঐ, পৃ. ১৬৬
১৪। ঐ, পৃ. ১৬৭
১৫। ঐ, পৃ. ১৪
১৬। ঐ, পৃ. ১১২-১১৩
১৭। বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, অপরাজিত, বিভূতি উপন্যাস সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ – মাঘ ১৪১২, দ্বিতীয় মুদ্রণ – অগ্রহায়ণ ১৪১৬, পৃ. ১২
১৮। ঐ, পৃ. ৩২
১৯। ঐ, পৃ. ৩৬
২০। ঐ, পৃ. ৮২
২১। ঐ, পৃ. ১৩৫
২২। ঐ, পৃ. ৪৬
২৩। ঐ, পৃ. ১৩০-১৩১
২৪। ঐ, পৃ. ২২৯
২৫। ঐ, পৃ. ২৩২

আকরগ্রন্থ :-
পথের পাঁচালী, বিভূতি উপন্যাস সমগ্র, প্রথম খন্ড, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ – মাঘ ১৪১১, চতুর্থ মুদ্রণ – বৈশাখ, ১৪২২
অপরাজিত, বিভূতি উপন্যাসে সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ – মাঘ ১৪১২, দ্বিতীয় মুদ্রণ – অগ্রহায়ণ, ১৪১৬
গ্রন্থঋণ :
বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, পঞ্চম সংস্করণ – মে, ২০১৫
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ড. দেবেশ কুমার আচার্য্য, আধুনিক যুগ, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২০০৭
পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর,শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ওরিয়েন্টাল ব্ল্যাকসোয়ান, দ্বিতীয় সংস্করণ– ২০১৬
শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ, বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, তৃতীয় মুদ্রণ – অক্টোবর, ২০১৪
দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন কথাসাহিত্য, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ – সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬
আখ্যান পরিক্রমা, উদয়চাঁদ দাশ, দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ – জানুয়ারি, ২০১৮
বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ –২০০০
বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ – নভেম্বর, ২০০৩

জীবনানন্দের কবিতায় রং

কৌশিক বিশ্বাস

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জীবনানন্দ এক নাম। প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানব জীবনের আঙিনায় প্রতিফলিত আলোয় যে জলছাপ তৈরি হয় তার পরিস্ফুটনে উপলব্ধ হয় বিমূর্ত ভাবধারা তা কিন্তু একমাত্র এই মানুষটির কবিতায় মূর্ত হয়ে ওঠে। সাহিত্য সৃষ্টির কাল থেকেই রং অবধারিত এক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে তা সে ছাপার অক্ষরের কালিই হোক বা কবিমনের সাদা রং যার আলোক বিচ্ছুরণে স্নাত হয় প্রতিটি পাঠক মন। পৃথিবীতে প্রায় সমস্ত অস্তিত্বও একটি নির্দিষ্ট রঙের কাঠামোয় আঁকা যেখানে দিনের রং সাদা আর রাত্রি হয় কালো। জীবনের রং নিয়ে ভাবনা প্রসঙ্গে আলেক্স মরিটের কথা প্রাসঙ্গিক। তিনি মনে করতেন, "জীবন অতি অবশ্যই রঙিন। আমরা দিনের বেলা গোলাপী, ব্যাংকের গচ্ছিত সঞ্চয়ের কথা ভাবলে কালো আর এই দুইয়ের সংমিশ্রণে জীবনের সবুজতা কোথায় যেন হারিয়ে ফেলি।" এমনকী আমাদের অনুভূতির বর্গাকার কম্পাঙ্কগুলিও কোন না কোন নির্দিষ্ট রঙের বাক্সে বন্দী। বিংশ শতাব্দীতে জার্মানিতে একটি বিশেষ

ভাবধারার বিকাশ হয়েছিল যেখানে চিত্রশিল্পীরা বাহ্যিক প্রতিফলনের রঙিন রূপ বর্জন করে তাদের মানসপটে প্রতিফলিত রঙে রঙিন করেছিলেন সাদা ক্যানভাস। বাংলা সাহিত্যে কবিতা রচনায় জীবনানন্দও যেন অনুরূপ ভাবধারার সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তাঁর নানা সময়ে রচিত বিভিন্ন কবিতার মধ্যে যা তাকে কবিতা সৃষ্টি ক্ষেত্রে অনন্য করে রেখেছে। এমনভাবে বাংলা কবিতায় রং এর ব্যবহার ইংরেজি সাহিত্যে সনেট রচনায় শেক্সপীয়ারকে মনে করিয়ে দেয়। বিশ্বের চিত্রশিল্পের পট পরিবর্তনে শুরু হয়েছিল এক নবচেতনার উন্মেষ যা শুরু করেছিলেন চিত্রশিল্পী রেমব্রান্ট। নবজাগরণের সাথে সাথে চিত্রাঙ্কনের রং এর ব্যবহারে শুরু হয়েছিল এক আমূল পরিবর্তন। রেমব্রান্টের তৎকালীন ছবিগুলির পর্যবেক্ষণে এর ছাপ স্পষ্ট আর এখন উপলব্ধির ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক।

চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে আলো-ছায়া ও হলুদ আভার ব্যবহার অন্য সব চিত্রশিল্পীদের থেকে রেমব্রান্টকে পৃথক করেছে আর এখানেই জীবনানন্দের প্রাসঙ্গিকতা বাংলা কবিতা সৃষ্টির জগতে। তাঁর কবিতার লাইনগুলি যেন একেকটা 'ঝরে যাওয়া হলুদ পাতা'র মতোই নির্দেশক বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়।

জীবনানন্দের বিভিন্ন কবিতায় ধরা পড়েছে রঙীন ক্যানভাসে রাখা টুকরো কোলাজ। কবির মানসিক প্রতিফলনের সূচক হিসেবে কাজ করেছে এই রং গুলি তাঁর কবিতায়। এই নানা রং দিয়েই তিনি যেন ছবি এঁকে গিয়েছেন অবিরত। সে ছবি কখনো হয়েছে মূর্ত থেকে বিমূর্ত আবার কখনো সেটাই হর্ষ-বিষাদের মধ্যে এক সেতুবন্ধনের কাজ করেছে। 'রূপসী বাংলা' থেকে এই লাইনটি যেমন—''যদি দেখিব সবুজ ঘাস ফুটে উঠে / দেখিব হলুদ ঘাস ঝরে যায়।'' অদ্ভুত বৈপরীত্য এই সবুজ ও হলুদ রং ব্যবহারে। কিংবা ''থোরের মতন শাদা ভিজে হাতে / এখুনি আসিবে কিনা রাতি বিনুনি।'' অপূর্ব বিমর্ষতার প্রতীক হিসেবে এই সাদা রং এর ব্যবহার একমাত্র জীবনানন্দই পারেন। আবার একই রং বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনি একই কবিতায় ব্যবহার করেছেন। এর ব্যঞ্জনা হয়েছে তীব্র থেকে তীব্রতর ও সুদূরপ্রসারী। ''রূপসী বাংলা'' কেই যদি উদাহরণ হিসেবে দেখি তবে চিন্তার গতিধারা বিষয়ে তিনি কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন, তা সহজেই বোঝা যায়। একটি মাত্র রং তার গতিপথ বদলেছে বারবার বিভিন্ন পঙক্তিতে। 'নীল চাঁদ আলো', 'নীল সোনালি ভোমরা' থেকে উত্তরণের পথ বেয়ে তা হয়েছে 'নীলপাতা মৃদু ঘাস'। নীল ক্যানভাসে যেন সবকিছুই যেন আজ নীলাভ। কবিমনের মানসিক অস্থিরতা ধরা পড়ে যখন তিনি বককে কল্পনা করেন ধূসরতায়। ''ঝরা ফসলের গান'' কবিতায় তাঁর মানসিক হতাশার সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে যখন তিনি বুক ভরে নিয়েছেন 'হলুদ পাতার ঘ্রাণ'। সেখান তিনি ''কুড়ি বছর পরে'' পার হয়েছেন ''হলুদ নদী''। এভাবেই সকালবেলার রবির রং সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা পারে রাত্রিবেলার ''বুনো হাঁসে'' পেঁচার ধূসর পাখায় আছড়ে পড়ে।

এপ্রসঙ্গে এডওয়ার্ড হুপারের মন্তব্য ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ—আজ থেকে কয়েক সহস্র বছর বছর আগে যে লেখা সংরক্ষিত হয়েছিল তা কিন্তু শব্দ দিয়ে গড়া ছিল না; ছিল অঙ্কিত বা খোদিত। নবজাগরণের পরবর্তীতে এক নতুন ধরনের কবিতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সাহিত্য জগতে যা দৃশ্যমান কবিতা নামে খ্যাত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এত

সুন্দর রং এর ব্যবহার একমাত্র জীবনানন্দই করেছেন যা ইংরেজি সাহিত্য সম্ভারে সনেট লিখনে শেক্সপীয়ারকে মনে করিয়ে দেয়। তিনি যেন একের পর এক রং দিয়ে ভরিয়েছেন টুকরো জীবনের প্রতিটি কোণকে। কবির মানসিক প্রতিফলনের কম্পাঙ্ক কখন যেন কবিতার ক্যানভাস ছুঁয়ে ধ্বনিত হয়েছে পাঠক মনের অন্তঃপুরে। আর এখানেই জীবনানন্দ দাশ আজও অমলিন মুখে সাদা ক্যানভাসের সামনে রং এর জাদুদন্ড হাতে ঠিক যেন এক চিত্রশিল্পীর ন্যায় সময়কে ছাপিয়ে রেখে গিয়েছেন এক মুঠো রং সাদা পাতার অগণতি কালো লাইনে!

তথ্যসূত্র :

১। জীবনানন্দ দাশের কবিতা সমগ্র

২। Morritt, Alex Impromptu scribe, 2014, paxanax press, e-book.

৩। Hopper, Edward, quotes, pinterest.com

৪। Fogler Shakespeare Library, Shakespeare’s sonnets, Simon & Schuter, print 2004.

প্রসঙ্গ

বাঁকুড়া
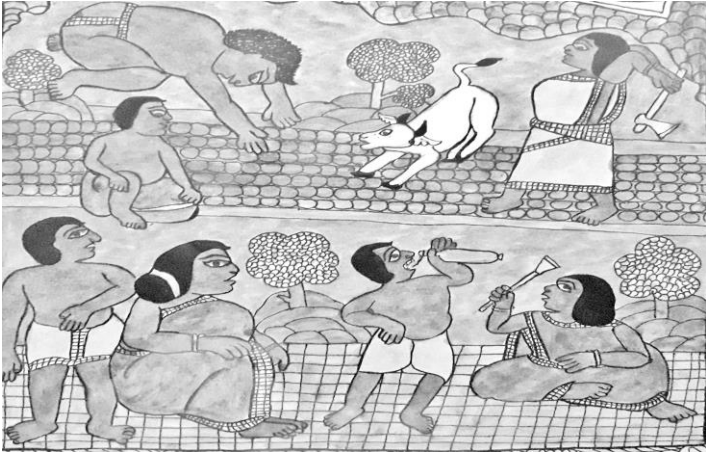
বাঁকুড়ার পটশিল্পীদের ধর্ম-বিশ্বাস

সুখেন্দু হীরা

বাঁকুড়া জেলার পটশিল্পীদের ধর্মবিশ্বাস অর্থাৎ গোত্র, আরাধ্য দেবতা, জন্ম ও মৃত্যুর সময় ক্রিয়াকলাপ, বিবাহ—এগুলি বেশ আকর্ষক এবং গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। বাঁকুড়া জেলার যে কয়েকটি স্থানে এই পটশিল্পীরা অবস্থান করেন তাদের সবাইকার ধর্মবিশ্বাস প্রায় এক। তবে স্থানবিশেষে সামান্য হেরফের আছে। স্থানানুযায়ী আলোচনা করা হল—

১। বেলিয়াতোড় (থানা বেলিয়াতোড়)
গোত্র : কাশ্যপ

[আদিবাসীদের মতো এদের গোত্রপিছু টোটেম আছে। এই গোত্রের টোটেম কচ্ছপ। এরা কচ্ছপ হত্যা করবে না, খাবে না, এমনকী ছুঁয়েও দেখবে না। একইভাবে আছে নাগ গোত্র। এরা সাপকে সাপ সম্বোধন না করে বলে—লতা। আরো আছে শঙ্খ গোত্র। তবে বাঁকুড়াতে কচ্ছপ তথা কাশ্যপ গোত্রের অন্তর্গত পটশিল্পীদের সংখ্যা বেশী।]

পূজা-পাঠ : কালীপূজা, মনসাপূজা।
জন্মের সময় ক্রিয়াকলাপ : আঁতুড় পর্ব চলে একুশ দিন যাবৎ।
মৃত্যুর পর ক্রিয়াকলাপ : গায়ে তেল, হলুদ, কর্পূর ও চন্দন মাখিয়ে এবং নতুন বস্ত্র পরিয়ে সাতফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে বসিয়ে নতুন বস্ত্র আচ্ছাদন দিয়ে (যাতে মৃতদেহে কোনোরকম মাটি না লাগে) কবর দেওয়া হয়। ঘাট সম্পন্ন হয় পনেরদিন পরে।
বিবাহ : সাধারণ হিন্দুদের মতোই এখন হয়ে গেছে।

২। গেরামডিহি (থানা বাঁকুড়া)
গোত্র : কাশ্যপ। যে পুকুরে কচ্ছপ থাকে, সেই পুকুরের জল পর্যন্ত তারা ব্যবহার করে না।
পূজাপাঠ : মনসাপূজা, ভাদ্র মাসের পনের তারিখে।
জন্ম : সাত অথবা নয় দিনে ঘরোয়া আচার, একুশ দিনে আঁতুড় তোলা।
মৃত্যু : তেল হলুদ মাখিয়ে মুখাগ্নি করে, সাদা কাপড় ঢাকা দিয়ে কবরে শোয়ানো হয়। ঘাট দশোদিনে, ভোজ এগারো দিনে, বাসিশ্রাদ্ধ বারো দিনে। এই বাসিশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানটি মূলত জামাইরা করে থাকে।
বিবাহ : দু'পক্ষের বয়োজ্যেষ্ঠ বসে সুপুরি দিয়ে খেলা হয়, তারপর গরুর মাথায় পরিয়ে দেয়। স্বজাতে বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এজন্য তাদের ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত কুটুমবাড়ি ছড়িয়ে আছে।

৩। তালগোড়া (থানা রানিবাঁধ)
গোত্র : কাশ্যপ
পূজাপাঠ : মনসাপূজা
জন্ম : প্রথানুযায়ী একুশ দিনে আঁতুড় তোলা হয়।
মৃত্যু : খালি গায়ে নতুন কাপড় চাপা দিয়ে মুখাগ্নি করা হয়, তারপর কবর দেওয়া হয়। প্রথামতো গায়ে তেল-হলুদ মাখানো হয় এবং খাটিয়াতে করে মৃতদেহ নিয়ে যায়। শেষযাত্রার সময় বলহরি-হরিবোল ধ্বনি দিতে দিতে নিয়ে যায়।
বিবাহ : সাধারণ হিন্দুদের মতোই হয়ে গেছে। বর্তমানে চিত্রকর পরিবার ছাড়াও অন্যান্য পরিবারে বিবাহ হচ্ছে।

৪। তুর্কিডাঙ্গা (থানা বিষ্ণুপুর)
গোত্র : কাশ্যপ।
পূজা : কালী (কার্তিক মাসে), মনসা। পুরোহিত ডাকা হয় না। নিজেরাই পূজা করে থাকে।
জন্ম : নয় দিনে নাড়ি কাটা হয়।
মৃত্যু : সাবান মাখিয়ে স্নান করানো হয়। তারপর তেল-হলুদ মাখিয়ে, চন্দন দিয়ে সাজানো হয় মৃতদেহটিকে। মাথা পূর্বদিকে রেখে গোর দেওয়া হয়।
বিবাহ : সাধারণ হিন্দুদের মতো হয়ে গেছে। চিত্রকর পরিবার ছাড়া অন্য পরিবারের সঙ্গেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা চলে।

৫। ভরতপুর (থানা ছাতনা)
গোত্র : কাশ্যপ।
পূজা : কালীপূজা (চৈত্র মাসে), মনসা।
জন্ম : ন'দিনে নাড়ি কাটা, একুশ দিনে আঁতুড়।

মৃত্যু : তিন দিনে তিতো ভাত। সারাদিন উপোস থেকে রাতে তিতোভাত। আতপ-চালে নিমপাতা দিয়ে তৈরি হয় তিতোভাত। প্রথম ছ'দিন আতপ চালের ভাত ও সিদ্ধ আহার। পরের দিনগুলি আতপ চালের সিদ্ধ ভাত। দশদিনে ঘাট। এগারো দিনে ভোজ। নিরাভরণ করে নতুন কাপড় চাপা দিয়ে কবর দেওয়া হয়। তার আগে মুখাগ্নি করা হয়। বাড়ি থেকে কবরস্থান পর্যন্ত খাটিয়া করে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়।
বিবাহ : চিত্রকর পরিবারের মধ্যেই বিবাহপ্রথা সীমাবদ্ধ। সগোত্রে কদাচিৎ নয়। তাই অন্যত্র আত্মীয়-কুটুম গড়ে তুলতে হয়।

৬। কালিপাহাড়ী (থানা ছাতনা)
গোত্র : কাশ্যপ।
পূজা : মনসা, কালী। বাড়ির মন্দিরে শিব-দুর্গাও আছে।
জন্ম : একুশ দিনে আঁতুড়।
মৃত্যু : মৃত্যুর পর কবর। তিনদিনে তিতো-ভাত। দশদিনে ঘাট-পর্ব সম্পন্ন।
বিবাহ : স্বজাতে।
৭। বাঁদাপাল (থানা ছাতনা)
গোত্র : জানে না। [এরা এরকমই দাবি করেছে]
পূজা : কালী, মনসা।
জন্ম : হিন্দুদের মতো স্বাভাবিক নিয়ম।
মৃত্যু : কবর দেওয়া হয় না। দশদিনে ঘাট, এগারোদিনে ভোজ।
বিবাহ : সাধারণ হিন্দুদের মতো।

৮। নোয়াডিহি (থানা হীড়বাঁধ)
গোত্র : কাশ্যপ, শঙ্খ (শাঁখা), নাগ।
পূজা : মনসা, কালী (কার্তিক মাসে)।
জন্ম : নয়দিনে নাড়ি-কাটা, একুশদিনে নখ কাটা।
মৃত্যু : তেল-হলুদ মাখিয়ে ঘরের মধ্যেই মুখাগ্নি করা হয় ও কবরস্থানে মৃতদেহটিকে শুইয়ে কবর দেওয়া হয়। দশদিনে ঘাট, এগারোদিনে ভোজ।
বিবাহ : ব্রাহ্মণ দিয়ে অথবা নিজেদের বয়োজ্যেষ্ঠ চিত্রকরকে দিয়ে বৈবাহিক কার্য সম্পন্ন করানো হয়। যদি কেউ অন্য জাতিতে বিবাহ করে, তাকে জাতিতে উঠতে হলে অন্যান্য চিত্রকরদের ডেকে ভোজ দিতে হয়।

এছাড়া চিত্রকরদের একটি গুপ্তভাষা আছে। যার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে। বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র এই গুপ্তভাষা তারা জানে। নোয়াডিহির চিত্রকররা জানায়, এই ভাষার নাম তামরিয়া ভাষা। উক্ত ভাষার কিছু শব্দ তুলে ধরা হল—
ডেম্বুর (=ঠাকুর), খোগ (=বাড়ি), ঝিকি (=প্রশাসন), ড্যামা (=পুলিশ), চিমা (=ছোটছেলে), খোটাচ্ছে (=জিজ্ঞাসা করছে) ইত্যাদি।

রাঢ়ের জৈন অবশেষ : সরাক জনগোষ্ঠী

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রাঢ়ের সভ্যতা সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন জৈন ধর্মাবলম্বীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তেমনি জৈন মতাবলম্বী 'সরাক' জনগোষ্ঠীও নৃ-সমাজবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও প্রধান ভূমিকা ছিল ধাতুবিদ্যায়। আহরণ-নিষ্কাশন-বিগলন ও বিপণনে তারাই ছিল অন্যতম প্রধান জনগোষ্ঠী। পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠীবণিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে লোহা, তামা, সোনা অন্যান্য মিশ্র-সংকর ধাতু ছড়িয়ে পড়লো বিশ্বের নানা প্রান্তে। প্রশ্ন হল, এই সরাক বা শ্রাবক কারা? কোথায় তাদের বসতি?

শ্রবক ও শ্রবকীর ভূমিকা ছিল নিজস্ব ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে, নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতির জ্ঞান বিতরণের কাজ। নিজেরা জৈন ধর্মগুরু বা তীর্থঙ্করদের কাছে শ্রবণ করে সেই অর্জিত ধর্ম উপাসনা বা সাধনার কথা বলতেন জৈন পীঠ বা শ্রমণকেন্দ্রগুলিতে। শ্রবক বা শ্রাবক কথাটি থেকেই অপভ্রংশে বা প্রাকৃতে শরাবক > শরাক > সরাঅক > সরাক শব্দবন্ধটির জন্ম। সংস্কৃত শ্রাবক শব্দটির বাংলা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল শ্রবণ করা বা শ্রবণকারী। বর্তমানকালের সমাজব্যবস্থায় 'সরাক' নামের স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীই হল রাঢ়বঙ্গের জৈনধর্মের নৃতাত্ত্বিক অবশেষ। জৈনধর্মে এই শ্রবক বা শ্রাবক-শ্রাবকীর স্থান ছিল অনেক উঁচুতে। তারা যেমন নিজেরা ধর্মচর্চার মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি করতেন তেমনি অর্জিত জ্ঞান বা সাধনার দিকগুলি স্বধর্মীয়দের মধ্যে বিতরণ করতেন। অর্থাৎ জৈনধর্ম প্রচার প্রসার ও মানবমুক্তির দিকগুলি তুলে ধরাই ছিল শ্রাবক/ শ্রবকীদের প্রধান কাজ। ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণের

মাধ্যমে শ্রবণশক্তিকে উচ্চকোটিতে পৌঁছে দিয়ে সাধনমার্গের প্রবর্তক বা প্রদর্শনের কাজটিই করে যেতেন এরা। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ই.টি. ডালটন সরাকদের সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন। যদিও এটিই একমাত্র প্রণিধানযোগ্য ছিল না। ধর্মসূত্র বা আচারসূত্রে অনেক উপাদান মেলে। পরবর্তীকালে এইচ. এইচ. রিস্‌লে তাঁর গ্রন্থে বলেছেন : "Their name is variant of SRAVAKA (Sanskrit- hearer) the designation of the Jain laity." (people of India, p.79) শুধু ডালটন, রিস্‌লে কিংবা হান্টার, ও'ম্যালি বা ক্যাপল্যান্ড, মি. বল-ই নয়, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের স্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সরাকদের কথা উল্লেখ করেছেন। আরও অনেক তথ্যসূত্র এবং ঐতিহাসিক প্রামাণ্য নথিতেও এই বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়। মোট কথা, 'শৃনোতি যঃ সঃ শ্রাবকঃ'। অর্থাৎ শ্রাবক কথাটির মিলি. অর্থ দাঁড়ায়—জিনবাণী বা ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে যিনি শ্রবণ ও পালন করেন তিনিই শ্রাবক।

আমরা সরাক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তত্ত্ব জানতে পেরেছি। সেইসব আলোচনার আগে আমরা রাঢ়বাংলার সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপটটি নিয়ে আলোচনা সেরে নিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। সামান্য কিছু অংশকে বাদ দিলে গোটা রাঢ় অঞ্চলে ছিল বৈদিক ভারতের পুরাভূমি বা ওল্ড অ্যালুভিয়ান। তখন ছিল সভ্যতার ঊষালগ্ন। একদিকে গাণ্ডোয়ানার ছোটনাগপুর মালভূমি, অন্যদিকে রাজমহল পাহাড়, সাঁওতাল পরগনাসহ মধ্যে খণ্ড-বিখণ্ড ভৌগোলিক ও প্রকৃতিগত মালভূমি—অরণ্যবেষ্টিত অঞ্চলটিই হল আজকের রাঢ়ভূমি। মালভূমি, অরণ্যময় অঞ্চলের বুকে প্রবাহিত হয়ে খনিজ সমৃদ্ধ, রক্তের মতো লালমাটি আর সোনামাখা পাথর, বালিকণা বয়ে এনে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশে গেছে। এই নবগঠিত গাঙ্গেয় সমভূমিকে স্বাতন্ত্র্যতা দান করেছে। অর্থাৎ অজয়, দামোদর, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী, শিলাবতী, সুবর্ণরেখা রাঢ়ের আদি প্রাণসত্তা। সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক। প্রাগৈতিহাসিক, মানব-সভ্যতার লালনভূমি। বহু পরে এল নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির স্রোতধারা। বলা যায়, ধাতুযুগই হল চরম উন্নয়নের সোপান। তখনো গোটা রাঢ় অঞ্চল জুড়ে ছিল আদিম সভ্যতা-সংস্কৃতির পুরু আবরণ। এখানেই ঘতে গেল সমাজ-সংস্কৃতির নতুন বিপ্লব। আরো পরিষ্কার করে বললে দাঁড়ায়, খ্রিষ্টপূর্ব এবং খ্রিষ্টের জন্মের চারশো বছরের মধ্যে রাঢ় অঞ্চলই হল তখনকার বঙ্গ> বঙ্গাল এর মধ্যমণি। নব্য ধর্মমত বা পথের দিশা দেখালো আর্যসভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রচারক জৈন মতাবলম্বীগণ। ধর্মীয় গোঁড়ামি, হিংস্রতা, প্রতিহিংসা, বলিদান, রক্তাক্ত সংগ্রাম, হোম, যাগ-যজ্ঞের অলৌকিকতা বা কঠোরতা কিংবা পৌত্তলিকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রচারে নামলেন তারা। সকল জীবের মুক্তির জন্য জন বা ইন্দ্রিয়কে জয় করার কথা প্রচার করতে লাগলেন। অহিংসার বাণী পরবর্তীকালে হয়ে গেল জৈনধর্ম। ভাবতে অবাক লাগে ভগবান মহাবীরের জন্মের আড়াইশো বছরেরও আগে এই সামাজিক ধর্মীয় বিপ্লব ঘটেছিল। যাইহোক, বর্তমান বিহার, উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত এলাকা হয়ে সমেত শিখর বা পরেশনাথ পাহাড় বেয়ে ঝরিয়া, ধানবাদ, গিরিডি পেরিয়ে দামোদর কংসাবতীর অববাহিকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেন ধর্মপ্রচারকগণ। আদিগুরু ঋষভনাথ, আদিনাথসহ মহামুনি পার্শ্বনাথ পর্যন্ত রাঢ়ের বুকে জনজোয়ার আনলেন। তখনো বাংলা

ভাষালিপির প্রচলন ঘটেনি। মোটামুটিভাবে বাঙালিরা কৃষিনির্ভর সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত। কৃষিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় পণ্যপরিবহন, খনিজ আহরণ, পণ্য বিনিময় কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা প্রসারণ ঘটল জৈনযুগেই। কৃষিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা অন্যদিকে খনিজ তামা ও লোহার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল অবিশ্বাস্যভাবে। পূর্বভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের বর্তমান ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার ও বাংলায় জীবন-জীবিকার পাশাপাশি জৈনধর্মের ব্যাপক প্রসার পড়ল। জৈন বণিক থেকে শ্রেষ্ঠী মহাজন সম্প্রদায় বড় ভূমিকা নিয়েছিল গ্রাম-জনপদগুলিতে অহিংসা ধর্ম প্রতিষ্ঠায়। ধর্মমতের ওপর গভীর আস্থা ও আনুগত্য রেখে জন্ম নিয়েছিল শ্রাবকগোষ্ঠীরই শাখা সরাক জনগোষ্ঠী। আদিতে শ্রাবকগোষ্ঠী শুধুমাত্র ধর্মপ্রচার, প্রসার এবং জৈনগোষ্ঠীদের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়েই জীবনযাপন করত। পরবর্তীকালে কৃষিভত্তিক গোষ্ঠীজীবন এবং বৈশ্য প্রথায় বিশ্বাসী ও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আকরিক খনিজ নিষ্কাশন থেকে উত্তোলন, পরিবহণ এবং বাণিজ্যিক লেনদেনেও যুক্ত হয়ে পড়ে বলে জানা যায়। শুধু ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক, পণ্ডিত ও গবেষকগণই নন, মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর শ্লোকেও মেলে তখনকার সরাক সমাজজীবনের চালচিত্র। তিনি তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ করেছেন—

‘সরাক বৈসে গুজরাটে জীবজন্তু নাহিকাটে
সর্বস্থলে তারা নিরামিষ।’

আবার নৃতাত্ত্বিকগত সমাজজীবনে রাঢ় অঞ্চলে একটি প্রচলিত প্রবাদে তাদের সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়—

‘উড়ুক ডুমুর পুড়ুং ছাতি
তিন না খায় সরাক জাতি।’

অর্থাৎ পাখি, ডুমুর এবং এক ধরনের ছাতু (ছত্রাক) খায় না সরাক জনগোষ্ঠীর লোকেরা। এমনি আরও অনেক প্রবাদ-প্রবচন, লোকশ্রুতি, জনশ্রুতিতে সরাক জনগোষ্ঠীর সমাজজীবন ও জীবনচর্যার কথা জানা যায়। আরও জানা যায় সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি এবং সংস্কারের কথা। প্রশণ হল সরাক জনগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান কোথায় ছিল? জৈন বসতিগুলির সঙ্গে সরাক জনগোষ্ঠী কতটা সম্পৃক্ত ছিল? প্রাচীন সূত্র এবং ইংরেজ পণ্ডিতদের উল্লিখিত তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, সরাক জনগোষ্ঠী জৈনধর্মের প্রচার প্রসারকালে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে পূর্বের রুক্ষ ও শুষ্ক মালভূমি অঞ্চলে বসতি বিস্তার করে। বিশেষত খ্রিষ্টপূর্ব তিন শতক থেকে ছয় শতক পর্যন্ত গোটা রাঢ়বঙ্গ হয়ে দক্ষিণের বিস্তীর্ণ অংশে জৈন ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। জৈন ধর্মগুরু, ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে এই শ্রাবক বা সরাকরাও নানা স্থানে বসতি স্থাপন করে। রিস্‌লে সাহেবের বক্তব্য থেকে জানা যায়, ‘ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তদেশ থেকে আসা এক উচ্চবর্গীয় সাংস্কৃতিক চেতনাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর লোক হল শ্রাবকরা।’ তিনি বলেছেন, ‘বিজাতীয় শাসনকালে মূলত মোগল আমলে এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।’ শুধু উত্তর-পশ্চিম নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতেও তাদের আধিপত্য ছিল এক সময়। পরবর্তীকালে বর্তমান ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রসহ কয়েকটি প্রদেশে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। তাদের গৌরবময় অতীত, জৈন মন্দির, মূর্তি ও বসতি বিন্যাসের প্রামাণ্য

নিদর্শনগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আজও। মূলকথা হল, রাঢ়ে জৈন বসতি কিংবা জনবিন্যাসে সরাক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যেমন ধাতু বা খনিজ সম্পদ সম্পৃক্ত, তেমনি ধর্মের স্থায়িত্ব, জনপ্রিয়তা ও মতবাদে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলাটাও ছিল সরাকদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে সহায়ক। অহিংস মত ও পথে থেকেও কৃষি ও বাণিজ্যে তাদের ছিল একাধিপত্য। আখ, গুড়, পান, পাটসহ অন্যান্য কৃষিজ পণ্য, খাদ্যশস্য বিপণন-বিনিময় কাজে তাদের সমাজজীবনে এসেছিল চরম সাফল্য। জৈন বিনষ্টির কালে সরাক জনগোষ্ঠীর গৌরবও ম্লান হতে শুরু করল। ছোট ছোট গ্রাম জনপদে নিজেদের গোষ্ঠী জীবনের কাজকর্ম, ধর্মচর্চা, উপাসনা ম্লান হতে শুরু করল। প্রবল জৈনধর্মের প্লাবন প্রায় দেড়-দুশো বছরের মধ্যে থিতিয়ে গেল। পাল পরবর্তী যুগে একদিকে গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের প্রবল হিন্দুত্ব এবং তারপরেই সেন বংশের উত্থান, শৈব-বৈষ্ণব ধর্মের স্রোতধারায় অহিংস ধর্মের কালচক্রে যেন চাপা পড়ে গেল জৈন মন্দির, দেব দেউল ও শ্রমনকেন্দ্র, জৈনপীঠগুলির মাটির তলায়। হিন্দুধর্মের পাশাপাশি সহজিয়া, নাথ, তন্ত্র গ্রাস করলেও নৃতাত্ত্বিক অবশেষ হিসেবে থিতিয়ে পড়ে রয়ে গেল সরাক জনগোষ্ঠী। ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, গুজরাট থেকে রাজস্থান পর্যন্ত সরাক জনগোষ্ঠী আজও বিদ্যমান। তাদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আজ আর আদি অকৃত্রিম জৈন অনুশাসন মনস্কতায় নেই। না থাকলেও এখনো বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার সরাক-অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে তাদের বংশানুক্রমিক ধারাটি বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছে ইন্দ্রিয়ের সাধনার মাধ্যমে। বর্তমানে শুধু বিস্তীর্ণ মানভূম, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা-ই নয়, বাঁকুড়ার মতো জেলার তিনটি থানা এলাকায় বেশ কিছু ছোট-বড় সরাক-অধ্যুষিত গ্রাম আছে। ছাতনা, শালতোড়া ও গঙ্গাজলঘাটি এলাকায় মাজি, মান্না, মণ্ডল পদবীধারী বহু সরাক পরিবার বসবাস করেন। শুধুমাত্র গঙ্গাজলঘাটি থানা এলাকাতেই প্রায় চার হাজারের মতো সরাক বাস করেন। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে চারটি থাক (শ্রেণি) রয়েছে। এই থাকগুলির মধ্যেই সামাজিক পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

সাম্প্রতিককালে ভারতের সংবিধান সরাক জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে মান্যতা দিয়েছে। সামাজিক, ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-আচরণের পাশাপাশি তাদের অধিকার, সামাজিক বঞ্চনাসহ বিভিন্ন দাবি পূরণ ও সমাধানের লক্ষ্যে সাংগঠনিকভাবে আন্দোলনও গড়ে তুলেছেন। সবশেষে বলতেই হয় আদিদেব ঋষভনাথ, আদিনাথ, শান্তিনাথসহ বহু জৈন মুনি-ঋষির উত্তরসূরি এই বংশধরগণ। এই জনগোষ্ঠী আজও ভগবান মহাবীর ও জীনবানীকে স্মরণ করেই দিনাতিপাত করে রাঢ়ের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে। তাদের নৃতাত্ত্বিক ধারা অক্ষুণ্ণ থাকলেও ধর্মীয় অনুশাসন আজ হিন্দুকৃতের করাল থাবায় আটকে গেছে। গ্রামগুলিতে ক্ষেত্রসমীক্ষায় সেই চিত্রই ধরা পড়েছে বারবার।

কৃতজ্ঞতা ও তথ্যঋণ :

১. বাঁকুড়া জেলা সরাক সমাজ উন্নয়ন সমিতি।

২. পুরুলিয়ার সরাক ও জৈন পুরাকৃতি, সম্পাদনা-সুভাষ রায়, পুরুলিয়া।

৩. ব্যক্তিঋণ : সুখময় মাজি, গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া।

মন্দির-স্থাপত্য : দক্ষিণ বাঁকুড়া

রামামৃত সিংহ মহাপাত্র

দক্ষিণ বাঁকুড়া অর্থাৎ বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমার আটটি ব্লকের মন্দির স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। তবে এই বিশাল ব্যাপ্তির সমস্ত মন্দির নিয়ে আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। সে চেষ্টাও করা হয়নি। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আলোচিত ও অনালোচিত মন্দির নিয়ে এখানে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাঁকুড়ার এই অঞ্চল একদা দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের অংশ ছিল। উর্বর ক্ষেত্র ছিল জৈন, হিন্দু ব্রাহ্মণ ও আদিবাসী সংস্কৃতির। তার ছাপ রয়েছে মন্দির স্থাপত্যে। পাশাপাশি রাজনৈতিক পটপরিবর্তন প্রভাব ফেলেছে মানুষের আচরণীয় ধর্মে এবং স্বাভাবিক ভাবেই মন্দির স্থাপত্যের উপর। এই অঞ্চল দীর্ঘদিন ছিল উড়িষ্যার গঙ্গ বংশীয় রাজাদের অধীন। তাই তাদের জৈন ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল এই অঞ্চলে। মন্দির স্থাপত্য রীতিতে তার ছাপ পড়েছে গভীরভাবে। পাশাপাশি উড়িষ্যার পশুপত শৈব ধর্মের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল এই অঞ্চলে। সেই সঙ্গে প্রবেশ করেছিল মল্ল রাজাদের বৈষ্ণব সংস্কৃতির। আবার এই অঞ্চলের মূল বাসিন্দা উৎকল ব্রাহ্মণ শ্রেণির মানুষেরা। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ছাপও রয়েছে মন্দির স্থাপত্যে।

এই অঞ্চলের প্রাচীন মন্দিরগুলিতে ওড়িশা শৈলীর রেখ এবং পীঢ় দেউলের ছাপ রয়েছে বলে ম্যাকাচ্চন জানিয়েছেন। এই মতকে সমর্থন জানিয়েছেন অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের রাজধানী খিচিং থেকে এই ধারাটি এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল মনে করা হয়। নীচে বিশদে এই মন্দিরগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল।

দেউলভিড়্যা পার্শ্বনাথ মন্দির : তালডাংরা থানার অন্তর্গত পোড়ামাটির গ্রাম পাঁচমুড়ার সন্নিকটে দেউলভিড়্যা (জে এল নং ১১০)। এখানে রয়েছে একটি পরিত্যক্ত পার্শ্বনাথ মন্দির। উড়িষ্যা ঘরানার রেখ দেউল এটি। দেউলটি পুবমুখী। দৈর্ঘ-প্রস্থে ১৪ ফুট বা ৪.২ মিটার। উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট বা ১২ মিটার। চূড়ার শুধু পূর্বদিকে এক লম্ফমান সিংহ নিবদ্ধ আছে। প্রসঙ্গত সিংহ জৈন তীর্থংকর মহাবীরের লাঞ্ছন। শিখরের বিন্যাস ত্রিরথ। ত্রিরথ বিন্যাস মন্দিরটির প্রাচীনত্বের প্রমাণ দেয়। মন্দির নির্মাণের এই ত্রিরথ পদ্ধতি বহুপ্রাচীন। পঞ্চরথ বা সপ্তরথ নির্মাণ ব্যবস্থার আগমন ঘটেছে অনেক পরে। দেউলটির সামনের উদ্গত অংশ অনেক বেশী বলিষ্ঠ। দেউলটির উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে মাটি থেকে ৬/৭ ফুট বা ২ মিটার উচ্চতায় তিনটি বড় কুলঙ্গি আছে। সম্ভবত, পূর্বে ঐ কুলঙ্গি গুলিতে কোন না কোন মূর্তি স্থাপিত ছিল। মন্দিরের মূল পার্শ্বনাথ মূর্তিটি বর্তমানে ভারতীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' বইটিতে উল্লেখ করেছেন, "বাঁকুড়া জেলার তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে সি ফ্রেঞ্চের সহায়তায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পার্শ্বনাথসহ আরও কিছু জৈনমূর্তি ও ভাস্কর্য সংগ্রহ করেন।" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, মূর্তিগুলির নির্মাণকাল আনুমানিক দশম শতক। প্রসঙ্গত দেউলভিড়্যা গ্রামে রায় পরিবার কর্তৃক পূজিত খাঁদারাণীর যে থান আছে, সেখানে মাটির হাতিঘোড়ার মধ্যে পূজিত হয় কালো রঙের ক্লোরাইট পাথর নির্মিত একটি মূর্তি। পুরুষ মূর্তিটির একহাতে তলোয়ার, অন্য হাত বুকের উপর স্থাপিত। মূর্তিটি সম্ভবত কাল ভৈরবের। শৈব সংস্কৃতির অংশ। এই মূর্তিটি আকারে ঐ কুলুঙ্গির অনুরূপ। প্রসঙ্গত, জৈন ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়লে এই অঞ্চলের বেশিরভাগ জৈন থান শৈবথানে রূপান্তরিত হয়। এর মূল কারণ উড়িষ্যা থেকে আগত পশুপত শৈব ধর্মের প্রাবল্য। যাদের প্রভাবেই এই অঞ্চলের বেশিরভাগ শৈব থান গুলি গড়ে উঠেছিল। পাশাপাশি সেন রাজত্বের উত্থান, যারা ধর্মের দিক থেকে ছিলেন শৈব। সুতরাং বলা অত্যুক্তি হবে না শৈব ধর্মের প্রাবল্যের কারণেই পূর্বের পার্শ্বনাথ মন্দির শৈব ধর্মের পীঠস্থানে পরিণত হয়। যার প্রমাণ ঐ মহাকাল মূর্তিটি।

স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ দানা জানালেন তার ছেলে বেলায় তিনি দেখেছেন মন্দির শীর্ষের আমলক শিলার খন্ডগুলি চত্বরের মধ্যে ইত:স্তত ছড়ানো ছিল। পার্শ্বনাথ ও বেশ কিছু জৈন মূর্তি ভূপাতিত ছিল।ভারতীয় পুরাতাত্বিক বিভাগ ঐ মূতিগুলি কলকাতায় নিয়ে যায়। এবং মন্দিরটির সংস্কার করান। মন্দির শীর্ষের আমলক শিলার ব্যাস ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি বা ২.৩ মিটার। জয়পন্ডা নদীতীরের নিভৃত নিরালায় এই দেউলটি জৈন দের দ্বারা

জৈন উপাসনার জন্য নির্মিত হয়েছিল। গবেষকদের মতে, যে দেউলগুলি এখনো টিকে আছে তার মধ্যে এটিই সম্ভবত বাঁকুড়া জেলার সর্বপ্রাচীন জৈন দেউল।

ব্রজভূমি ব্রজরাজপুর : বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর থানার অন্তর্গত ব্রজরাজপুর গ্রাম (দাগ নং ১০৫৫)।এখানেই রয়েছে শ্যামসুন্দরের মন্দির। মন্দিরটির বয়স প্রায় ৪৪০ বছর। ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। পূর্বদিকে একটি দরজা আছে, যেটি দিয়ে রান্নাঘর থেকে ভোগ আনা হয়। মূল মন্দির ভূমি থেকে চার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। মন্দির প্রদক্ষিণের জন্য মন্দিরের চারপাশে তিন ফুট চওড়া রাস্তা আছে। মন্দিরের চূড়ায় তিনফুট ব্যাসার্ধের প্রস্তর খোদাই দুটি পদ্মচক্র আছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য তার উপর একটি লৌহচক্র আছে। মন্দিরটি জৈন মন্দিরের পাথর সংগ্রহ করে নির্মাণ করা হয়েছে। সম্ভবত কোন ভগ্ন জৈন মন্দিরের উপর শ্যামসুন্দরের মন্দিরটি গড়ে উঠেছে। মন্দিরের পশ্চিমে প্রথম প্রবেশদ্বারের পাশে অবস্থিত শিব মন্দির এই ধারণাকে দৃঢ় করে। কারণ ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখেছি এই অঞ্চলের বেশিরভাগ জৈনস্থান পরে শিবস্থানে রূপান্তরিত হয়েছিল। মন্দিরের দক্ষিণে একটি চেলিকদমের গাছ আছে। জনশ্রুতি মন্দির নির্মাণের সময় এই চেলিকদমের গাছটি রোপণ করা হয়। মন্দিরের সামনে একটি আটচালা আছে। মূল মন্দিরের প্রাচীরের বাইরে দোলমঞ্চ এবং একটু দূরে রাসমঞ্চ আছে। মন্দিরে তিন বর্ণের সাতটি শালগ্রাম শিলা আছে। একটি শশীবর্ণ, একটি পীতবর্ণ এবং বাকি পাঁচটি কৃষ্ণবর্ণ। শশীবর্ণ ও পীতবর্ণের শালগ্রাম গুলি মন্দিরের বাইরে বার করা হয় না। প্রয়োজনে কৃষ্ণবর্ণের গুলি মন্দিরের বাইরে আনা হয়। রয়েছে কষ্টি পাথরের আড়াই ফুটের শ্যামসুন্দরের মূর্তি, অষ্ট ধাতুর দু'ফুটের রাধারাণীর মূর্তি ও নিমকাঠের তৈরি ললিতা মূর্তি ।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা দাস মথুরানন্দ শ্যামসুন্দর ও রাধারাণীর মূর্তি বৃন্দাবন থেকে নিয়ে এসে ওন্দার নিকটবর্তী বেলাড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করতে থাকেন। পূজার নিমিত্ত মন্দির নির্মাণ করে দেন মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ এবং বেলাড়া মাদারডাঙ্গা ও চূড়ামণিপুর এই তিনটি মৌজা দেবোত্তর হিসাবে দান করেন। দীর্ঘ আটাশ বছর শ্যামসুন্দর ঐ মন্দিরে পূজিত হন। পরে মথুরানন্দ ১০৫১ সালে ঐ মূর্তিটি সহ ব্রজরাজপুরে চলে আসেন। সুপুরের রাজার দেওয়া নিষ্কর সম্পতির উপর বর্তমান মন্দিরটি গড়ে ওঠে। এই মন্দিরটি গড়ে ওঠার আগে শ্যামসুন্দর পুজো পেতেন নিকটবর্তী দুলালগড়্যার কাছে।প্রসঙ্গত মথুরানন্দ দাস ছিলেন চৈতন্য পারিষদ শ্রী দাস গদাধর গোস্বামীর পৌত্র।

দেবী আটবাইচন্ডী : অনেক গ্রাম বা মৌজা আছে যেগুলির নাম দেব-দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত। বাঁকুড়া জেলাতেও এই রূপ গ্রাম বা মৌজা অনেক আছে। যেমন দেউলভিড়্যা। তালডাংরা থানার দেউলভিড়্যা গ্রামের নাম জৈন দেউল অবস্থিত হবার কারণে। এই রূপ দেউলভিড়্যা রয়েছে ইন্দপুর থানায়। তবে এখানে কোন দেউলের বর্তমান অস্তিত্ব নেই। তবে অতীতে যে ছিল তার প্রমাণ প্রাপ্ত জৈন মূর্তি গুলি। যদিও বর্তমানে সেখানে কোন জৈন মূর্তি নেই। যেগুলো ছিল সেগুলো সংরক্ষিত রয়েছে খাতড়া মহকুমা মহাফেজখানায়। তবে স্থানীয়রা জানালেন ঐ অঞ্চলে রাস্তার উপর গরুর গাড়ি

চললে এমন শব্দ হয় যেন মনে হয় নীচটা পুরোটা ফাঁকা। এ থেকে সহজেই অনুমেয় ঐ অঞ্চল খনন করলে উৎকৃষ্ট প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া যাবে।

অনুরূপ ভাবে দেবী আটবাইচন্ডীর নামে নামাঙ্কিত হয়েছে ইন্দপুর থানার প্রান্তিক গ্রাম আটবাইচন্ডী গ্রামের। দেবীর অবস্থান ডুমুর গাছের তলায়। জয়পন্ডা নদী তীরবর্তী এই গ্রাম পূর্বে দুর্গম ও বনময় ছিল। এখানে যে পূর্বে একটি মন্দির ছিল তা বোঝা যায় বর্তমান মঙ্গল কলস, আমলক ইত্যাদির উপস্থিতি থেকে। একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ বর্তমান। আটবাইচন্ডী নাম হলেও দেবীর আটটি বাহু নয় দেবীর বাহু দশটি। দশটি হাতে দেবীর সমরাস্ত্র, পান পাত্র, মুণ্ডমালা বিরাজমান। উপর দিক থেকে নীচ দিকের পাঁচটি করে হাতের সমরাস্ত্র গুলি হলো গদা, সর্প, ভগ্ন, ত্রিশূল, খর্পর। দেবী নরমুণ্ড ও মুণ্ডমালায় বিভূষিতা। দেবীর পদতলে সেবক-সেবিকা এবং মাথার উপর দুজন রক্ষীকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। প্রায় সাড়ে তিন ফুট উচ্চতার দেবী প্রতিমা একটি কাল পাথরের প্লেটে খোদাই করা আছে। মূর্তি, মন্দির ও ভগ্নস্তুপের মাকড়া পাথর জৈন স্থাপত্য রীতির প্রভাব প্রমাণ করে। চন্ডীর পাশাপাশি রয়েছেন বাশুলী ও দেবীর পীঠ ভৈরব শিব। বাশুলি, শিব ও চন্ডীর মন্দিরের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের। দেবী চণ্ডীর প্রত্ন প্রতিমার নির্মাণকাল সম্ভবত এগার-বারো শতক। বাশুলির মন্দিরটির নির্মাণকাল ষোল শতক। মন্দিরটি ত্রিরথ বিশিষ্ট ওড়িশি শৈলীর রেখ দেউল স্থাপত্য। মন্দিরটি দশ ফুট দৈর্ঘ প্রস্থের এবং উচ্চতা ২২ ফুট। এই পাথরের মন্দিরের ভিত্তিতে ব্যবহৃত ইঁটগুলির মাপ বিস্ময়কর (১৬'' X ১০'' X ২.৭৫'')। ইতিহাস থেকে জানা যায়,ষোল শতকে দেবীকে ছাতনায় স্থানান্তরিত করেন সামন্তভূমের রাজ পরিবার। বিগ্রহবিহীন মন্দিরে রোজ পুজো করেন গায়েন পদবীযুক্ত ব্রাহ্মণ পরিবার। চন্ডীর বামদিকে অবস্থিত শিব মন্দির। এক সময় সাধনস্থল বা ধর্মচর্চা কেন্দ্র ছিল এখানে। কিছুদিন আগে স্থানীয় পুকুর থেকে একটি জৈন মূর্তি পাওয়া গেছে। যা প্রমাণ করে হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি জৈন ধর্ম প্রসারের উর্বর ক্ষেত্র ছিল এই অঞ্চল।

অম্বিকানগর : রানিবাঁধ থানার অন্তর্গত কংসাবতী ও কুমারী নদীর সংযোগস্থলে দক্ষিণে অবস্থিত বর্ষপ্রাচীন গ্রাম অম্বিকানগর। গ্রামদেবী অম্বিকার নামানুসারে গ্রামটির নাম হয়েছে। প্রসঙ্গত হিন্দু দেবী দুর্গার অপর নাম অম্বিকা হলেও, জৈন তীর্থংকর নেমিনাথের শাসন যক্ষিণী দেবী অম্বিকা। অম্বিকার আদি মন্দিরের শুধু ভিত্তিবেদীটি টিকে আছে। তার উপর নির্মিত ইঁটের মন্দিরটি আধুনিককালের। উচ্চতা ১৫ ফুট। দৈর্ঘ প্রস্থে ৮'৪''। অম্বিকা মন্দিরের পিছনে রয়েছে প্রাচীন বেলেপাথরের নির্মিত একটি মন্দির। সেখানকার প্রধান পূজিত দেব শিব। ত্রিরথ গঠনযুক্ত ওড়িশি শৈলীর মন্দিরটি প্রকৃতপক্ষে একটি ভগ্ন প্রায় জৈন দেউ ল।মন্দিরটি ঋষভ নাথকে উৎসর্গীকৃত। লিঙ্গটির পাশে শায়িত মূর্তিটি ঋষভনাথের। লাঞ্ছনভাগের বৃষ তার প্রমাণ। মন্দিরের অভ্যন্তরে দরজার লিন্টনে একটি জৈন তীর্থংকর মূর্তি খোদিত আছে। মন্দিরের কাছে একটি গাছের নীচে মূর্তিহীন তীর্থংকের একটি কাঠামো শায়িত। উচ্চতা ১'৭''। এইসব তথ্যসূত্র প্রমাণ করে কংসাবতী তীরবর্তী অম্বিকানগর জৈনধর্ম প্রচার প্রসারের উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র ছিল। ঐ অঞ্চলের একাধিক মন্দির স্থাপত্য কংসাবতী ও কুমারীর সংযোগস্থলে বাঁধ নির্মাণের সময় নষ্ট হয়ে গেছে।

পরেশনাথ : অম্বিকা নগরের নিকটবর্তী কুমারী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত একটি উৎকৃষ্ট প্রত্নস্থল। জে এল নং ১৬। সহজেই অনুমেয় তেইশতম জৈন তীর্থংকর পার্শনাথের নাম অনুসারে জায়গাটির নাম হয়েছে। সম্ভবত এখানে একটি পার্শনাথের মন্দির ছিল। প্রায় ৬' উচ্চতা বিশিষ্ট সর্প লাঞ্ছনযুক্ত পার্শনাথের মূর্তিটি এই অনুমানের সাপেক্ষে জোরালো প্রমাণ। দুটি প্রাচীন ইঁটের মন্দিরের ভিত্তিভূমি এই তথ্যের সাপেক্ষে প্রমাণ হিসাবেও ধরা যেতে পারে। এই গুলির নির্মাণকাল আনুমানিক খ্রিষ্টীয় বারো-তের শতক। বেশ কয়েকটি জৈন মূর্তির পাশাপাশি এখানের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন শিব লিঙ্গ, সবুজ ক্লোরাইট পাথরের এক বৃষ, কালো পাথরের এক সূর্যমূর্তি পাওয়া গেছে। যেগুলি প্রমাণ করে শুধু জৈনধর্ম নয়, জৈনধর্মের পাশাপাশি সৌর, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপত্য এই পাঁচটি ব্রাহ্মণ্য কেন্দ্রিক সম্প্রদায়ের বিস্তার ঘটেছিল। অর্থাৎ হিন্দু জৈন সভ্যতার উৎকৃষ্ট কেন্দ্রস্থল ছিল এই অঞ্চল।

সিমলাপাল থানার শিব ও বিষ্ণু মন্দির : প্রাগৈতিহাসিক দেবতা শিব। বেদে শিবের উল্লেখ নেই। সেই অর্থে শিব অবৈদিক দৈবতা। তবে ঋকবেদের দ্বিতীয় মন্ডলের তেত্রিশ সূত্তে রুদ্রের স্তুতি স্থান পেয়েছে। এই রুদ্রই পরে শিব রূপ লাভ করেছেন। এই শিবের পুজোর প্রচলন রয়েছে সিমলাপাল ব্লকের প্রায় সব গ্রামেই। এরমধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য এবং ব্যতিক্রমী শিবথান হলো মাচাতোড়া গ্রামপঞ্চায়েতের গাঁড়রা, দুবরাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আঁকড় ও বিক্রমপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত জড়িষ্যা গ্রামের শিব ষাঁড়েশ্বর।

গাঁড়রার শিব থানটি বেশ প্রাচীন এবং শিব লিঙ্গটি বৃহৎ। শিবের নাম শান্তিনাথ। প্রসঙ্গত ষোলতম জৈন তীর্থঙ্করের নাম শান্তিনাথ। শিবের বাহন ষাঁড়। অনুরূপে প্রথম জৈনতীর্থঙ্কর ঋষভনাথের লাঞ্ছনচিহ্ন ষাঁড়। শিবথানে কোথাও বলির প্রচলন নেই। জৈনরাও অহিংসার পূজারী। এই শিবথানের পুরোহিত ব্রাহ্মণ হলেও এর মূল উপাসক এলাকার অন্ত্যজ শ্রেণি। প্রসঙ্গত এই এলাকায় জৈনধর্ম প্রথম গ্রহণ করেছিলেন স্থানীয় নিম্নবর্গের মানুষেরা। কারণ তৎকালীন সময়ে এই নিম্নবর্গের মানুষেরা ছিলেন উচ্চবর্গের মানুষদের দ্বারা অবহেলিত। তাই তারা সেই সময় প্রয়োজন অনুভব করছিলেন মানবতাবাদী এক উদার ধর্মমতের যা পেয়েছিলেন জৈনধর্মের মধ্যে। চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে গাজন উৎসব প্রতিপালিত হয়। এই গাজনে ভক্ত্যা হবার সহজাত অধিকার রয়েছে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষদের। মানসিক করা না থাকলে ব্রাহ্মণেরা ভক্ত্যা হতে পারেন না। এখানে গাজনের ভক্ত্যাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রথা লক্ষ করা যায়। শেষ গাজনের দিন শিলাবতীর জলে কালো মুরগীর ডিম বির্সজন দেন তারা। এই প্রথার কারণ গবেষণা সাপেক্ষ। এছাড়াও গাজনের কদিন কঠোর কৃচ্ছসাধন ও আত্মপীড়ন জৈনধর্মের মূল রীতিকেই প্রতীয়মান করে।

কিছুকাল পূর্বে গাঁড়রা শিবথান নিকটবর্তী একটি পুকুর থেকে বেশ কিছু জৈনমূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে এগুলি শিবথানের মধ্যে রাখা রয়েছে। মূর্তিগুলি সবই কালো ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত। এর মধ্যে একটি জৈন কালীমূর্তি। বিভিন্ন গবেষক মত প্রকাশ

করেছেন হিন্দুরা যেমন জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিল তেমনি হিন্দুদের নিজ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীদের আপন করে নিয়েছিল জৈনরা। যদিও এই মত বিতর্কের উর্দ্ধে নয়। রয়েছে একটি জৈন গোমেদ ও অম্বিকার মূর্তি। অনুরূপ মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে উর্বর জৈনধর্মক্ষেত্র পাকবিড়রাতে। জৈনদের পূজিত দেব মণিভদ্রের একটি বৃহৎ মূর্তি উদ্ধার হয়েছিল পুকুর থেকে। তবে মূর্তি পুকুর থেকে তোলার সময় হাত ও পা গুলি নষ্ট হয়ে যায়। সংস্কারের সময় সিমেন্ট দিয়ে সংস্কার করায় মূর্তিটির কৌলিন্য নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়াও কয়েকটি যক্ষিণী মূর্তি রয়েছে পাশের শীতলা মন্দিরে। তবে সিঁদুর ও ফুলে ঢাকা থাকায় বোঝা সম্ভব হয়নি ওগুলি কোন যক্ষিণী। শিলাবতীর অপর পাড়ে রয়েছে রঙ্কিণী তড়া। এখানে উদ্ধার হয়েছিল একটি জৈনচক্র যাতে চব্বিশ জন জৈনতীর্থঙ্করের প্রতিকৃতি ছিল। বর্তমানে ওটি সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে। রঙ্কিণী মন্দিরের পাশে মহাবীরের একটি মূর্তি পূজিত হন ভৈরব রূপে। গাঁড়রার নিকটবর্তী শিলবতী পাড়ের অলকধারাতে আর একটি মহাবীর মূর্তি পূজিত হয় ভৈরব রূপে।প্রসঙ্গত পুরাণ অনুযায়ী শিবের প্রহরী ভৈরব। স্থানীয় ভাবে ভৈরব পূজিত হন কৃষিদেবতা হিসাবে। শিবায়ণ হিসাবে শিব যুগযুগ ধরে পূজা পেয়ে আসছেন কৃষির দেবতা হিসাবে। এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক প্রমাণ থেকে বলা অত্যুক্তি হবে না এই অঞ্চল একদা উর্বর জৈনক্ষেত্র ছিল এবং শিবথানটি জৈনদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বাণেশ্বর শিব হিসাবে যে লিঙ্গটি পূজিত হয় সেটি প্রকৃতপক্ষে একটি জৈন চৌমুখা। গবেষকদের মতে জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা পুণ্য অর্জনের জন্য জৈন তীর্থক্ষেত্রে এগুলি অর্পণ করতেন। জৈন চৌমুখাটির দুপাশে দুটি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি আছে। প্রায় নষ্ট হতে বসায় বোঝা দুঃসাধ্য এগুলি কোন তীর্থঙ্করের। তবে একটি সম্ভবত পার্শ্বনাথের। প্রসঙ্গত পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উড়িষ্যার গঙ্গ বংশীয় রাজা অনন্তবর্মণ তার রাজ্যের সীমানা আরম্যবাগ বা আরামবাগ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন জৈনধর্মাবলম্বী। তার পৃষ্ঠপোষকতাতেই দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এই অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে। তবে বাংলায় সেন রাজাদের রাজত্ব শুরু হলে পরিবর্তন ঘটে রাজনৈতিক পটভূমিকার। তাঁরা ছিলেন শৈব। স্বভাবতই শৈব ধর্ম প্রসারে ব্রতী হয়েছিলেন তারা। সেই সময় বহু জৈন উপাসনার স্থান রাতারাতি শৈব উপাসনা স্থানে পরিণত হয়েছিল রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশায়। আঁকড় গ্রামের জৈন চৌমুখা শিব হিসাবে পূজা পাবার এটি একটি কারণ মনে করা যেতে পারে।

এই শিব লিঙ্গটি সারাবছর জলের তলাতেই থাকে। চৈত্রমাসে গাজন উপলক্ষে জল সিঞ্চন করে লিঙ্গটি বার করা হয়। এটি গভীর গর্তের মধ্যে অবস্থিত। জনশ্রুতি পূর্বে পার্শ্ববর্তী ঠান্ডা পাড়ায় অবস্থিত ছিল লিঙ্গটি। মাঝি ধর্মাবলম্বী ঐ গ্রামের অধিবাসীদের মূল জীবিকা চিঁড়া কুটা(ঠেকির সাহায্যে ধান থেকে চিঁড়া তৈরি করা)। চিঁড়া কুটার শব্দে বিরক্ত হয়ে শিব শিলাবতীর স্রোত ধরে আঁকড় গ্রামের এই স্থানে এসে অবস্থান করেন এবং পুরোহিতকে স্বপ্ন দেন। পুরোহিত অব্রাহ্মণ—লোহার সম্প্রদায়ের। বর্তমান পুরোহিতের নাম মিহির লোহার। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন অনুষ্ঠিত হয়। একদিনের মেলা বসে। তবে গাজনে ভক্তা হওয়া এবং ঢাক বাজানো সম্পূর্ণ রূপে নিষেধ। আঁকড় গ্রামের বিপরীতে শিলাবতী

তীরবর্তী গ্রাম লায়েকপাড়া। এখানে সর্পলাঞ্ছন চিহ্নযুক্ত পার্শ্বনাথের একটি বৃহৎ মূর্তি রয়েছে। এই মূর্তিটি বর্তমানে খাঁদারানি নামে গ্রামবাসীদের দ্বারা পূজিত হন। নিকটবর্তী গোতড়া তে রয়েছে জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথের শাসন যক্ষিণী অম্বিকার মূর্তি। দুইহাতে দুই শিশু কন্যা ধারিত এই দেবীর প্রভাবেই সম্ভবত হিন্দু শিশুরক্ষাকারী দেবী ষষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও আঁকড় র নিকটবর্তী গ্রাম মাদারিয়া ও বাগান থেকে বেশ কিছু জৈন তীর্থঙ্কর ও যক্ষিণী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত মাদারিয়া শব্দটি এসেছে মন্দিরা থেকে। জৈনদেউলকে বলা হয় মন্দিরা। অর্থাৎ পূর্বে এখানে জৈন দেউল থাকার সম্ভবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই বলা যেতে পারে উর্বর জৈনক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত শিব হিসাবে পূজিত আঁকড়-এর জৈন চৌমুখা পূর্বে জৈনদের দ্বারাই আরাধিত হতো।

শিলাবতী নদী তীরবর্তী জড়িষ্যা এক উৎকৃষ্ট জৈন প্রত্নস্থল। এখান থেকে প্রাপ্ত বেশ কিছু জৈন মূর্তি এবং পূর্বে বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যবহৃত মুক্তোদানা বর্তমানে বিষ্ণুপুরে অবস্থিত আচার্য্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত করা হয়েছে। একসময় শিলাবতী নদী ছিল উৎকৃষ্ট বাণিজ্যপথ। উড়িষ্যা থেকে আগত বণিক দল এই জলপথ বেয়ে পৌঁছাতেন তাম্রলিপ্ত বন্দরে। জঙ্গলাকীর্ণ স্থলপথ তৎকালীন বণিকদের জন্য নিরাপদ ছিল না। তাই তারা যাতায়াতের জন্য জলপথকেই বেছে নিয়েছিলেন। এই বণিকেরা মূলত ছিলেন জৈন সরাক সম্প্রদায়ের ধাতু ব্যবসায়ী। জড়িষ্যা নিকটবর্তকী জুনকুড়া ও হাড়মাসড়ার খাঁদিসিনির জঙ্গল থেকে প্রাপ্ত ধাতু গলানোর চুল্লি এবং জড়িষ্যা ও হাড়মাসড়ায় প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রার সাথে তাম্রলিপ্ত বন্দরের নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত মুদ্রার মিল প্রমাণ করে এটি একসময় উৎকৃষ্ট বাণিজ্য পথ ছিল। আরকিউলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার জার্নালেও শিলাবতীর উপর দিয়ে এই বাণিজ্যপথের উল্লেখ রয়েছে। দীর্ঘ যাত্রা পথের বিভিন্ন অঞ্চলে বণিকেরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্রামস্থল গড়ে তুলেছিলেন। জৈন ধর্মাবলম্বী এই বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সক্রিয় প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছিল জৈন ধর্ম। শিলাবতী নদী তীরবর্তী উঁচু জায়গা জড়িষ্যা ছিল জৈনধর্ম প্রসারের মূল কেন্দ্র গড়ে তোলার আদর্শ জায়গা। ভিনদেশী বণিকেরা সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন উৎকৃষ্ট মৃৎশিল্পীদের। তারা গড়ে তুলতেন জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি। তাই জড়িষ্যাতে পাওয়া গেছে বেশ কিছু বিভিন্ন আকারের জৈন মূর্তি। প্রাপ্ত পোড়ামাটির কূপ প্রমাণ করে উৎকৃষ্ট প্রাচীন নগর সভ্যতার। ভাটলগরী, লাঙ্গারবাঁধ প্রভৃতি শব্দগুলির সাথে জৈনদের স্থায়ী আবাসস্থল গড়ে তোলার যোগ আছে।

ষাঁড়েশ্বর শিব হিসাবে পূজিত হয় একটি বসুবলদ মূর্তি। বসুবলদ মূর্তি জৈনদের দ্বারা পূজিত হয়। এখানে রয়েছে একটি মন্দিরের আমলক শিলা যা পূর্বে জড়িষ্যায় জৈন দেউলের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। এখানেই রয়েছে একটি জৈন যক্ষিণী মূর্তি। তবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বোঝা সম্ভব হয়নি ইনি কোন যক্ষিণী। পুরোহিত ব্রাহ্মণ শ্রেণির। তবে উপরোক্ত তথ্য থেকে বলা যায় এই শিব জৈনদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার ষাঁড়েশ্বরের মাথায় জল ঢাললে মোক্ষ লাভ হয়।

এই অঞ্চলে জৈন ধর্ম প্রচারের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। আচারঙ্গ সূত্র থেকে জানা যায় হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ পর্বতে একটি জৈনধর্মকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। জৈনরা এই পর্বতকে বলতো 'শিখর সমেত'। এখানে নির্বাণ লাভ করেছিলেন বেশিরভাগ জৈন তীর্থঙ্কর। এই পরেশনাথ পাহাড়কে কেন্দ্র করে জৈনধর্ম প্রচারক দল রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় জৈনধর্ম প্রচার এবং বহুল পরিমাণে জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ।এদের প্রভাবেই খ্রিষ্টিয় তৃতীয় শতকের পর এই অঞ্চলে জৈনধর্মমত প্রচারিত হয়েছিল।

জৈনধর্মগ্রন্থ আচারঙ্গ সূত্র(1.8.3) অনুযায়ী 'Mahavira used this route for his journey and this region was called Ladha(i.e.Radha)comprising vajiabhumi(vajrabhumi)and Subbhabhumi(summabhumi) [jacobi 1884:84f]। ঐ ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায় মহাবীর রাঢ় দেশে দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত করেন। ড.রামকৃষ্ণ ভান্ডারকর বলেছেন 'বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যরা ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে নির্বাচন করেছিলেন বিহার ও কোশলকে, আর মহাবীর ও তাঁর শিষ্যরা নির্বাচন করেছিলেন রাঢ় ভূমিকে। দক্ষিণরাঢ়ের অংশ ছিল শিলাবতী নদী তীরবর্তী সিমলাপাল থানার এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

আচারঙ্গ সূত্রের সমসাময়িক জৈনভগবতী সূত্রে (ভাষ্য প্রজাপতি উপাঙ্গ) বলা হয়েছে জৈনধর্মগ্রন্থে যে কটি মহাজনপদের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে রাঢ় অঞ্চল শ্রেষ্ঠতম। এই অঞ্চলে মহাবীরের পূর্বে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন পার্শ্বনাথ।শোনা যায় জৈনধর্মের পীঠস্থান এই অঞ্চলে পাদস্পর্শ ঘটেছিল এক জনৈক তীর্থঙ্করের প্রিয় শিষ্যের। তাঁর প্রভাবেই শিলাবতী নদী তীরবর্তী এই অঞ্চলে জৈনধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল।

পাশাপাশি দুবরাজপুর পঞ্চায়েতের মুজরা গ্রামে রয়েছে প্রায় চারশো বছরের পুরনো একটি শিব মন্দির রয়েছে। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা নিতাই চাঁদ পাইন উড়িষ্যা থেকে এসে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। উড়িষ্যা শৈলীর সরল রেখ দেউল এটি। শিবলিঙ্গটি বেশ বড়ো। নিত্যপুজো হয়। মন্দির গাত্রের লেখ থেকে জানা যায় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে যজ্ঞেশ্বর পাইন এবং ঈশানচাঁদ পাইন মন্দিরটি সংস্কার করান। ঐ পঞ্চায়েতের দুবরাজপুর ও হাতিবারী গ্রামে রয়েছে দুটি শিব মন্দির। দুবরাজপুর এ বৈশাখ মাসে গাজন হয়। গাজনের অদ্ভুত লোকাচার শ্মশান থেকে মড়া পোড়ানোর কাঠ এনে গাছে বেঁধে রাখা হয়। সম্ভবত তন্ত্র সাধনার অঙ্গ হিসেবে শবসাধনা এইভাবে টিকে আছে । বিক্রমপুর পঞ্চায়েতের বিক্রমপুর গ্রামে রয়েছে পাঁচটি শিব মন্দির। নির্মাণ করেন বিক্রমপুরের তৎকালীন শাসক বিক্রম সিংহ চৌধুরী। সিমলাপাল এ রয়েছে একটি প্রাচীন শিব মন্দির। পাশাপাশি বিক্রমপুরে রয়েছে টেরাকোটা সমৃদ্ধ একটি বিষ্ণু মন্দির। প্রায় পাঁচ ফুট ভিত্তি ভূমিটি নির্মিত হয়েছে মাকড়া পাথর দিয়ে। পঞ্চাশ ফুট উচ্চতার সারা গায়ে টেরাকোটা সমৃদ্ধ মন্দিরটিতে বিষ্ণুপুর মন্দির শিল্পের ছাপ স্পষ্ট। সিমলাপাল এলাকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মন্দিরটি হলো সিমলাপাল রাজবাড়ির প্রাঙ্গনে অবস্থিত বলরাম জীউর মন্দিরটি । খ্রিষ্টিয় চতুর্দশ শতকে এটি নির্মিত হয়। মাকড়া পাথরের দক্ষিণমুখী মন্দির। মন্দিরের শিখর ও গর্ভগৃহ উড়িষ্যার মন্দিরের অনুরূপ। পরবর্তীকালে এতে সংযোজিত

হয়েছে গ্রীসিয় থামযুক্ত সমতল ছাদ। মন্দিরটির উচ্চতা ৩৫ ফুট। দৈর্ঘ--প্রস্থে ২১ ফুট ৯ ইঞ্চি। মন্দিরগাত্রের শোভা বর্ধন করেছে দুটি অম্বিকা মূর্তি। দুটি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি। যার মধ্যে একটির লাঞ্ছন চিহ্ন হরিণ অর্থাৎ শান্তিনাথের। অপরটি মল্লিনাথ, লাঞ্ছন চিহ্ন কলস। এছাড়াও রয়েছে দু'টি বেণু কৃষ্ণ। রাজসভায় আসীন রামসীতা ও একটি বাসুদেব মূর্তি। প্রসঙ্গত মন্দিরের প্রবেশ মুখে রয়েছে শিবলিঙ্গ। একটু দূরে রয়েছে উড়িষ্যা শিল্পরীতিতে নির্মিত একটি রাসমঞ্চ ।

বলা অত্যুক্তি হবে না সিমলাপাল এ বিরাজিত বেশিরভাগ মন্দির শিব ও বিষ্ণুর। উড়িষ্যার পশুপত শিব ধর্মের প্রভাব যেমন কাজ করেছিল তেমনি ভুললে চলবে না এই অঞ্চলের আদিম বাসিন্দারা ছিলেন নিম্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের। যাদের অন্যতম আরাধ্য দেব মহাদেব। পাশাপাশি বিষ্ণুপুর এর বিষ্ণু ভক্ত মল্লরাজাদের প্রভাবে এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। পাশাপাশি এই অঞ্চলের প্রধান বাসিন্দা উৎকল ব্রাহ্মণেরা। যারা জগন্নাথের ভক্ত। তাই এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে পূজিত হন জনার্দন, দামোদর প্রমুখ।

হাড়মাসড়া গ্রামের দেব দেউল : বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত তালডাংরা থানার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী গ্রাম হাড়মাসড়া (জে. এল নং ২৮)। শিলাবতী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত এই গ্রামের আয়তন ১.২৬ বর্গমাইল। প্রাচীনকাল থেকেই এখানে একটি উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় শিলাবতী নদী তীরবর্তী প্রস্তর স্তর বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রস্তর আয়ুধ ও তৈজসপত্র গুলি থেকে। এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোন লিখিত দলিল না থাকায় আমাদের নির্ভর করতে হয় প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির উপর। এই অঞ্চলের শিলাবতী নদী অববাহিকায় সঞ্চিত রয়েছে আর্কিয়ান যুগের নাইস নামে এক রূপান্তরিত শিলার স্তর। এই শিলা সুস্পষ্ট দানা বিশিষ্ট এবং স্থানে স্থানে গ্রানাইট ও কোয়ার্টস দ্বারা খন্ডিত। শিলাবতী নদীর দুপাশে এই প্রাচীন নাইস শিলা এখনও অনাবৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে কোথাও গ্রানাইট পাথরের ফাটলে, কোথাও মাকড়া পাথরের আড়ালে। এই শিলার কৌণিক রেখাগুলি ধারালো এবং গঠনগতভাবে মজবুত হওয়ার জন্য আদিম প্রস্তর আয়ুধের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ ছাড়াও রয়েছে অত্যন্ত বিরল ধাতু টাংস্টেন ও তার মূল আকর উলফ্রাম ও শিলাইট। প্রাচীন আয়ুধ তৈরির উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষ করে পুরাতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন এর টানেই একসময়ে এই অঞ্চলে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক জনজাতি তাদের সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। খুব সম্প্রতি নিকটবর্তী শিলাবতী তীরস্থান খিঁচকা, কদমায় আবিষ্কৃত হয়েছে অতিকায় মানুষের কঙ্কাল। যা এই বক্তব্যকে প্রমাণ করে ।

বর্তমানে গ্রামটিতে বসবাস করেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ।প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব ধর্মমত অনুযায়ী উপাসনা করেন।তাই প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মমত অনুযায়ী মন্দির-মসজিদ নির্মাণ করেছেন। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুরাতাত্ত্বিক নির্দশন হিসেবে রয়েছে একটি জৈন দেউল, যা প্রমাণ করে একসময়ে জৈন ধর্ম প্রচার ও প্রসারের উর্বর ক্ষেত্র ছিল হাড়মাসড়া। গ্রাম থেকে শিলাবতী নদী যাবার পথে জৈন দেউলটি অবস্থিত। মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৩০-৩২ ফুট। দেউলটি মাকড়া পাথরে নির্মিত, উড়িষ্যা শৈলীর শিখর ঘরানার

রেখ দেউল। এর দুয়ার পুবমুখী এবং ছাদ ধাপযুক্ত চারটি চালের উপর রক্ষিত। আমলক ও শিখরের কিছু অংশ ভেঙে পড়েছে। তবে বর্তমানে পুরাতত্ত্ব বিভাগ সংস্করণ করে পুরাতন রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই জৈনদেউলটি খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। এর ভেতরে কোন মূর্তি নেই। বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। তবে পয়লা মানে মাঘ এখ্যান যাত্রার দিন স্থানীয় হাড়ি সম্প্রদায়ের মানুষেরা এখানে পুজো করেন। এ নিয়ে একটি লোক-কাহিনীর প্রচলন আছে। পুরাকালে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন এক যোগী পুরুষ একরাতের মধ্যে দেউলটি নির্মাণ করেন। কিন্তু ভোর হয়ে আসায় 'কুখড়া' ডেকে ওঠায় পূর্ণ রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেই ঘটনাকে স্মরণ করে পয়লা মাঘের পুজোর মাধ্যমে ।

প্রসঙ্গত হাড়মাসড়া গ্রামের বাণী মন্দির পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে **১৯৮১** সালে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে শ্রদ্ধেয় শ্রী হরিকিঙ্কর রায় তথ্য দিয়েছেন যে তাঁর ছেলেবেলায় গ্রামের বৃদ্ধদের কাছে শুনেছেন যে অনুরূপ আরো ৫-৭টি জৈন দেউল হাড়মাসড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল। তবে এই অঞ্চলে বর্তমান থাকা দেউল অপেক্ষা যে বৃহৎ দেউল ছিল তা অনুমান করা যায়, পার্শ্ববর্তী পুকুর সানবাঁধা থেকে প্রাপ্ত জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তিটির আকৃতি থেকে। ক্লোরাইড পাথরে নির্মিত ৫৮×২৮ ইঞ্চি বা ১.৫×০.৭ মিটার উচ্চতা ও প্রস্থের মূর্তিটির লাঞ্ছন ভাগে রয়েছে সর্পচিহ্ন। যা প্রমাণ করে মূর্তিটি জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের। নগ্ন মূর্তি। মূর্তিটির দু'বাহু নিম্নমুখী ও প্রলম্বিত। পায়ের নীচে পদ্ম। মূর্তিটির আয়তন অনুযায়ী বল যায় এই মূর্তিটি কোনভাবেই বর্তমান দেউলটির মধ্যে স্থাপন করা সম্ভব নয়। তাই নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় ঐ মূর্তিটির জন্য পৃথক দেউল ছিল। ঐ মূর্তিটি পুকুর থেকে তোলার সময় মূর্তিটির নাক ভেঙ্গে যাওয়ায় বর্তমানে এটি ঐ পুকুরের পাড়ে 'খাঁদারাণি' বা 'খাঁদাসিনি' নামে পূজিত হয়। জৈন মূর্তির হিন্দু স্ত্রী দেবতায় রূপান্তরের এটি একটি সুন্দর উদাহরণ। প্রসঙ্গত এরূপ রূপান্তরের উদাহরণ বাঁকুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক ছড়িয়ে রয়েছে। স্থানীয়দের মতে ঐ মূর্তিটি পার্শ্ববর্তী খাঁদাসিনির জঙ্গল থেকে তুলে এনে সানবাঁধা পুকুরে ফেলা হয়েছিল। প্রসঙ্গত খাঁদাসিনির জঙ্গল এই অঞ্চলের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। আজও চাষাবাদের জন্য খননকালে এই অঞ্চল থেকে পাথরের বিভিন্ন অস্ত্র ও মাটির তৈজসপত্র পাওয়া যায়। এই খাঁদাসিনির জঙ্গল ছিল জৈন ধর্মসাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বৈদ্য হিতৈশনী তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী গুনরঞ্জন সেনশর্মা রচিত 'হাড়মাসড়ার রায় পরিবার' প্রবন্ধ হতে জানা যায় খাঁদাসিনির জঙ্গলের মধ্যে অনেকগুলি পাথরের তৈরী মন্দির ছিল। যার ভাঙা অংশগুলি এখনও বর্তমান। ঐ লেখা থেকে জানা যায় এখানে রাজ অট্টালিকা বা ভিক্ষুনিবাস ছিল। মনে করা যেতে পারে ঐ ভিক্ষুনিবাসগুলি ছিল জৈনধর্মাবলম্বীদের উপাসনার ও থাকার জায়গা।

সানবাঁধা পুকুর খননকালে আরও বেশকিছু জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছিল। যার মধ্যে দুটি এখনো ঐ গ্রামের পাঁচঘরিয়া পাড়ার শিবমন্দিরে রাখা হয়েছে। ঐ মূর্তিদুটির একটির লাঞ্ছন চিহ্ন সিংহ ও অন্যটির শঙ্খ। অর্থাৎ একটি দিগম্বর মূর্তি

মহাবীরের ও অন্যটি নেমিনাথের। প্রসঙ্গত মন্দিরের বর্তমান সেবক পিনাকী রায় জানান "সানবাঁধা পুকুর থেকে প্রাপ্ত এরূপ অনেক মূর্তি ঐ মন্দিরে ছিল কিন্তু বিভিন্ন ভাবে সেগুলো স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে বর্তমানে দুটিতে ঠেকেছে।"

হাড়মাসড়ার বর্তমান দেউলের অর্ধমাইল পরিধি বিশিষ্ট উঁচুভূমি এবং পারিপার্শিক প্রমাণ দেখে অনুমিত হয় এই অঞ্চল উৎকৃষ্ট প্রত্নস্থল। খনন করা হলে বহু প্রত্নতাত্বিক নিদর্শণ পাওয়া যাবে।প্রসঙ্গত কেশ্যাতড়া গ্রাম নিবাসী তিমিরকান্তি পতির কাছে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী হাড়মাসড়া গ্রামের উত্তরে বাজার কমপ্লেক্স তৈরী করার সময় যে খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছিল তাতে বেশ কিছু মূর্তি ভাঙ্গা অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিল। এর সাথে উদ্ধার হয়েছিল পাদদ্বয় নূপুরশোভিত খন্ডিত একটি দেব বিগ্রহ, যার পদতলে উৎকীর্ণ ছিল গরুড় মূর্তি লক্ষণগুলি প্রমাণিত করে এটি একটি খন্ডিত বিষ্ণুমূর্তির ধ্বংসাবশেষ। মূর্তিটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এ থেকে বোঝা যায় দক্ষিণ বাঁকুড়ার এই অঞ্চল একদা জৈন ধর্মের পাশাপাশি হিন্দুধর্মেরও সম্প্রসারিত ক্ষেত্র ছিল। গবেষকরা প্রমাণ করেছেন ধর্ম সংকটের এক বিশেষ সময়ে জৈন ও হিন্দু উভয়েই উভয়ের দেবতাদের নিজ দেবতা বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাই একথা বলাও অযৌক্তিক হবে না ঐ বিষ্ণু মূর্তিটিও জৈনদের দ্বারা পূজিত হতো। জৈন তীর্থঙ্কর সুপার্শ্বভনাথের লাঞ্ছন চিহ্ন স্বস্তিক। আবার বিষ্ণুর উপাসকেরাও আঁকেন স্বস্তিক চিহ্ন। এ থেকেও অনুমান করা সম্ভব স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কণকারী জৈনরাও চক্রস্বামী বিষ্ণুর আরাধনা করতো। শক্তি সেনগুপ্ত তাঁর 'দামুন্যা-কপিশা-শিলাবতী' বইয়ের 'হাড়ম- অসুরদের গ্রাম' অধ্যায়ে তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করেছেন "ছেলেবেলায় আমরাও দেখেছি বর্তমান মন্দিরটির চতুস্পার্শেও ইতস্তত বহু সুখন্ডিত বিশাল বিশাল প্রস্তর খন্ড ও বিশাল পদ্মফুলাকৃতি মন্দিরের চূড়া পড়ে থাকতো।" এ গুলি যে ভগ্ন জৈন দেউলের অংশ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বৈদ্য প্রধান এই গ্রামটিতে জৈন দেউলটি ছাড়াও বেশ কয়েকটি মন্দির বর্তমান। যেগুলোর বেশিরভাগই বিষ্ণু তথা লক্ষী জনার্দনের। এর মূল কারণ বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব রাজাদের প্রভাব। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির কর আদায়ের জন্য বর্ধমানের কোগ্রাম থেকে এদের নিয়ে আসেন। রায় পরিবারের অদ্বৈত রায়ের দাবী পরম বৈষ্ণব লোচন দাসের ভাই ক্ষুদিরাম কে কর আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে এখানে নিয়ে আসেন। পূর্বে এরা ঘাটোয়াল উপাধি লিখতেন। কালক্রমে রায় ঘাটোয়াল থেকে বর্তমানে শুধু রায় ব্যবহার করেন। এদের হাত ধরেই সমৃদ্ধ গ্রামে পরিণত হয়েছে হাড়মাসড়া। হাড়মাসড়ার সর্বাপেক্ষা পুরাতন মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত ও ভগ্ন। এখানে কোন দেব বিগ্রহ নেই। পুবদুয়ারী মন্দিরের উপরের অংশে সামান্য টেরাকোটার কাজ বিদ্যমান। ভগ্ন দশার জন্য মন্দির দেয়ালে টেরাকোটার কাজ ছিল কিনা বোঝা যায় না। পাথরের ভীত নির্মিত ছোট ইটের তৈরী মন্দিরটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় নেই। মন্দিরটির নির্মাণকাল বীর হাম্বির র সমসাময়িক বলে অনুমিত হয়। মন্দিরটির নির্মাণ কৌশল বিষ্ণুপুরের মন্দিরের অনুরূপ। রায় পরিবারের দাবী পূর্বে এই মন্দিরে বিশেষ বিশেষ তিথিতে জর্নাদনকে নিয়ে আসা হতো। মন্দিরটি ভেঙ্গে পড়ায় বর্তমানে তা আর সম্ভব হয় না। তবে ওর নিকটে একটি

শিব মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে এখনো বিশেষ বিশেষ তিথিতে লক্ষী-জনার্দনকে নিয়ে আসা হয়।

এছাড়াও রায়পাড়ায় রয়েছে একটি নবরত্ন রাসমঞ্চ। সামান্য উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু এই মন্দিরটি। মাকড়া পাথরের ভিত্তি ভূমির উপর রেখশৈলীর এই নির্মাণ উড়িষ্যা শিল্পরীতি মনে পড়ায়। দক্ষিণ মুখী,টেরাকোটা যুক্ত মন্দিরটি বিগ্রহবিহীন । নবরত্ন এই রাস মঞ্চটি প্রায় তিনশ বছরের পুরানো। নির্মাণ করান রায় পরিবারের নয়ন চাঁদ। বর্তমানে বছরে চার দিন পুজো হয় এই মন্দিরে। সেগুলো হলো রাসযাত্রা, আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার দিন স্নান যাত্রা, ঝুলন দোল যাত্রা। প্রসঙ্গত এই মন্দির নির্মাণরীতি মল্ল রাজাদের মন্দির নির্মাণরীতি অপেক্ষা পৃথক। মল্লরাজারা পঞ্চরত্নের বেশি কোন রত্নবিশিষ্ট মন্দির নির্মাণ করেন নি। বরং বলা যেতে পারে একরত্ন মন্দিরের সংখ্যাই বেশি। এর কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞ রা মনে করেন একরত্নের ক্ষেত্রে রত্ন বা চূড়ার সম্যক ভার নীচের কেন্দ্রীয় কক্ষ বা গর্ভগৃহের উপর পড়ে। ফলে কোন বড় বা ভারী চূড়া নির্মাণে সুবিধা হয়। হাড়মাসড়ায় এই মন্দির নির্মাণ রীতি প্রবেশ করেছিল সম্ভবত বর্ধমান ও বীরভূম থেকে। ঐ রীতির সাথে সংমিশ্রণ ঘটেছিল বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার। টেরাকোটার চিত্রগুলির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে ভগবান বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের মূর্তি, গজকচ্ছপের যুদ্ধ, রাম, সীতা, উমা-মহেশ্বর,রাধাকৃষ্ণ প্রমুখ। পাশাপাশি টেরাকোটার চিত্রে ফুটে উঠেছিল মধ্যবিত্ত দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও। এর অন্যতম হলো মহিলা মজলিস, তাম্বুক সেবন প্রভৃতি। প্রসঙ্গত একসময়ে বিষ্ণুপুরের অম্বরী তামাক দেশ বিখ্যাত। শুধু বিষ্ণুপুর বা হাড়মাসড়ার মন্দির শিল্পেই নয় পুরো বাঁকুড়া জুড়েই ঐ সময়ে নির্মিত মন্দির টেরাকোটায় তাম্বুক সেবনের চিত্র দেখেছি। যা মল্ল রাজ্যে তামাকের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে।

এই মন্দিরের সমসাময়িক দুর্গা দালানটিও। এখানে রয়েছে পাথরের হরগৌরী মূর্তি। দেবী দ্বি-ভূজা হিসাবেই পূজা পান। তবে যেটি প্রচীন মন্দির সেটিতে বর্তমানে চন্ডীপূজা হয়। সামনে রয়েছে আটচালা। প্রবেশ পথের নহবত খানা মুসলমান স্থাপত্য রীতিকে মনে করায়। দুর্গাপূজার সময় পঞ্চমী থেকে এই নহবতখানাতে সানাইয়ের সুর বাজে।

অপর একটি নবরত্ন রাসমঞ্চ রয়েছে সেনগুপ্ত পরিবারের। তবে এটির নির্মাণ কৌশল রায়দের রাসমঞ্চের অনুরূপ হলেও অপেক্ষাকৃত নবীন এবং অলংকরণবিহীন।

এর পাশাপাশি উল্লেখ করতে হয় পাঁচঘরিয়া পরিবারের দক্ষিণ মুখী টেরাকোটা সমৃদ্ধ দামোদরের পঞ্চরত্ন মন্দিরটির কথা। এখানেও একটি দুর্গাদালান রয়েছে। দেবী দশভুজা। বর্তমান সেবাইত পিনাকী রায়। মন্দিরের মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণ তথা কালোসোনার মন্দির। এই মন্দিরটির নির্মাণের সাথে জড়িয়ে রয়েছে কবি শক্তিপদ সেনগুপ্তের নাম।

শ্যাম চাঁদের মন্দির: তালডাংরা থানার রাধামোহনপুর গ্রামে (জে এল নং ৫৮) অবস্থিত প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত এই মন্দিরটি। ছোট ছোট ইঁটের তৈরী মন্দির গাত্রের লেখটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নির্মাণ কাল বোঝা যায় নি। তবে স্থানীয় গবেষক মদনমোহন সেনগুপ্তের দাবী মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল মল্লরাজ গোপাল সিং এর আমলে। মন্দিরটির মূল দেবতা ছিলেন শ্যাম-কিশোরী। কষ্টি পাথরে নির্মিত শ্যামের সাথে পরে যুক্ত হয়েছিলেন অষ্টধাতুর

তৈরি কিশোরী রাধা। শোনা যায় গরীব দাস বাবাজী নামে এক বৈষ্ণব এই শ্যামের মূর্তিটি নিয়ে এসে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় প্রতিষ্ঠা করে পুজো করতে থাকেন। পরবর্তীকালে মল্ল রাজারা মন্দির ও তার সামনে কামানো পাথরের একটি আটচালা নির্মাণ করে দেন। প্রথা অনুযায়ী রাস পূর্ণিমার সময় মল্ল ভূমের সকল মন্দিরের রাধা কৃষ্ণের মূর্তি বিষ্ণুপুরের রাস মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হতো।রাজা কালিপদ সিং এর সময় এই মূর্তিগুলিও নিয়ে যাওয়া হয়। তবে তা আর ফেরত আসে নি, সম্ভবত ব্যায়ভারের কারণে। শোনা যায় পরে কালিপদ সিং এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন এলাকা বিক্রি করে দেন।বিগ্রহ বিহীন মন্দির দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

সাবড়াকোন: তালডাংরা থানার সাবড়াকোনে (জে এল নং ১৪০) রয়েছে একটি প্রাচীন ‘রামকৃষ্ণ’ -এর মন্দির। মন্দিরটির উচ্চতা ৩০ ফুট। দৈর্ঘ-প্রস্থে ২০’৪’’। গঠনশৈলীতে দেখা যায় সামনের ত্রিখিলান দালানের ছাদ গর্ভগৃহের ছাদ কোন লহরাযুক্ত গম্বুজের উপর অবস্থিত। মন্দিরের লেখটি অক্ষত। তাতে লেখা আছে “শ্রী শ্রী কৃষ্ণ:কালবস্বঙ্গেশাকে । শ্রী রাধাকৃষ্ণযোমুদে। দদৌ সৌধগৃহং শ্রীল। বীরসিংহ মহাপতি। সন ৯৮৩।” অর্থাৎ ৯৮৩ মল্লাব্দে (১৬৭৭ সালে) রাধাকৃষ্ণ উপাসনার জন্য মল্লরাজ দ্বিতীয় বীর সিং এই সৌধ গৃহ দান করেন। এটি মাকড়া পাথরে নির্মিত একটি আটচালা মন্দির। মূল মন্দিরের সামান্য উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত দোল মঞ্চটি পরবর্তীকালে নির্মিত। মন্দিরে কষ্টি পাথরে নির্মিত রামকৃষ্ণ মূর্তি রয়েছে।

মহামায়া মন্দির: কাঁসাই নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত রাইপুরে অবস্থিত প্রাচীন এই মন্দির। মল্ল রাজ ফতে সিং এই মন্দির নির্মাণ করান। পাশে রয়েছে শাঁখারী পুকুর। পাথরের নির্মিত দেবী প্রতিমা এখানে কোকোমুখা। নিত্যপূজার প্রচলন রয়েছে। দুর্গা পূজার সময় যা বলি দেওয়া হয় সেই মাংস ভোগ হিসাবে খাওয়া হয় না, পরীবর্তে পুরোটাই সমাধিস্থ করা হয়। দেবী জাগ্রত। প্রচলিত রয়েছে প্রচুর লোক বিশ্বাস।

জনশ্রুতি মুঘল আমলে এক চৌহান রাজপুত অঞ্চল দখল করে শিখর রাজ উপাধি ধারন করে রাজত্ব শুরু করেন। সে বংশের শেষ রাজার সেনাপতি মীরণ সাহা মারাঠা আক্রমণে নিহত হলে রাজপরিবারের সকলে শিখরসায়র নামে এক জলাশয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন। এর পশ্চিমে রয়েছে মীরণ সাহার সমাধি। শিখররাজকুলের পুরোহিত কিছুকাল রাজত্ব করার পর মল্ল রাজ ফতে সিং এই এলাকা দখল করে নেন।

রঙ্কিণী থান: দক্ষিণ বাঁকুড়ার মন্দির সমীক্ষায় আমরা দুটি রঙ্কিণী থানের সন্ধান পাই । একটি খাতড়া রাজপরিবারের কুলদেবী। থান খাতড়া শহরের মধ্যস্থলে কংসাবতী কলোনি যাবার রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে। অপর জন ভেলাইডিহা রাজপরিবারের কুলদেবী। থান সিমলাপাল থানার লক্ষীসাগর হাসপাতালের নিকটে। খাতড়ায় রঙ্কিণী দেবীর পূজারী মুখটি পদবী প্রাপ্ত মুখ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পরিবার। অন্যদিকে লক্ষীসাগর এ অবস্থিত রঙ্কিণীতাড়ার পূজারী ব্রাহ্মণ চক্রবর্তী পদবী ধারী। মন্দিরটি নবীন হলেও দেবীমূর্তি বহু প্রাচীন ।কালো ক্লোরাইট পাথরের ভয়াবহ মূর্তি। পায়ের তলায় রয়েছে ভৈরব। বলি দেবার প্রচলন রয়েছে। তবে খাতড়ার রাজ পরিবার বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করায় ওখানে পশুবলি বন্ধ হয়ে যায়।

ষোড়শ শতকে উত্তর ভারতের রাজপুত ক্ষত্রিয় রাজাদের শক্তি পূজার ঐতিহ্য অনুসরণ করে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীদার স্থানীয় ভূম রাজারা নিজ নিজ রাজ্যে শক্তি পূজার প্রচলন করেন। তখন অম্বিকানগরের দেবী হন অম্বিকা, রাইপুর রাজ পরিবারের দেবী হন মহামায়া, বরাভূম রাজ পরিবারের দেবী হন কোঠেশ্বরী। সেইরূপ খাতড়া , ভেলাইডিহা ও ধলভূমের দেবী হন রঙ্কিণী । রঙ্কিণী দেবীর মন্দির প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের প্রাচীন। পাশাপাশি খাতড়ায় অবস্থিত উল্লেখযোগ্য মন্দির গুলি হলো শ্রী শ্যামসুন্দর জীউ মন্দির। মন্দিরটি প্রায় চারশো বছরের পুরোনো মন্দিরটির ইট গুলি গাঁথতে সিমেন্টের পরিবর্তে চুন, সুরকি প্রমুখ ব্যবহার করা হয়েছে। গোড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তিলাবনী গ্রামের উপকণ্ঠে উড়িষ্যা থেকে আগত কৃপাসিন্ধু বাবা নামক এক অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী একটি মন্দির স্থাপন করেন। মন্দিরে কোনো বিগ্রহ নেই। নিরাকার নির্গুণ পরমব্রহ্মের প্রতীকরূপে এরা সূর্যের উপাসনা করেন। মন্দিরটির নির্মাণশৈলীতে দেখা যায় চতুর্দিকে সর্পের আকৃতির স্থাপনা। এছাড়াও সুপুরে রয়েছে বিগ্রহবিহীন একটি কালাচাঁদ মন্দির ।

ব্রহ্মামন্দির: ইঁদপুর থানার জোড়দা (জে এল নং ৪৬) গ্রামে রয়েছে ব্রহ্মামন্দির। মন্দির লেখ থেকে জানা যায়, পিতৃদেব বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী ও মাতৃদেবী শুশারী বালা দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে পয়লা বৈশাখ ১৪০৮ তার পুত্র বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও পুত্রবধু শ্রীমতী বুলুরাণী চক্রবর্তী কতৃক এই ব্রহ্মামন্দির নির্মাণ করান। মন্দিরটি নতুন হলেও এটি একটি উৎকৃষ্ট প্রত্নস্থল। গ্রামটিতে চক্রবর্তী বামুনের বাস। ব্রহ্মা বলে যে লিঙ্গটিকে পুজো করা হয়, প্রকৃতপক্ষে সেটি একটি চতুর্মুখী শিবলিঙ্গ। এই ধরনের শিবলিঙ্গ আর একটিও আমার নজরে পড়েনি। এটি ছাড়াও পার্শ্ববর্তী শিব মন্দির ও ব্রহ্মামন্দিরের দেওয়াল গাত্রে প্রোথিত রয়েছে দুটি জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি, চারটি লোকায়ত বিষ্ণু, একটি বীরস্তম্ভ ও ব্রহ্মামন্দিরের অভ্যন্তরে রয়েছে জৈন দেবী অম্বিকার একটি মূর্তি। তবে মূর্তিগুলি মন্দিরের সাথে গিরিমাটি দিয়ে রঙ করায় যৎপরোনাস্তি ক্ষতি হয়েছে। পাশেই মাকড়া পাথরের ভিত্তিভূমি প্রমাণ করে পূর্বে এখানে একটি মন্দির ছিল। পাশাপাশি প্রাপ্ত মূর্তিগুলি থেকে বলা যায়, এখানে একসময়ে হিন্দু ব্রাহ্মণ, জৈন ও আদিবাসী সংস্কৃতির উর্বরক্ষেত্র ছিল।

সুপুরের প্রাচীন স্থাপত্য; রাজকাহিনির নির্বাক সাক্ষী

দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়ার দক্ষিণ অংশে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন কোনও কোনও জায়গায় দেখা মিললেও সুপ্রাচীন মন্দিরের সংখ্যা জেলার উত্তর পূর্ব অংশের তুলনায় কম। খাতড়া মহকুমার ইতিহাস কয়েক শতাব্দী প্রাচীন। সেই তুলনায় দর্শনীয় মন্দিরের ইতিহাস ততো প্রাচীন নয়। কারণ জঙ্গলাকীর্ণ প্রধানত আদিবাসী অধ্যুষিত এক কথায় জঙ্গলমহলে মন্দির সংস্কৃতিতে অন্তত চর্যাপদের সময় থেকে কোনও আগ্রহ আসে নি বলা যায়। তবে কয়েকশো বছরের স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে খাতড়া ব্লকের সুপুর গ্রামের কালাচাঁদ-শ্যামসুন্দর জিউয়ের মন্দিরটি আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। মন্দির বলার কারণ এই যে, কিংবদন্তী এবং মল্লরাজাদের আমলের তৈরি বিষ্ণুপুরের একটি মন্দিরের সাথে আপাত দৃষ্টিতে এই স্থাপত্যের সামান্যতম মিল লক্ষ করা যায়। মন্দিরের বর্তমান চেহারার সঙ্গে আগের চেহারার মিল অনেকাংশেই খুঁজে পাওয়া যায় না। একরত্ন (চূড়া) বিশিষ্ট মন্দিরটি বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের সময়কালে তৎকালীন সুপুরের রাজা জগন্নাথ দেব বা তাঁর পরবর্তী কোনও এক ধবলদেব রাজা নির্মাণ করেছিলেন। যদিও বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের তৈরি মন্দিরের অনুকরণ এই মন্দিরের নেই। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ ১ম রঘুনাথ সিংহ (১৬৪২-১৬৫৬)-র

আমলে নির্মিত একরত্ন বিশিষ্ট কালাচাঁদের মন্দিরের স্থাপত্যরীতি বা নির্মাণশৈলীর সঙ্গে সুপুর গ্রামের ভেতরে অবস্থিত কালাচাঁদ-শ্যামসুন্দরের মন্দিরের কোনও মিল পাওয়া যায় না। এমনকি রত্ন বা চূড়াটির ক্ষেত্রেও নয়। বরং বিষ্ণুপুরের প্রবেশপথের গড়দরজার সাথে এই মন্দিরটির স্থাপত্যের নির্মানশৈলীর কোনও কোনও জায়গায় অল্প মিল রয়েছে। তাছাড়া পুরুলিয়ার গড় পঞ্চকোট রাজত্বে অবস্থিত একটি ওয়াচ টাওয়ারের সঙ্গে এই স্থাপত্যটির অনেকাংশে মিল পাওয়া যায়।

খাতড়া ব্লকের সমৃদ্ধশালী গ্রাম সুপুর। বাঁকুড়া-খাতড়া মূল সড়কের একেবারে পাশেই ওই গ্রামটিতে ব্রাক্ষ্মণ, নাপিত, কর্মকার, রজক, ধীবর, বাউরি, সর্দার সহ নানাজাতির বসবাস। মন্দিরের বর্ণনা দিতে গেলে সংলগ্ন গ্রামটির ভৌগলিক অবস্থান এবং তৎসহ পরিবেশেরও খানিকটা বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন। জানা যায়, একসময় ওই গ্রামের পূর্বদিকে শঙ্খশিল্পীদের বসবাস ছিল। গৃহবধূদের হাতের শাঁখা এবং মঙ্গলশঙ্খ তৈরি করাই ছিল তাঁদের প্রধান পেশা। পরবর্তীতে তাঁরা মল্লরাজাদের আমলেই বিষ্ণুপুরে চলে যান। এক্ষেত্রে গ্রামে 'সুপুর ভেঙে বিষ্ণুপুর' প্রবাদটির প্রচলন ছিল। গ্রামের উত্তর দিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশের সরু রাস্তা দিয়ে ডান দিকে প্রায় ১৫০ মিটার গেলেই মন্দিরটি দেখতে পাওয়া যায়। রাজমহলের দক্ষিণ দিকে রয়েছে রাজার বিশাল আকারের বাঁধ। তাঁর দক্ষিণ পাড়ের রয়েছে এই স্থাপত্যকীর্তিটি। প্রায় একই সরলরেখায় মন্দিরের উত্তরের দরজা এবং রাজমহল অবস্থিত ছিল। বর্তমানে মন্দিরের চারিদিকে ঝোপঝাড় এবং আগাছার জঙ্গলে ভর্তি। চূড়োর উপরে আঁকড়ে রয়েছে বিভিন্ন গাছের শিকড়। অনেক জায়গার ইট ভেঙে পড়েছে। দ্বিতল বিশিষ্ট মন্দিরটির উপরের তলের ছাতের কয়েকটি ইট খসে গিয়েছে। তবুও এত অবহেলার পরেও আজও এই মন্দিরটি ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে দক্ষিণ বাঁকুড়া তথা খাতড়া মহকুমার অন্যতম স্থাপত্যের নিদর্শন হয়ে টিকে রয়েছে। মন্দিরের গঠনশৈলী একটু অন্য ধরনের। নিচের তলার চারদিকের কোণগুলি ইট কেটে খাঁজ আকারে ডিজাইন করা রয়েছে। প্রায় একই ডিজাইন অম্বিকানগর রাজবাড়ির রাসমঞ্চে ও বিষ্ণুপুরের কোনও কোনও মন্দিরের কোণগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। তবে অম্বিকানগরের রাসমঞ্চ বা সুপুরের মন্দিরটি পোড়া ইটের তৈরি। অন্যদিকে বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ মন্দিরগুলি মাকড়া (ল্যাটেরাইট) পাথরের তৈরি। আলোচ্য মন্দিরটির নিচের তলা এবং উপরের তলার সংযোগস্থলে ১৬টি খিলান (Arch) এর মতো কার্নিশ রয়েছে। এগুলির মধ্যে নিচের এবং উপরের কার্নিশ অপেক্ষাকৃত বেশি বাইরের দিকে বেরিয়ে রয়েছে। উপরের তলাটির চারটি কোণ তিনটি করে খাঁজবিশিষ্ট।

রাজা জগন্নাথ দেব রাজস্থানের (রাজপুতানা) ঢোলপুর থেকে প্রথমে ইন্দপুর ব্লকের ব্রজরাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গ্রামে এসে অস্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করেন। কিছুদিন পর সেখান থেকে ওই ব্লকের পশ্চিম দিকে রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গড়দুয়ারা গ্রামে ফের অস্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করেন। সেখান থেকে চলে আসেন হীড়বাঁধ ব্লকের হীড়বাঁধ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোজদা গ্রামে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর খাতড়া ব্লকের সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপুর গ্রামের প্রায় আড়াই কিমি উত্তরে একটি টিলার উপরে

পাকাপাকিভাবে রাজত্ব স্থাপন করেন। ওই টিলাটিকে ‘রংমহল’ বা ‘রাজার ঢিবি’ বলা হয়। ঢিবিটি ছোট টিলা আকারের। তার চারিদিক সরু পরিখা বেষ্টিত। সেই সময় খাতড়া এলাকার ভুস্বামী ছিলেন চিন্তামণি রজক। তিনি ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী ব্যক্তি। তাই যুদ্ধ করে ধবলদেব বংশের রাজা জগন্নাথ দেব তাঁকে পরাজিত করে সুপুর পরগনায় রাজত্ব স্থাপন করেন। তাছাড়া উড়িষ্যার কটকের নবাবের কাছ থেকে তিনি শাহাজাদা উপাধি লাভ করেন। ধবলদেব রাজবংশের রাজারা এখানে ৩২ পুরুষ ধরে বসবাস করেছিলেন বলেই ও'ম্যালি লিখিত বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখ রয়েছে। “In commemoration of this conquest, Jagannath Deb was called Dhabal, and enjoyed the title of Shahzada bestowed on him by the Nawab. After 32 generations had passed, the Supur Raj, as it the locally called, was divided in consequence of a disputed succession, Tek Chandra, the elder son of the Raja, receiving a 9 ½ annas share, and the younger Khargeswar a 6½ annas share.” তারপর সুপুরে রাজত্বকালে রাজমহল থেকে প্রায় আড়াই কিমি দূরত্বে কুলদেবতা কালাচাঁদ-শ্যামসুন্দর জিউয়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও ১৫৯১ থেকে ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বীর হাম্বিরের সময়কালে শ্রীনিবাস আচার্য বিষ্ণুপুরে আসেন এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই মন্দিরটি তার পরে কোনও এক সময় তৈরি হয়ে থাকতে পারে। কারণ তার আগে বাঁকুড়া জেলায় জৈন ধর্মাবলম্বী এবং কিছু পরে শৈব ধর্মাবলম্বীদের প্রভাব ছিল।

আলোচ্য মন্দিরটি দ্বিতল। নিচের তলার মতোই প্রায় সমান মাপে উপরের তলাটিও অবস্থিত। দুটি তলার মধ্যখানে কার্নিশের মতো ইটের অর্ধ গোলাকৃতি খিলান (Arch) বেরিয়ে রয়েছে। নিচের তলায় একটি গর্ভগৃহ রয়েছে। এটি ৩ ফুট ১০ ইঞ্চি চওড়া এবং ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট। ভেতরের দিকটি ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি। নিচের তলার পশ্চিম দিকের দেওয়ালে একটি কুলুঙ্গি রয়েছে। সেটির মাপ ১ ফুট ১ ইঞ্চি চওড়া, ১ ফুট ১ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট এবং ভেতরের দিকেও ১ ফুট ১ ইঞ্চি। তলাটির ভেতরের মাপ পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে ৬ ফুট ১০ ইঞ্চি অর্থাৎ বর্গাকার। নিচে পূর্ব দিকে এবং উত্তর দিকে ১টি করে দরজা আছে। দরজাদুটির মাপ চওড়ায় ২ ফুট এবং ৬ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট। নিচের এবং উপরের তলার ছাদ গোলাকার। অনেকটা উপুড় করা গামলার মতোই দেখতে। মেঝে থেকে নিচের তলার ছাদের উচ্চতা ১৬ ফুট। দেওয়ালগুলি ৬ ফুট করে চওড়া। পুরোটাই ইটের খিলান দিয়ে তৈরি। এছাড়া উত্তরের দরজার দু পাশে দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট কুলুঙ্গি রয়েছে। সেগুলির মাপ ৫ ইঞ্চি চওড়া, ৮ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট এবং ভেতরে ১০ ইঞ্চি। এবার মন্দিরের নিচের তলার বাইরের মাপটি উল্লেখ করা যাক। উত্তর থেকে দক্ষিণে পশ্চিম দিকের দেওয়াল ১৮ ফুট চওড়া। পূর্ব থেকে পশ্চিমে উত্তরের দেওয়াল ১৪ ফুট ৯ ইঞ্চি চওড়া। একটি চাতালের উপরে স্থাপত্যটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। চাতালের মাপ মন্দিরের পূর্বের অংশে সাড়ে ৭ ফুট, পশ্চিমে ৬ ফুট ১০ ইঞ্চি এবং উত্তরের অংশেও ৬ ফুট ১০ ইঞ্চি। মন্দিরের দোতালা অর্থাৎ উপরের তলের চারটি দরজা রয়েছে। পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তরদিকের দরজার মাপ ১ফুট ১০ ইঞ্চি চওড়া এবং ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট।

দক্ষিণ দিকের দরজা ১ ফুট ১১ ইঞ্চি চওড়া এবং ৭ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট। ভেতরের পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তরদিকের দেওয়াল ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি চওড়া এবং দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি চওড়া। উপরের উচ্চতা ১৬ ফুট। নিচের তলার থেকে উপরের তলার ভেতরের মাপ সামান্য কম। যদিও দ্বিতলের ভেতরটিও বর্গাকার। বাইরের দেওয়ালগুলির মাপ ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ১০ ফুটের মতো। তবে উপরের রত্ন (চূড়া) ভেঙে গিয়েছে। গোটা মন্দিরটি প্রায় ৩৫ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট। মন্দিরের পূর্ব দিকের দরজার বাঁ পাশে একটি সিঁড়ি ছিল। যেটি দিয়ে উপরের দ্বিতলে ওঠা যেত। বর্তমানে সিঁড়িটির ধাপগুলি ভগ্নপ্রায়। কিন্তু সিঁড়িটিকে আড়াল করার জন্য পূর্ব দিকে ৮ ফুট উচ্চতার ৯ ফুটের এবং দক্ষিণ দিকে সাড়ে ৭ ফুট চওড়া ২২ ফুটের একটি দেওয়াল রয়েছে। নিচের তলার উত্তরের দরজার উপরের দুই পাশে মন্দিরের দেওয়ালে বসানো ঘোড়ার পিঠে তীরন্দাজের ভঙ্গিমায় দুজন সৈনিকের টেরাকোটার চিত্রিনী ফলক অস্পষ্ট অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এই ফলক দুটি আলাদা করে মন্দিরের গায়ে বসানো নেই। মন্দির নির্মাণের সময়ই দেওয়ালে খাপ তৈরি করে সেগুলি বসানো হয়েছে। তবে স্থাপত্যের অন্য কোনও দেয়ালে কোনও চিত্রিনী ফলক বসানো ছিল না। যেহেতু গোটা স্থাপত্যটি পোড়া ইটের তৈরি, তাই দরজার খিলান, ছাতের গোলাকৃতি এবং দুই তলের মধ্যবর্তী খিলানের জন্য প্রয়োজনমতো ইট তৈরি করা হয়েছিল। সেই কারণেই স্থাপত্যটির গায়ে বিভিন্ন মাপের ইট দেখতে পাওয়া যায়। এখানে ব্যবহৃত ইটের আকার সাড়ে ৮ইঞ্চি/৬ইঞ্চি/২ইঞ্চি, ৮ইঞ্চি/সাড়ে৬ইঞ্চি/২ইঞ্চি, ৮ইঞ্চি/৬ইঞ্চি/১ইঞ্চি, ৯ইঞ্চি/৭ইঞ্চি/২ইঞ্চি, সাড়ে ১০ইঞ্চি/সাড়ে ৭ইঞ্চি/২ইঞ্চি। অর্থাৎ যে জায়গায় যেমন ইটের প্রয়োজন হয়েছিল তেমন আকারের ইট তৈরি করা হয়েছিল।

খাতড়ার রাজ পরিবার থেকে জানা যায়, রাজস্থান থেকে আসার সময় রাজ পরিবারের সদস্যরা কিছু বিগ্রহ সঙ্গে করে নিয়েই এসেছিলেন। তার অব্যবহতি পরে আরও কিছু বিগ্রহ সুদূর বৃন্দাবন থেকে আনা হয়েছিল। সুপুরে তখনও ধবলদেব বংশের রাজাদের রাজত্বকাল চলছিল। এই সমস্ত বিগ্রহ মিলিয়ে ২০টির মতো বিগ্রহ সুপুরের মন্দিরটিতে ছিল বলেই রাজপরিবারের বর্তমান সদস্যদের মুখ থেকে জানতে পারা গিয়েছে। কিন্তু সুপুরে রাজত্ব থাকার পর খাতড়া এবং অম্বিকানগরে রাজত্ব আলাদা হবার পূর্বে ওই রাজবংশের এক রাজা হরিশ্চন্দ্র ধবল শাহাজাদাদেবের আমলে ইন্দপুর ব্লকের ব্রজরাজপুরে, হীড়বাঁধ ব্লকের পাইড়া গ্রামে, খাতড়া ব্লকের বৈদ্যনাথপুর গ্রামে এবং খাতড়া শহরের গোস্বামীদের কয়েকটি বিগ্রহ পূজার্চনার জন্য দিয়ে দেওয়া হয়। সুপুরে রাজত্ব থাকাকালীন মোট ১৫টি বিগ্রহ ওই মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল। রাজত্ব ভাগ হয়ে যাবার সময় খাতড়া রাজ পরিবারে ১১টি এবং অম্বিকানগর রাজ পরিবারে ৪টি বিগ্রহ অবস্থান করে। সুপুরের এই মন্দিরটি কালাচাঁদ-শ্যামসুন্দর জিউয়ের মন্দির হিসেবেই পরিচিত। অর্থাৎ এই মন্দিরে কালাচাঁদ এবং শ্যামসুন্দর জিউয়ের মূল বিগ্রহ অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু রাজত্ব ভাগ হয়ে যাওয়ার পর কালাচাঁদ জিউয়ের বিগ্রহ অম্বিকানগরে এবং শ্যামসুন্দর জিউয়ের বিগ্রহ খাতড়া রাজবাড়িতে অধিষ্ঠান করে। মন্দিরের কথা লিখতে গিয়ে বিগ্রহ প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক। তাছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে প্রসঙ্গ তুলে ধরে ব্যাখ্যা করার সুবিধা হবে। খাতড়া

রাজ পরিবার থেজে আরও জানা গিয়েছে, রাজত্ব ভাগ হয়ে যাবার পর রাজারা বিগ্রহগুলিকে এনে প্রথমে বর্তমান খাতড়ার রাজাপাড়ার পশ্চিমদিকের এক জায়গায় রেখেছিলেন। সেখানেও মন্দির তৈরি করা হয়েছিল। কারণ এখনও ‘মন্দির গোড়া’ বলে একটি জায়গার নাম পাওয়া যায়। যদিও সেই মন্দিরের কোনও নিদর্শন বা ধ্বংসাবশেষ আজ আর দেখতে পাওয়া যাওয়া না। বর্তমানে খাতড়া রাজ পরিবারের মন্দিরে বাম দিক থেকে ডান দিকে সারিবদ্ধ ভাবে ১১টি বিগ্রহের অধিষ্ঠান। তাঁরা হলেন রাধারানী, শ্যামসুন্দর, রাধিকা, বৃন্দাবনচন্দ্র, রাধা, কৃষ্ণ, রাধাদামোদর, শ্যামসুন্দর, রাধা ও শ্যাম। বাকি একটি বিগ্রহের নাম জানা যায় নি। তাছাড়া মন্দিরে দুই নাড়ুগোপাল সহ বেশ কয়েকটি শালগ্রাম শিলা রয়েছে। যদিও দু একটি বিগ্রহ পরে সংযুক্ত হয়েছে বলেই মনে করা যায়। অম্বিকানগর রাজ পরিবারের মন্দিরে বাম দিক থেকে ডান দিকে কালাচাঁদ, শ্রীমতি, শ্যামচাঁদ এবং শ্রীমতির অধিষ্ঠান। এতগুলি বিগ্রহ একসাথে সুপুর গ্রামে অবস্থিত ওই মন্দিরটিতে অধিষ্ঠিত ছিল বলেই রাজপরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে।

তবে সুপুর গ্রামের অবস্থিত ধবলদেব রাজবংশের আমলে নির্মিত এই স্থাপত্যটি এলাকার মানুষের কাছে শতাব্দীপ্রাচীন কাল ধরেই মন্দিরের ধারণায় দণ্ডায়মান। কিন্তু এই স্থাপত্যটির মধ্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মন্দির না হবার সম্ভাবনাও লক্ষ করা যায়। যদিও সুপুর গ্রামের এই মন্দিরটি নিয়ে তেমন কোথাও কোনও প্রামান্য নথিপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আনুমানিক পাঁচ শতাধিক বছর পূর্বে নির্মিত স্থাপত্যটিকে বর্তমানে যেমন দেখা যাচ্ছে সেই তথ্য, অনুমান মিশিয়ে একটি রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আগেই স্থাপত্যটির নির্মাণ বা গঠনশৈলীর কথা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি মন্দিরের আদল থাকলেও এটি ‘ওয়াচ টাওয়ার’ হওয়াও অনুমেয়। পর্যায়ক্রমে সেই কথা তুলে ধরা হল।

প্রথমত, রাজা জগন্নাথ ধবল শাহাজাদাদেব সুপুর গ্রামের উত্তরে আড়াই কিমি দূরে একটি টিলার উপরে রাজত্ব স্থাপন করেন। জায়গাটি তখন ফাঁকা এবং প্রায় জনবসতিহীন ছিল। এলাকা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, বনাঞ্চল। সেইসময় খাতড়ার স্থানীয় ভূস্বামী ছিলেন চিন্তামণি রজক নামে দোর্দণ্ডপ্রতাপ এক ব্যক্তি। তাঁর লোক লস্কর এবং প্রচণ্ড দাপট ছিল। তাই বাইরের থেকে আসা রাজাদের তিনি সহজেই মেনে নিতে পারেননি। রাজাদের কাছে সেই খবর যায়। তাঁরাও বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ীভাবে রাজত্ব স্থাপন করে সুপুরে এসেই আস্থানা গেড়েছেন। যেভাবেই হোক এখানেই পাকাপাকিভাবে থাকার সিধান্ত নেন। তাই চিন্তামণি রজকের সাথে রীতিমতো যুদ্ধ করে রাজত্ব আদায় করতে হয়েছিল। তাই জনহীন জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় নতুন এসে বহিঃশত্রুর গতিবিধি লক্ষ করার জন্যও এই স্থাপত্যটি তৈরি হয়ে থাকতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এই স্থাপত্যটি দোতলা। পূর্ব দিক থেকে বাম দিকে দোতলায় যাবার সিঁড়ি ছিল। ওপরে উঠে চারদিকে মুখ করে চারজন সৈনিকের দাড়াবার জায়গা রয়েছে। সেখান থেকে উত্তরে রাজার রংমহলের দিকে সরাসরি নজর রাখা যেত। তাই বাইরের কোনো শত্রু ঢোকার চেষ্টা করলে সৈন্যরা তা সহজেই দেখতে পেয়ে যেত। যদি সত্যিই

এটি মন্দির হয়ে থাকে তাহলে নীচে দেবতা রেখে ওপরে যাবার সিঁড়ি করার কারণ স্পষ্ট নয়। যদিও বর্তমানে সিঁড়িটির অনেকটাই ভেঙে গিয়েছে।

তৃতীয়ত, স্থাপত্যের নিচের গর্ভগৃহটির মাপ উপরে উল্লেখ করা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ওইটুকু জায়গার মধ্যে পাশাপাশি বাম দিক থেকে ডান দিকে ২০টির মতো বিগ্রহের অবস্থান কখনওই সম্ভব নয়। যেহেতু বর্তমানে দুই রাজবাড়ির মন্দিরগুলিতে রাখা বিগ্রহগুলি একসারিতে পাশাপাশি অবস্থান করছে। তাছাড়া খাতড়ার বিভিন্ন এলাকায় শ্যামসুন্দরজিউ, রাধা-দামোদর, কালাচাঁদ-শ্রীমতি প্রমূখ বিগ্রহের যে সমস্ত অন্যান্য মন্দিরগুলি বিভিন্ন গ্রামে দেখতে পাওয়া যায় সেখানেও একসারিতে বিগ্রহগুলি অধিষ্ঠিত। খাতড়ার মন্দিরের কৃষ্ণের ডানদিকে রাধিকা এবং অম্বিকানগরের মন্দিরে কৃষ্ণের বাম দিকে রাধিকার অবস্থান। বিগ্রহ রাখার ক্ষেত্রে যদি এই নিয়ম থাকে তাহলে স্থাপত্যের গর্ভগৃহটির ভেতরে খুব বেশি হলে ৫-৬টি বিগ্রহ রাখার মতো স্থান রয়েছে।
চতুর্থত, স্থাপত্যের উত্তর দিকের দরজার সাথে রাজার ঢিবি একই অক্ষরেখায় অবস্থান করছে। মাঝখানে রয়েছে রাজার বাঁধ। কিন্তু উত্তরের দরজার ঠিক দুপাশে সমান্তরাল ভাবে দুটি ছিদ্র রয়েছে। সৈন্যরা মশাল জ্বেলে ওই ছিদ্রদুটিতে x গুণ চিহ্নের আকারে ঢুকিয়ে রাখত বলেই অনুমান করা যায়। কারণ, রাজারা তাহলে স্বস্তি পেত যে, সৈন্যরা সজাগ রয়েছে।

পঞ্চমত, এই স্থাপত্য অর্থাৎ মন্দিরগাত্রে চিত্রিণী ফলকে নৃত্যরতা রমনী, রাধাকৃষ্ণের লীলা, সৈন্যদের শিকার বিষয়ক ছবি ছিল বলে স্থানীয়দের কেউ কেউ বলছেন। যদি মন্দিরটি বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের সমসাময়িক হয়, তাহলে ওখানকার মন্দিরের গায়ের টেরাকোটার চিত্রিনী ফলকের অনেকাংশে এখনও টিকে থাকলেও এই মন্দিরের দেওয়ালের সমস্ত চিত্রিনী ফলকগুলি উধাও হল কীভাবে? শুধুমাত্র স্থাপত্যটির উত্তরের দরজার উপরে দুই পাশে অশ্বারোহী দুই সৈনিকের যুদ্ধের ভঙ্গিমার টেরাকোটার চিত্রিনী ফলক রয়েছে। যদিও কালের নিয়মে সেগুলি অনেকটাই অস্পষ্ট। মন্দিরের গায়েই চিত্রিনী ফলক গাঁথা থাকার কথা। দেওয়ালের উপর আলাদা করে বসানোর কথা নয়। কারণ এই স্থাপত্যটির দেওয়ালে যে দুটি চিত্রিনী ফলক এখনও অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলি ইটের সঙ্গেই গাঁথা অবস্থায় রয়েছে। তাছাড়া গোটা স্থাপত্যটির কোথাও আর চিত্রিনী ফলক গাঁথার নমুনা দেখতে পাওয়া যায় না। যদি অবহেলায় মন্দিরটি নষ্ট হয়েছে ধরে নিই, তাহলে সুপুর এবং খাতড়ার দূরত্ব খুব বেশি হলে ৫ কিলোমিটার। এত কাছাকাছি থাকার পরেও ধর্মপ্রাণ রাজারা এই মন্দিরটির প্রতি যত্নশীল হন নি। অথবা সুপুর গ্রামেই কোনও ব্রাক্ষ্মণকে এখানে পুজো এবং মন্দির দেখভাল করার কাজে নিযুক্ত করেন নি। তাছাড়া গ্রামটিতে আর তেমন কোনও বড়ো মন্দির না থাকায় স্থাপত্যটি স্থানীয়দের কাছে মন্দিরের কিংবদন্তীতে বেঁচে থাকলেও পরম্পরাগত ভাবে মন্দিরের ধর্মীয় গুরুত্ব পায় নি। বর্তমানে ঝোপঝাড় আর চারপাশে আবর্জনায় ভরা ব্রাত্য স্থাপত্যটিতে কোনও পুজোর ব্যবস্থা নেই। পরম্পরাগতভাবে এটি মন্দিরের ধর্মীয় গুরুত্ব পেলে নিশ্চয়ই স্থানীয়রাও সেই ভাবধারাকে টিকিয়ে রাখতেন বলেই অনুমান করা যায়।

ষষ্ঠত, রাজা টেকচন্দ্র ধবলদেব ও খড়্গেশ্বর ধবলদেব খাতড়া ও অম্বিকানগরে রাজত্ব স্থাপন কালে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী রাজা ছিলেন বলেই জানা যায়। সুপুর থেকে রাজত্ব ওই দুই জায়গায় ভাগ হয়ে যাওয়ার সময় আলাদা দুটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। সুপুরের কালাচাঁদ-শ্যামসুন্দর জিউ সহ অন্যান্য বিগ্রহগুলিও দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। অম্বিকানগরের রাজবাড়ির সামনের কালাচাঁদ জিউয়ের মন্দিরটি রেখদেউল আদলের। অন্যদিকে খাতড়ার রাজবাড়ির পাশের শ্যামসুন্দর জিউয়ের মন্দিরটি রেখদেউল আকৃতির বা সুপুরের স্থাপত্যটির আদলে তৈরি করা হয় নি। অর্থাৎ একই দেবতার মন্দির ভাগ হয়ে যাওয়ার সময় ভিন্ন ভিন্ন রূপ পেয়েছে।

সপ্তমত, সুপুর গ্রামের এই স্থাপত্যটিকে মন্দির হিসেবে ধরে নিলে রাজারা যাতে মন্দির এবং বিগ্রহ রাজমহল থেকেই দেখতে পান সেই জন্য রাজমহল বা 'রংমহল'-র সোজা মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে মন্দিরে যেতে হলে আড়াই কিমি পথ ঘুরে বর্তমানে বাঁকুড়া-খাতড়া মূল রাস্তার উপর দিয়ে সুপুর গ্রামের ভেতরে ঢুকে যেতে হবে। কারণ মাঝখানে পরিখা এবং জলাশয় থাকার কারণে রাজবাড়ি থেকে সোজা ভাবে কখনোই মন্দিরটিতে যাওয়া সম্ভব নয়। খাতড়া ও অম্বিকানগরের রাজবাড়ির সামনে পুকুর অথবা পরিখা থাকলেও সেই পুকুরের পাড়ে মন্দির নির্মিত না হয়ে রাজবাড়ির মধ্যেই নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু সুপুরে রাজারা বত্রিশ পুরুষ বসবাস কালে রাজমহল সংলগ্ন মন্দির নির্মাণ করেন নি। এই স্থাপত্যটির সাথে রাজমহলের দূরত্বের কারণে মন্দিরের সম্পর্কটি নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। যদি বিগ্রহ দর্শনের জন্য রাজমহলের মুখোমুখি মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্য বা নিয়ম হয়ে থাকে তাহলে দেবতা একই থাকা সত্বেও রাজত্ব ভাগ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়মও কী বদলে গিয়েছে? খাতড়া রাজবাড়ির পশ্চিমে এবং অম্বিকানগর রাজবাড়ির দক্ষিণে পুকুর রয়েছে। রাজবাড়ির মুখোমুখি ওই পুকুরগুলির পাড়ে কূলদেবতার মন্দির নির্মিত না হয়ে তা ওই দুই রাজবাড়ির পাশে নির্মিত হয়েছে।

যদিও সুপুর গ্রামের এই স্থাপত্যটিকে সরাসরি মন্দির অথবা ওয়াচ টাওয়ার কোনটাই বলা সম্ভব নয়। তবে প্রায় সমস্ত মানুষের কাছে এখনও পর্যন্ত এটি কিংবদন্তী অনুযায়ী মন্দির হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখন আর মন্দিরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং স্থাপত্যটির ঐতিহাসিক দিক দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তার কারণ, এলাকায় অত প্রাচীন আমলের কোনও স্থাপত্য, মন্দির অথবা ঐতিহাসিক নিদর্শন আর একটিও দেখতে পাওয়া যায় নি। সেই দিক দিয়ে এই স্থাপত্যটি রাজকাহিনীর সাক্ষ্য নিঃশব্দে বহন করে চলেছে। কাল সীমানার গণ্ডি ছাড়িয়ে এখনও দণ্ডায়মান ইতিহাসের উদাহরণ হিসেবে।

গ্রন্থঋণ : O'Malley. L.S.S : Bengal District Gazetteers, Bankura
ভট্টাচার্য তরুণদেব, 'বাঁকুড়া'
ব্যক্তিঋণ : হিতেশ্বর ধবল শাহাজাদাদেব, গৌরীশংকর নারায়ণদেও, কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, নিমাই চট্টোপাধ্যায়, আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনেশ রায়।

গোঁসাইপুর গ্রামের জৈন অম্বিকাঃ একটি অনালোচিত প্রত্নমূর্তি ও বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত কিছু অম্বিকামূর্তির বিবরণ

শুভম্ মুখোপাধ্যায়

বাঁকুড়ায় জৈনধর্ম — একটি বহু আলোচিত বিষয়। প্রায় সমগ্র বাঁকুড়া জুড়েই এককালে জৈনধর্মের প্রভূত প্রভাব ও বিস্তৃতি ছিল। এই বিস্তারের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্বাব্দ কাল থেকেই। কয়েকজন তীর্থঙ্কর ও শ্রমণ-শ্রাবক শ্রেণি এই 'বজ্জভূমি' ও 'সুবভভূমি' (বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমি) নামে অভিহিত দুর্গম রাঢ়ভূমিতে জৈনধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। যদিও তাঁরা বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমিতে চরম লাঞ্ছনা পেয়েছিলেন। দিগম্বর জৈনসন্ন্যাসীদের দেখে এই অঞ্চলের লোকেরা 'ছু-ছু' করে কুকুর লেলিয়ে দিত—

"ছুচ্ছুক্ কারেন্তি আহন্তুং সমণং কুক্কুরা ডসন্তুত্তি।।"[১]

প্রাকৃত ভাষায় লেখা জৈনগ্রন্থ 'আয়ারাঙ্গ সুত্তে' জৈনসন্ন্যাসীদের রাঢ় অঞ্চল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা স্বরূপ এই করুণ ও সজীব বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু জৈনসন্ন্যাসীরা দমে যান নি। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলে লালিত হয়েছিল জৈনধর্ম, জৈন সংস্কৃতি, জৈন তীর্থঙ্কর ও দেবদেবীদের প্রাচীন মূর্তিগুচ্ছ।

বাঁকুড়া অঞ্চলে জৈনধর্ম ও জৈনসভ্যতার বিস্তারে দামোদর, দ্বারকেশ্বর ও কংসাবতী— এই তিন নদীর ভূমিকা অসামান্য। এই তিননদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অগণিত জৈনমূর্তি পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত জৈনমন্দির। কিন্তু এই তিন নদী দিয়ে বাঁকুড়ার জৈনধর্মের পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ অনুসন্ধান করা মুশকিল। কারণ ছোটছোট

নদীগুলিও এই বিস্তৃতির পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। যেমন বাঁকুড়ার উত্তরপ্রান্তে বয়ে চলা ছোট্ট শালী নদী। অন্যান্য নদীগুলির মত প্রভূত পরিমাণে না হলেও এই নদীর দুই তীরে বিক্ষিপ্তভাবে বেশকিছু জৈনমূর্তি ও জৈনমন্দিরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই নদীর তীরবর্তী রণিয়াড়ায় জৈন মন্দির ও তীর্থঙ্করের ভগ্ন মূর্তি দেখা যায়। আবার বেলিয়াতোড়ে বাসুলী হিসাবে পূজিত হয় জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি। তেমনই এই শালীনদীর তীরবর্তী গ্রাম গোঁসাইপুর। এখানেই আমরা জৈন অম্বিকামূর্তি পেয়েছি— ইতিপূর্বে এই গোঁসাইপুরের জৈন অম্বিকা মূর্তিটি বিষয়ে কোথাও আলোচনা হয় নি। বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করা হল।

। ১।

গোঁসাইপুর বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া ব্লকের অন্তর্গত একটি নাতিবৃহৎ গ্রাম। গ্রামটি জঙ্গলবেষ্টিত। গোঁসাইপুরের উত্তরদিকে আরও কিছুটা গেলে গদারডিহি নামে একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী গ্রাম পাওয়া যায়। এই গ্রামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামী পরিবার বসবাস করেন। শোনা যায়, তাঁদের ইষ্টদেবতা রাধারমণের সেবার উদ্দেশ্যে মল্লরাজারা বহু ভূসম্পত্তি প্রদান করেছিলেন। গোঁসাইপুর গ্রামের দশ আনা সম্পত্তি হল গদারডিহির গোস্বামীদের অধিকারে। গোস্বামীদের প্রভাব হেতু গ্রামটির নাম হয় গোস্বামীপুর— বর্তমানে লোকমুখে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে গোঁসাইপুর।[২]

এই গোঁসাইপুর গ্রামে প্রবেশ করার পথেই চোখে পড়ে সুবৃহৎ এক মন্দির— ভবানী মন্দির। দেবী লোকমুখে ভবানী নামে পরিচিতা হলেও আদিতে তিনি জৈনদের পূজিতা অম্বিকাদেবী। প্রায় এক ফুট উচ্চতার কালো পাথরে লো রিলিফে খোদিত এই মুর্তিতে বয়সের ছাপ সুস্পষ্ট। মসৃনতাও তাই উধাও। অম্বিকা বেদীতলের উপর অর্ধপর্যাঙ্কাসনে উপবিষ্টা। মাথায় ক্ষুদ্র মুকুট, কানে কুণ্ডল, গলায় হার। দেবী পীনোন্নত পয়োধরা ও নাগযজ্ঞোপবীত পরিহিতা। হাতে কঙ্কণ, পায়ে নুপুরও দেখা যায়। বাম ক্রোড়ে অম্বিকার কনিষ্ঠপুত্র— নাম প্রিয়ঙ্কর। দেবী অসীম মমতায় তাকে বামহাতে ধরে রেখেছেন, আর ডানহাতে আশীর্বাদী মুদ্রায় ধরে আছেন আম। দেবীর দক্ষিণভাগে দাঁড়িয়ে আছেন জ্যেষ্ঠপুত্র শুভঙ্কর, তাঁর একটি হাত কোমরের কাছে, অন্য হাতটি বুকের কাছে ন্যস্ত। দেবীর মাথার উপরেও রয়েছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি সফলা আমগাছের ঝাড়। পদতলে রয়েছে ক্ষুদ্র সিংহের প্রতিকৃতি, সিংহই দেবীর বাহন। উপবেশন পীঠের নিচে রয়েছে প্রার্থনারত নরনারী। মূর্তিটির উপরি অংশে আমঝাড়ের দুপাশে রয়েছে উড়ন্ত বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী— তাঁরা মালা হাতে অম্বিকাদেবীকে বরণের জন্য প্রস্তুত। আমঝাড়ের উপরে অর্থাৎ মূর্তিটির শীর্ষে ধ্যানস্থ অবস্থায় রয়েছেন অম্বিকাদেবীর অধীশ্বর তথা দ্বাবিংশতিতম জৈনতীর্থঙ্কর নেমিনাথ। নেমিনাথের মূর্তিটি ক্ষুদ্র, তার উপর সিন্দুরের প্রলেপে লিপ্ত হয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। আনুমানিক দশম শতাব্দীতে এই মূর্তিটি নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

। ২।

জৈনধর্মানুসারে ইন্দ্র চব্বিশজন তীর্থঙ্করের সেবার জন্য একজন করে যক্ষ ও যক্ষিণীকে নিযুক্ত করেছিলেন।[৩] এই যক্ষ ও যক্ষিণীকে শাসনদেবতা ও শাসনদেবীও বলা হয়ে থাকে। অম্বিকাও একজন শাসনদেবী। তিনি বাইশতম তীর্থঙ্কর নেমিনাথের সঙ্গে যুক্ত। দুঃসম-সুষম যুগে রাজা সমুদ্রবিজয় ও রানি শিবাদেবীর পুত্র হিসাবে নেমিনাথ জন্মগ্রহণ করেন। গর্ভাবস্থায় শিবাদেবী অরিষ্টনেমি বা রত্নচক্র দেখেছিলেন, তাই পুত্রের নাম হয় অরিষ্টনেমি। সংক্ষেপে নেমিনাথ। জৈন পুরাণ অনুসারে, কৃষ্ণ-বলরামের পিতা বসুদেব ছিলেন সমুদ্রবিজয়ের ভ্রাতা। তাই নেমিনাথ হলেন কৃষ্ণ-বলরামের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র।[৪] নেমিনাথের লাঞ্ছন শঙ্খ। শাসনদেবী অম্বিকা সহ তাঁর শাসনদেবতা হলেন গোমেধ।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর— জৈন ধর্মের এই দুটি ধারাতেই নেমিনাথের শাসনদেবী অম্বিকার উল্লেখ আছে। যদিও দুটি ধারায় অম্বিকার মূর্তির বৈশিষ্ট্য পৃথক-পৃথক। শ্বেতাম্বর জৈনধারায় অম্বিকা সিংহোপরি অধিষ্ঠিতা, স্বর্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণের হস্তদ্বয়ে ধারণ করেন পুত্র ও অঙ্কুশ, বামহস্তদ্বয়ে আম্রলুম্বী ও পাশ।[৫] তাঁর অপরনাম কুষ্মাণ্ডী। অন্যদিকে জৈনগ্রন্থ 'প্রতিষ্ঠাসারসংগ্রহ'-এ দিগম্বর জৈনসম্প্রদায়ের অম্বিকাদেবীর লক্ষণ হিসাবে বলা হয়েছে—

"দ্বিভুজা সিংহমারূঢ়া আম্রাদেবী হরিৎপ্রভা।।"[৬]

—অর্থাৎ অম্বিকা বা আম্রাদেবী দ্বিভুজা, সিংহের উপর অধিষ্ঠিতা, হরিৎ বর্ণের প্রভাযুক্ত। বাঁকুড়ায় যেহেতু দিগম্বর জৈনসম্প্রদায়েরই প্রভাব ছিল, তাই গোঁসাইপুরের অম্বিকামূর্তিটিও দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী তৈরী।

অম্বিকা বা কুষ্মাণ্ডী নাম দুর্গার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বাহন সিংহও সেই ইঙ্গিত দেয়। এই দুই ধর্মের একটি অসাধারণ বিমিশ্রন দেখি অম্বিকায়। আবার উক্ত শ্লোকটি থেকে দেবীর 'আম্রা' নামটি পাওয়া যায়, বুঝতে অসুবিধা হয় না আম্র বা আম থেকেই দেবীর এই নাম। দুই সম্প্রদায়েই দেবীর এক বিশিষ্ট প্রতীক হিসাবে আম বা সফলা আম্রবৃক্ষকে দেখি। অম্বিকা একাধারে পুত্রদায়িণী ও ফলদায়িণী— কোলে অধিষ্ঠিত শিশুপুত্র ও আম আমাদের সেই কথাটিই স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার হরিৎ বা সবুজবর্ণ দেবীর শস্যদায়িণী রূপটিও স্পষ্ট করে। ফলে অম্বিকা একাধারে বহু সংস্কৃতির সম্মিলিত রূপ।

। ৩।

এ অঞ্চলে জৈনপ্রভাব অবলুপ্ত হলে যখন হিন্দুধর্মের উত্থান ঘটল, তখন জৈন তীর্থঙ্কর ও যক্ষ-যক্ষীদের মূর্তিগুলি নিজেদের মত করে হিন্দুধর্ম অন্তর্ভুক্ত করে নিল। কিন্তু সেইসব দেবদেবীদের বেশিরভাগটাই কৌলিন্য পেলেন না, অন্ত্যজশ্রেণিদের হাতে পূজিত হয়ে লোকদেবতাতেই হল তাঁদের গতি। তাই বেশিরভাগ মূর্তিগুলির স্থান হল গ্রামের প্রান্তে, হয় খোলা আকাশের নিচে বা গাছ তলায়। যেমন ঋষভনাথ পরিণত হলেন শিব, ভৈরব, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি শিবসদৃশ দেবতায়, কারণ ঋষভনাথের মূর্তির নিচে খোদিত থাকে তাঁর লাঞ্ছন ষাঁড়ের ছোট্ট মূর্তি। এই ষাঁড়ের মূর্তিটি ঋষভনাথ ও শিবের মধ্যে একটি লৌকিক সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। আবার সপ্তসর্পের ছত্রধারী পার্শ্বনাথ রূপান্তরিত হলেন বিষ্ণু বা মনসায়। যেহেতু পার্শ্বনাথের প্রতীক হল সাপ, এই সাপ

পার্শ্বনাথকে মিলিয়ে দিল বিষ্ণু বা মনসার সঙ্গে। বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে এভাবেই জৈনমূর্তিগুলি নিজেদের স্বরূপ হারিয়ে লোকসমাজের নির্ধারিত আখ্যায় আখ্যায়িত হয়ে সিন্দুর, চন্দনে অর্চিত হচ্ছে।

গোঁসাইপুরের জৈন অম্বিকামূর্তিটি 'ভবানী' নামে, দুর্গাজ্ঞানে পূজিতা। এধরণের মূর্তিকে দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন করার কারণটিও গবেষণার বিষয়। দেবীর সেবাইত গ্রামস্থ মহন্ত পরিবার দেবীকে অম্বিকা নামেও পূজা করেন, যদিও মূর্তিটি যে জৈন অম্বিকা দেবীমূর্তি তা তাঁরা জানেন না, জানা সম্ভবও নয়। কিন্তু এধারণা করা ভুল হবে না, মূর্তির নাম যে অম্বিকা, তা এ অঞ্চলে জৈনপ্রভাব শেষ হয়ে গেলেও মানুষ ভোলেন নি। তারপর নামের জন্যই হয়ত তা দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়। দেবীর পদতলে স্থিত সিংহ এই মিশ্রণকে ত্বরান্বিত করেছিল। আবার মাথার উপর ধ্যানস্থ নেমিনাথও বর্তমানে শিবে রূপেই পূজিত হচ্ছেন।

দেবীমূর্তি বর্তমানে সুবৃহৎ মন্দিরে অধিষ্ঠিতা হলেও পূর্বে তিনি ঐস্থানেই একটি শ্যাওড়া গাছের তলায় বিরাজিতা ছিলেন। জনশ্রুতি, এই মহন্ত পরিবারের পূর্বপুরুষ নদেরচাঁদ (নদ্যারচাঁদ) মহন্ত এই মূর্তিকে শালীনদীর তীরে পেয়েছিলেন।[৭] পরে দেবীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে তাঁকে গ্রামমধ্যে স্থাপিত করেন। এই দেবীও যে পূর্বে লোকদেবতা রূপেই মান্য ছিলেন তা তাঁর গাছতলায় অবস্থিতি থেকেই বোঝা যায়। বর্তমানে নদেরচাঁদের উত্তরপুরুষ রাধারমণ মহন্ত দেবীর সেবাইত।

শারদীয়া দুর্গাপূজায় দেবীর বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দশভুজা দুর্গার মন্ত্রেই আরাধিতা হন দ্বিভুজা অম্বিকা। মহানবমীতে চালকুমড়া, আঁখ, পাঁঠা ইত্যাদি দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। ভাবতে অবাক লাগে, অসিংহ ধর্মের দেবী হয়েও ধর্মের পরিবর্তনে কীভাবে তাঁর উপাচারেও আসে রাজসিকতা! যাই হোক, দেবীর নিত্যপূজা হয় না। প্রতিমাসের সংক্রান্তি দিনে আতপচাল বাতাসা প্রভৃতি সামান্য উপাচারেই তিনি খুশি। গোঁসাইপুর বা আশেপাশের গ্রামের লোকেদের কাছে দেবী খুবই জাগ্রতা বলে বিশ্বাস। এখনও সেবাইত স্বপ্নাদ্য ওষুধ দিয়ে থাকেন। এমনও কি সন্তানধারণের ওষুধেরও প্রচুল চল আছে। অম্বিকা শিশুরক্ষক দেবীত্বের প্রভাব কি লোকমানসে এখনও অক্ষুন্ন—হয়ত সেটা অজান্তেই, ভবানী দুর্গার আড়ালে!

। ৪।

বাঁকুড়া-পুরুল্যার বিভিন্ন স্থানে জৈন অম্বিকামূর্তি পাওয়া গেছে। বাঁকুড়া জেলার বিশেষত দক্ষিণ বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রচুর অম্বিকা মূর্তি পাওয়া যায়। রাইপুর ব্লকের সাতপাট্টা গ্রাম থেকে সংগৃহীত একটি দণ্ডায়মানা অম্বিকা মূর্তি বিষ্ণুপুর 'আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় পুরাকৃতি ভবনে' সংরক্ষিত আছে। মূর্তিটি ক্ষয়িত, মূর্তিটির পরিচায়িকায় নির্মানকাল একাদশ শতাব্দীর বলে অনুমান করা হয়েছে। ঐ সাতপাট্টা গ্রামেরই শীতলামন্দিরে আরও একটি অম্বিকা মূর্তি দেওয়ালে গাঁথা আছে।

বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের কেচন্দা গ্রামে একটি বিখ্যাত জৈন অম্বিকা মূর্তি আছে। মূর্তিটির নাখ ভেঙ্গে গেছে বলে বর্তমানে খাঁদারানি বলে পুজিত হয়। প্রায় চার ফুট উচ্চতার

এই দণ্ডায়মানা অম্বিকা মূর্তির পেছনের চালচিত্রে জৈনপুরাণের গল্প খোদিত আছে। ১৯২৫খ্রিস্টাব্দে এই মূর্তিটি দেখতে এসেছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। সঙ্গে ছিলেন তৎকালীন বাঁকুড়ার ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টার জে. সি. ফ্রেঞ্চ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় (মাঘ, ১৩৩৬ সাল) 'দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের শিল্প' শিরোনামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে এই কেচন্দার মূর্তিটি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছিল। তাঁর মতে, "কিচন্দার বিশাল শাসনদেবীর মূর্তি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।"[৮] বাঁকুড়া-পুরুল্যায় প্রাপ্ত অম্বিকা মূর্তিগুলির মধ্যে কেচন্দার অম্বিকা মূর্তিটি সত্যিই অনন্য ও বিরল শিল্পের নিদর্শন।

খাতড়ার কাছে বিখ্যাত মুকুটমণিপুর জলাধারের সন্নিহিত প্রাচীনগ্রাম অম্বিকানগর, যা অম্বিকাদেবীর সাথে যুক্ত। প্রাচীন পুঁথিতে গ্রামটির নাম পাওয়া যায় আমাইনগর। 'আমাই' নামটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'আই' শব্দটির অর্থা হল 'মা', 'আমাই' শব্দটি 'আমের মা'—এই অর্থ দ্যোতনা করে। ফলে আমাইনগর নামের মধ্যেও অম্বিকাদেবীর 'আম্রা' নামের এক অদ্ভুত সংযোগ পাওয়া যায়। অম্বিকানগরের ধবলদেব রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অম্বিকা। ইনিও দুর্গারূপেই উপাসিতা। এই অম্বিকামূর্তির সর্বাঙ্গ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত থাকার জন্য মূর্তির আসল রূপ উদ্ধার করা যায় না। তবে সমগ্র অঞ্চলটিতে এককালে জৈনধর্মের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। অম্বিকা মন্দিরের পাশেই একটি প্রাচীন জৈনমন্দির আছে, যেখানে প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ শিব রূপে পূজিত হচ্ছেন। ফলে এই অম্বিকামূর্তির রূপটি ঠিক ধরা না গেলেও ইনি যে জৈনদেবী, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। এছাড়াও অম্বিকানগরের নিকটস্থ বড়কোলা গ্রামে দণ্ডায়মানা অম্বিকামূর্তি পাওয়া গেছে।

বেশকিছু স্থানে পাথরে খোদিত আম্রবৃক্ষের নিচে পুরুষ-নারীর মিথুন মূর্তি দেখা যায়। ললিতাসনে উপবিষ্ট নারী-পুরুষের উভয়ের কোলেই শিশুপুত্র দেখা যায়। এগুলি জৈন হরগৌরী নামে উল্লিখিত হয়, হিন্দু হরগৌরীর মত ঐ যুগল মূর্তি আসলে অম্বিকা ও গোমেধ যক্ষের। নেমিনাথের শাসনদেবী ও শাসনদেবতা হিসাবে জৈনসমাজে অম্বিকা-গোমেধের যুগলমূর্তির পূজা বহুল প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুপুর 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে' এরকম একটি যুগল মূর্তি আছে, মূর্তিটির ঊর্ধ্বাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। পরিচায়িকায় 'Parents of Jain Tirthankar' বলে উল্লেখ করা হলেও যুগলের ডানহাতে আম্রগুচ্ছ দেখেই বোঝা যায় এ মূর্তি অম্বিকা ও গোমেধের।

সিমলাপাল রাজবাড়ির বলরাম জিউ মন্দিরে একাধিক জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তির সঙ্গে দুটি দণ্ডায়মানা অম্বিকাদেবীর মূর্তি আছে। দুটি মূর্তির উচ্চতার পার্থক্য থাকলেও দুটিই অভগ্ন ও অসাধারণ শিল্পচেতনার নিদর্শন। এছাড়াও এই মন্দিরে অম্বিকা-গোমেধের দুটি যুগল মূর্তিও আছে। সবুজাভ ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত মূর্তিদুটি নয়নাভিরাম। স্থানীয় মানুষদের বক্তব্য অনুযায়ী, এই মূর্তিগুলি নিকটস্থ শিলাবতী নদীতে পাওয়া গিয়েছিল। রাজবংশের প্রতিথযশা সন্তান মদনমোহন সিংহমহাপাত্র এগুলি সংগ্রহ করে মন্দিরের দেওয়ালে গেঁথে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সিমলাপালের নিকটবর্তী গোতড়া গ্রামেও একটি দণ্ডায়মানা অম্বিকামূর্তি আছে।

উত্তর বাঁকুড়ায় খুব একটা অম্বিকা মূর্তি পাওয়া যায় নি, তাই গোঁসাইপুরের অম্বিকা মূর্তিটির গুরুত্ব অসীম। এছাড়াও আমরা যে মূর্তিগুলির কথা বললাম, সেগুলি সবই দণ্ডায়মানা অম্বিকার মূর্তি। শুধুমাত্র গোমেধ যক্ষের সাথে যুগলভাবে উপাসিত অম্বিকা মূর্তিই উপবেশন অবস্থায় দেখা যায়। এখানেও গোঁসাইপুরের মূর্তিটি স্বতন্ত্র, একক মূর্তি হিসাবেই এখানে অম্বিকা পীঠোপরি উপবেশন করছেন।

। ৫।

চব্বিশ তীর্থঙ্করের মধ্যে সব তীর্থঙ্কর সমান জনপ্রিয় ছিলেন না। বাংলাতেও চব্বিশ তীর্থঙ্করের একক মূর্তি খুবই কম পাওয়া গেছে। আবার আদিনাথ, শীতলনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ, মহাবীর—এই তীর্থঙ্করদের বহুমূর্তি এই অঞ্চলে পাওয়া গেছে, বোঝা যায় এই তীর্থঙ্করগণ অধিকমাত্রায় জনপ্রিয় ছিলেন। জনপ্রিয়তার তারতম্য যেমন তীর্থঙ্করদের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়, ঠিক তেমনই ঘটে শাসনদেবদেবীদের ক্ষেত্রেও। ক্ষেত্রসমীক্ষায় আমরা দেখি, নেমিনাথের শাসনদেবী অম্বিকার মূর্তি বাঁকুড়া-পুরুল্যায় যত পাওয়া গেছে, তেমনটি আর অন্য কোন শাসনযক্ষিণীদের এত মূর্তি পাওয়া যায় না। ফলে যক্ষিণীদের মধ্যে অম্বিকার পূজা একসময়ে এই অঞ্চলে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল তা বলাই বাহুল্য। এই জনপ্রিয়তার বশেই কোন এক নাম-না-জানা শিল্পীর হাতে গড়ে ওঠা ও শ্রমণ-শ্রাবকদের তন্নিষ্ঠ ভক্তিতে পূজিতা অম্বিকা মূর্তিটি হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে এখনও পূজা পাচ্ছেন গোঁসাইপুরে— ভবানী হয়ে !

তথ্যসূত্র :

১। চট্টোপাধ্যায়, সুখময়, “বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসের আদিপর্ব ও শুশুনিয়া পর্বতলিপির ঐতিহাসিক বিবরণ”, প্রকাশকাল উল্লেখহীন, পৃষ্ঠা-১।

২। ক্ষেত্রসমীক্ষায় বলদেব ভট্টাচার্যের নিকট প্রাপ্ত তথ্য। ২৫।১২।২০১৫।

৩। BHATTACHARYA, B.C., “THE JAINA ICONOGRAPHY”— Published by Motilal banaraidass, Second Revised Edition: Delhi 1974, page-66.

৪। চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার (সম্পাদিত), “কল্পসূত্র”—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৩, পৃষ্ঠা- ৭॥৵০ ।

৫। TIWARI, M. N. P, “AMBIKA IN JAINA ART AND LITERATURE”— Published by BHARATIYA JNANPITH, NEW DELHI 1989, page-139.

৬। ঐ। page-139।

৭। ক্ষেত্রসমীক্ষায় রাধারমণ মহন্ত ও দীনবন্ধু মহন্তের নিকট প্রাপ্ত তথ্য। ২১।২।২০১৬।

৮। চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পাদিত), “প্রবাসী”—মাঘ ১৩৩৬, পৃষ্ঠা—৫৬৭। (‘দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের শিল্প’-রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)

ব্যক্তিগত ঋণ : সর্বশ্রী দুর্গাদাস মণ্ডল, রামামৃত সিংহমহাপাত্র, বিপদতারণ রায়, মহাদেব ভট্টাচার্য, বলদেব ভট্টাচার্য, রাধারমণ মহন্ত, দীনবন্ধু মহন্ত, শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়।
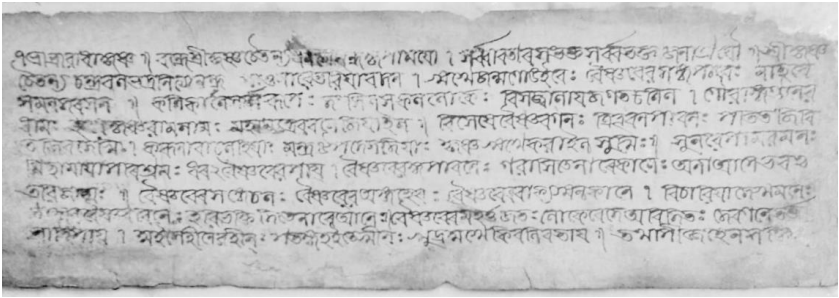
মাধব দাসের বৈষ্ণব বন্দনা : পুঁথিপাঠ ও সম্পাদনা

অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

মধ্যযুগের প্রতিটি মঙ্গলকাব্য শুরু হয়েছে বন্দনা-অংশ দিয়ে। বিভিন্ন দেবদেবীর বিস্তারিত বন্দনার সঙ্গে মুকুন্দের মতো অনেক কবি চৈতন্যবন্দনাও করেছেন। অন্যান্য শ্রেণির পাঁচালি কাব্যগুলিতেও বন্দনা প্রথমেই রয়েছে। আবার একটি পৃথক শ্রেণির কাব্য রচিত হয়েছে 'বৈষ্ণব বন্দনা' নামে। এগুলিতে বৈষ্ণব মহাজন ও গুরুদের নাম ধরে বন্দনা আছে। তিনজন কবির বৈষ্ণব বন্দনা কাব্য সেযুগে বহুল প্রচলিত ছিল—দৈবকীনন্দন, মাধব দাস ও বৃন্দাবন দাস। দৈবকীনন্দনের লেখা বৈষ্ণব বন্দনার বিস্তর পুঁথি মিলেছে এবং বহুবার সেটি ছাপা হয়েছে। কিন্তু মাধব দাসের বৈষ্ণব বন্দনার ছাপা বই বহু চেষ্টাতেও পাইনি। সুকুমার সেন বলেছেন, মাধব দাস বেশ প্রাচীন কবি।[১] মাধবের বৈষ্ণব বন্দনা ১৩১৭ বঙ্গাব্দে শিবচন্দ্র শীলের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে প্রথম ছাপা হয়। আমরা ভিন্ন পুঁথি অবলম্বনে দ্বিতীয়বার এটি প্রকাশ করলাম।

অন্যত্র রক্ষিত পুঁথি

আমাদের সংগৃহীত কপিটি ছাড়াও মাধব দাসের বৈষ্ণব বন্দনার আরও কিছু পুঁথি উদ্ধার হয়েছে। সেগুলি নিম্নোক্ত স্থানে রক্ষিত আছে—

১। মেদিনীপুর সাহিত্যসভা, নং ১১৬ [লিপিকাল ১২০৮], নং ৭০।

২। বরানগর পাঠবাড়ি, নং ৩১০৫/১০০ ক।

৩। মোক্ষদা সংগ্রহ, নং ৭৪৩।

এই চারটি পুঁথি তিনটি সংগ্রহশালায় আছে। এর তিনটি খণ্ডিত, একটি মোটামুটি অক্ষত। আমাদের কপিটি নিয়ে মোট পাঁচটি পুঁথি উদ্ধার হল।

কবি পরিচয়

মধ্যযুগে মাধব ও মাধবাচার্য নামে বহু কবির আবির্ভাব ঘটেছে। এই মাধব কোন্ ব্যক্তি—তা জানা যায় নি। মাধব দাসের বৈষ্ণব বন্দনার উল্লেখ নেই শ্রী হরিদাস রচিত

‘শ্রীশ্রী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য’ গ্রন্থে। উল্লেখ নেই ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান’-এ। অথচ দৈবকীনন্দনের পরিচয় সর্বত্র আছে। একারণেই মাধবের এই বইটি প্রকাশের প্রয়োজন হল। মাধব দাসের নামে এই রচনাগুলি পাওয়া গেছে—উদ্ধব সংবাদ, কালীয়দমন, কৃষ্ণমঙ্গল, কৃষ্ণলীলা, নামরত্নাবলী, নিগম, পদাবলী, মান ও বারমাসি-পুঁথি। এগুলি পরীক্ষা করে দেখেছি একজন মাধবের লেখা নয়। বিভিন্ন মাধবের। বৈষ্ণব বন্দনার মাধবের রচিত এগুলি কোন্‌টি, তা বোঝা যাচ্ছে না। কবির পরিচয়ও অন্ধকারাবৃত। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে তাঁর বৈষ্ণব বন্দনা প্রথম প্রকাশিত হয়।

পুঁথি পরিচয়

বৈষ্ণব বন্দনা। মাধব দাস। সম্পূর্ণ, ১-৯ পত্র, ১৭ পৃষ্ঠা। প্রথমপত্র একক। আয়তন ৩১ সেমি X ১০ সেমি। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পংক্তি, শেষ ৬ পংক্তি। তুলট কাগজ, কালো মসি কালিতে লিখিত।। ‘৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ’-লিখে পুঁথি শুরু হয়েছে। প্রতি পত্রের মার্জিনে পত্রসংখ্যা লিখিত। পুষ্পিকায় একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। লিপিকাল উল্লেখ নেই। লিপিকর শ্রী শ্রীনিবাস কর্মকার, সাকিন—সালবেদ্যা। পাঠক তিনি নিজেই। কাব্যটি ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে রচিত। ত্রিপদীর চিহ্ন ‘:’, পয়ারের চিহ্ন ‘।,।।’ পুঁথিতে ব্যবহৃত। যেহেতু লিপিকর নিজেই পড়ার জন্য লিখেছেন, তাই পারিশ্রমিক লেখা নেই। পুঁথিটির বানানরীতির কিছু বৈশিষ্ট্য হল—ক) সু>ষু অনেক স্থলে লেখা আছে; যেমন ষুখে। খ) শ>স, যেমন—সমন গ) ‘ষ’-এর স্থলে স; যেমন বিস। ঘ) ঈ-কার এর স্থলে ই-কার ব্যবহার। ঙ) ‘উ’-এর স্থলে ‘ঊ’-কার। চ) যুক্তব্যঞ্জনের মাথায় শ্বাসাঘাত চিহ্নের মতো রেফ্ বসেছে; যেমন—জগর্ন্নাথ ইত্যাদি। পৃষ্ঠা সংখ্যাকে আমরা ‘ক’ দিয়ে চিহ্নিত করেছি। পুঁথিটির একটি পাতা একটু নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পাঠ পড়া যায় নি।

লিপিকর জাতিতে কর্মকার, তাঁর বাড়ি বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি থানার কাপিষ্ঠা অঞ্চলের সালবাদ্যা গ্রামে। সালবাদ্যা বা শালবেদিয়ার সংলগ্ন গ্রামটি হল শালতোড়া। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই গ্রামটিতে গিয়ে চণ্ডীদাসের পদাবলির পুঁথি পেয়েছিলেন। আমরা শালতোড়ার সুধাময় চক্রবর্তীর বাড়িতে এই পুথিটি পেয়েছি। সংগ্রহে সাহায্য করেছেন শালবেদিয়ার তন্ময় মণ্ডল ও তন্ময় ডাঙর।

রচনাকাল

সুকুমার সেন লিখেছেন, “মহাপ্রভুর পারিষদদের মধ্যে একাধিক মাধব ছিলেন। তাহার মধ্যে কোন্ মাধব বৈষ্ণব বন্দনা লিখিয়াছিলেন তাহা বলা দুষ্কর। মাধবের কবিতা দেবকীনন্দনের রচনার পূর্ববর্তী বলিয়াই বোধ হয়।” [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। আনন্দ সংস্করণ: ১৯৯১, পৃ. ৩০৭] তাই হলে, অবশ্যই মানতে হবে মাধব দাসের কাব্য গুরুত্বপূর্ণ। দেবকীনন্দন বা দৈবকীনন্দনের সময়কাল কখন? বিমানবিহারী মজুমদার তন্নিষ্ঠ গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীতেই দেবকীনন্দন বৈষ্ণব বন্দনা রচনা

করেছিলেন।[২] ভক্তিরত্নাকর-এ নরহরি চক্রবর্তী দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ১৬৯৬ খ্রি. মনোহর দাস ‘অনুরাগবল্লী’-তে লিখেছেন—

শ্রী নিত্যানন্দপ্রিয় শ্রী পুরুষোত্তম মহাশয়।
শ্রী দেবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয়।।
তিহোঁ যে করিল বড় বৈষ্ণব বন্দন।
তাথে চারি সম্প্রদায় করিল লিখন।।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনার একটি পুঁথির (সংখ্যা ২০৮৪) লিপিকাল ১০৬১ সাল বা ১৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দ। অতএব, যদি দেবকীনন্দন ষোড়শ শতকের হন, তাহলে মাধব দাসও ষোড়শ শতকের মানুষ। তাঁর বৈষ্ণব বন্দনাটিও ষোড়শ শতকে রচিত বলে ধরে নিতে হয়। শ্রী হরিদাস দাস বলেছেন, “দেবকীনন্দন শ্রী পুরুষোত্তম দাসের শিষ্য। পুরুষোত্তম শ্রী গৌর-পার্ষদ সদাশিব কবিরাজের তনয়।” [শ্রী শ্রী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য। দ্বিতীয় খণ্ড/অষ্টম পরিচ্ছেদ। ১৪২২ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো। পৃ. ১৬]

বৈষ্ণব বন্দনার গুরুত্ব

১৯৩৬ খ্রি. ২৬ জুন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন উপাচার্য, সেদিন থেকে বাংলা ভাষায় পি.এইচডি.-র থিসিস পেপার লেখার অনুমতি দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতীয় গবেষণার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। প্রথম থিসিসটি জমা পড়ে বিমানবিহারী মজুমদারের। সেটির গ্রন্থরূপ হল ‘শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান’ (২১ ফাল্গুন ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থানুকূল্যে বিমানবিহারী বৃন্দাবন, দেনুড়, গুপ্তিপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, নবদ্বীপ, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, শান্তিপুর, হালিশহর, আড়িয়াদহ, বরানগর ও উড়িষয়ার গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচুর পুঁথি দেখেন ও তথ্যানুসন্ধান করেন। তাঁর অসাধারণ মেধা ও পরিশ্রমের ফল হল ‘শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান’। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতগ্রন্থসমূহের উপাদান অন্বেষণ করতে গিয়ে তিনি প্রথমেই ‘বৈষ্ণব বন্দনা’-গুলিকে আকর করেছেন। ‘শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান’ গ্রন্থটি শুরু হয়েছে বৈষ্ণব বন্দনাগুলির আলোচনা দিয়ে।[৩] বোঝা যায়, চৈতন্যজীবনী সাহিত্যচর্চায় বৈষ্ণব বন্দনাগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বিমানবিহারী দেবকীনন্দন, বৃন্দাবন দাস ও শ্রীজীব গোস্বামী রচিত বৈষ্ণব বন্দনাগুলি দেখেছেন ও আলোচনা করেছেন। কিন্তু মাধব দাসের পুঁথির সন্ধান তিনি পাননি। পেলে আমরা সমৃদ্ধ হতাম এবং আমাদের পুঁথি প্রকাশের কোন প্রয়োজন হত না। সেকারণে মাধব দাসের বৈষ্ণব বন্দনাটি বাঙালি পাঠকের কাছে আজও অপরিচিত থেকে গেছে। কিন্তু ১৩১৭ বঙ্গাব্দে শিবচন্দ্র শীল ছাপানো বইটির সংবাদ কেন বিমানবিহারী মজুমদারের অজানা থাকল, তা আশ্চর্যের!

বৃন্দাবন দাসের বৈষ্ণব বন্দনা পাওয়া গেছে।[৪] ইনি চৈতন্যভাগবত রচয়তা নন, অন্য কোন বৃন্দাবন দাস। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এই বৈষ্ণব বন্দনাটি ছেপেছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর বৈষ্ণব বন্দনা-র পুঁথি বরানগর পাঠবাড়িতে আছে। বিমানবিহারী এটি তাঁর উক্ত

গ্রন্থে ছাপিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, শ্রীজীব গোস্বামীর গ্রন্থে ২০৩ জন বৈষ্ণব পরিকরের নাম আছে। দেবকীনন্দনে আছে ২১৪ টি। আসলে নামের গরমিলে দেবকীনন্দনে ১২ টি নাম বেড়ে গেছে। আসলে উভয়ের গ্রন্থে ২১২ টি নামের মিল আছে। দু'জন অতিরিক্তকে দেবকীনন্দন বন্দনা করেছেন—শ্রীজীব গোস্বামী ও রঘুনাথ ভট্ট। বৃন্দাবন দাসের বৈষ্ণব বন্দনায় আছে ১৯১ টি নাম। শ্রীজীবে নেই এমন দুটি নাম বৃন্দাবন করেছেন—মনোরথপুরী ও শ্রীজীব গোস্বামী। অতএব, চৈতন্য-জীবন নিয়ে গবেষণায়, বৈষ্ণব-চরিতাভিধান রচনায় বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে গৃহীত হয়েছে।

এরপর আমরা দেখি মাধব দাস কাদের নাম করেছেন? চৈতন্য ও নিত্যানন্দকে নমস্কার জানিয়ে প্রথমেই তিনি নাম করেছেন বিশ্বরূপের—'এবে বন্দো বিশ্বরূপ।' তারপর শঙ্করারণ্য ও অন্যান্যদের। এখানে তালিকারূপে তুলে দেওয়া হল—

১। শ্রীচৈতন্য, ২। শ্রীনিত্যানন্দ, ৩। বিশ্বরূপভূপ, ৪। শঙ্করারণ্য, ৫। লক্ষ্মীপ্রিয়া, ৬। বিষ্ণুপ্রিয়া, ৭। গদাধর, ৮। পদ্মাবতী, ৯। হাড়াই পণ্ডিত, ১০। বলভদ্র, ১১। জাহ্নবা গোস্বামী, ১২। বসুধা, ১৩। বীরচন্দ্র, ১৪। বীরভদ্র, ১৫। মাধবপুরী, ১৬। অদ্বৈত, ১৭। সীতাদেবী, ১৮। অচ্যুতানন্দ, ১৯। শ্রীনিবাস, ২০। মাল্যানী দেবী, ২১। নারায়ণী দেবী, ২২। হরিদাস, ২৩। পরমানন্দ, ২৪। জগদানন্দ, ২৫। গোপীনাথ, ২৬। মুরারি গুপ্ত, ২৭। চন্দ্রশেখর, ২৮। আচার্য রতন, ২৯। গোবিন্দ চক্রবর্তী, ৩০। মুকুন্দ দত্ত, ৩১। বাসুদেব দত্ত, ৩২। দামোদর, ৩৩। পীতাম্বর, ৩৪। জগন্নাথ, ৩৫। শংকর, ৩৬। গঙ্গাদাস, ৩৭। সদাশিব বিদ্যানিধি, ৩৮। ভার্গব গোসাঞি, ৩৯। বুদ্ধিমন্ত খান, ৪০। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, ৪১। রামদাস কবিচন্দ্র, ৪২। জয়ানন্দ, ৪৩। আচার্য রত্নেশ্বর, ৪৪। বোড়কলা, ৪৫। বনমালী, ৪৬। হলায়ুধ বসুদেব, ৪৭। ঈশান দাস, ৪৮। গরুড়াই কাশীশ্বর, ৪৯। জগদীশ, ৫০। গঙ্গাদাস, ৫১। কৃষ্ণানন্দ, ৫২। মুকুন্দ, ৫৩। বল্লভাচার্য, ৫৪। সনাতন, ৫৫। দ্বিজ কাশীনাথ, ৫৬। আচার্য বনমালী, ৫৭। ঈশ্বরপুরী, ৫৮। কেশব ভারতী, ৫৯। রামচন্দ্র পুরী, ৬০। পরমানন্দ পুরী, ৬১। দামোদর পুরী, ৬২। নরসিংহানন্দন্যাসী, ৬৩। সত্যানন্দ, ৬৪ গোরুড় অবধূত, ৬৫। বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী, ৬৬। মাধবপুরী, ৬৭। বিশ্বেশ্বরানন্দ, ৬৮। কেশবপুরী, ৬৯। অনুভবানন্দ, ৭০। মনোরথপুরী, ৭১। রূপ, ৭২। সনাতন, ৭৩। জীব গোস্বামী, ৭৪। রঘুনাথ দাস, ৭৫। রাঘব গোসাঞি, ৭৬। গোপাল ভট্ট, ৭৭। রঘুনাথ ভট্ট, ৭৮। লোকনাথ গোসাঞি, ৭৯। প্রবোধানন্দ সরস্বতী, ৮০। কাশীশ্বর, ৮১। রাঘবানন্দ, ৮২। পুরন্দর, ৮৩। কাশীমিশ্র, ৮৪। বাণীনাথ পট্টনায়ক, ৮৫। রায় রামানন্দ, ৮৬। বক্রেশ্বর, ৮৭। সুবুদ্ধি মিশ্র, ৮৮। নৃসিংহানন্দ, ৮৯। গদাধর দাস, ৯০। সদাশিব বৈদ্য, ৯১। শিবানন্দ সেন, ৯২। মুকুন্দ দাস, ৯৩। রঘুনন্দন, ৯৪। নরহরি দাস, ৯৫। রঘুনন্দন, ৯৬। রঘুনাথ দাস, ৯৭। আচার্য পুরন্দর, ৯৮। কৃষ্ণদাস, ৯৯। পরমানন্দ পণ্ডিত, ১০০। আচার্য চন্দ্র, ১০১। গোবিন্দ, ১০২। মাধবানন্দ, ১০৩। বাসুদেব দাস, ১০৪। গদাধর দাস, ১০৫। ঠাকুর রামদাস (অভিরাম), ১০৬। শ্রীদাম গোপাল, ১০৭। অভিরাম গোসাঞি, ১০৮। বসুদেব দত্ত, ১০৯। গৌরীদাস পণ্ডিত, ১১০। পরমেশ্বর ঠাকুর, ১১১। গঙ্গাদাস শৃগাল, ১১২। পিপিলাই ঠাকুর, ১১৩। কমলাকর দাস, ১১৪। রসিক শেখর, ১১৫। উন্মাদ বিনোদ, ১১৬। কাল্যা কৃষ্ণদাস,

১১৭। সারেঙ্গা ঠাকুর, ১১৮। মকরধ্বজ কর, ১১৯। ভাগবতাচার্য, ১২০। মিশ্র কবিরাজ, ১২১। অনন্ত আচার্য, ১২২। মধু পণ্ডিত, ১২৩। গোবিন্দ আচার্য, ১২৪। সার্বভৌম ভট্টাচার্য, ১২৫। প্রতাপ রুদ্র, ১২৬। রঘুনাথ দাস দ্বিজ, ১২৭। বৈদ্য বিষ্ণুদাস, ১২৮। উৎকলিয়া কৃষ্ণদাস, ১২৯। কানাঞি খুঁটিয়া, ১৩০। জগন্নাথ দাস, ১৩১। বলরাম দাস, ১৩২। জগন্নাথ দাস, ১৩৩। উড়িয়া বলরামদাস, ১৩৪। গোবিন্দানন্দ, ১৩৫। কাশীশ্বর সিংহ, ১৩৬। শিবানন্দ সেন, ১৩৭। মাধব পট্টনায়ক, ১৩৮। হরি পট্টনায়ক, ১৩৯। মাইতি বলদেব, ১৪০। সুবুদ্ধি মিশ্র, ১৪১। শ্রীনাথ মিশ্র, ১৪২। তুলসী মিশ্র, ১৪৩। কাশীনাথ মাহিতি, ১৪৪। বসু রামানন্দ, ১৪৫। পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, ১৪৬। মধু পণ্ডিত, ১৪৭। দ্বিজ রামচন্দ্র, ১৪৮। পণ্ডিত শেখর, ১৪৯। যদু কবিচন্দ্র, ১৫০। ধনঞ্জয়পণ্ডিত, ১৫১। জগন্নাথ পণ্ডিত, ১৫২। শ্রীকৃষ্ণদাস, ১৫৩। আচার্য লক্ষ্মণ, ১৫৪। সূর্যদাস পণ্ডিত, ১৫৫। বংশীবদন, ১৫৬। মুরারী চৈতন্যদাস, ১৫৭। জগন্নাথ সেন, ১৫৮। গুপ্ত রামানন্দ, ১৫৯। বালকরাম, ১৬০। মুকুন্দ কবিচন্দ্র, ১৬১। বল্লভ, ১৬২। সেন কংসারি, ১৬৩। ভাস্কর, ১৬৪। বনমালী দাস, ১৬৫। সঙ্গীতাচার্য, ১৬৬। মহেশ পণ্ডিত, ১৬৭। নর্ত্তক পণ্ডিত, ১৬৮। জগদীশ পণ্ডিত, ১৬৯। বৃন্দাবন দাস, ১৭০। পরমানন্দ অবধূত, ১৭১। পণ্ডিত গঙ্গাদাস, ১৭২। যদুনাথ দাস, ১৭৩। রঘুনাথ দাস, ১৭৪। আশ্রম উপেন্দ্র, ১৭৫। বাসুদেব তীর্থ, ১৭৬। অনন্তপুরী, ১৭৭। হরিহরানন্দ, ১৭৮। মুকুন্দ কবিরাজ, ১৭৯। রাজীব পণ্ডিত, ১৮০। শিশু কৃষ্ণদাস, ১৮১। মাধব আচার্য, ১৮২। নৃসিংহ চৈতন্যদাস, ১৮৩। কৃষ্ণদাস, ১৮৪। বড় অকিঞ্চন, ১৮৫। শঙ্কর ঘোষ, ১৮৬। মাধবাচার্য, ১৮৭। গঙ্গা, ১৮৮। শিবানন্দ চক্রবর্তী, ১৮৯। পঁড়ারি নারায়ণ...

তৃতীয় পত্র খণ্ডিত হওয়ায় আরও কয়েকজনের নাম বাদ গেল। প্রাপ্ত খণ্ডিত পুঁথিটিতে দেখা গেল, মাধব দাস মোট ১৮৯ জন বৈষ্ণবকে বন্দনা করেছেন। দৈবকীনন্দন করেছেন ২১৪ জনের নাম, শ্রীজীব গোস্বামী ২০৩ জন, বৃন্দাবন দাসের বন্দনায় আছেন ১৯১ জন। এরপর দেখি মাধব দাসের অভিনবত্ব কোথায়?

মহিলাদের নাম সব কবি করেছেন। মাধব দাসও কয়েকজন বৈষ্ণব মহিলাকে বন্দনা করেছেন, যথা—লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, পদ্মাবতী, জাহ্নবীদেবী, বসুধাদেবী, সীতাদেবী, মাল্যানী, নারায়ণী দেবী ও গঙ্গা। এঁদের মধ্যে নিত্যানন্দ কন্যা, জিরাটবাসী গঙ্গার নাম দৈবকীনন্দনের বন্দনায় স্বতন্ত্রভাবে নেই। তিনি গঙ্গার স্বামী মাধবাচার্যের নাম করেছেন। বৃন্দাবন দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীর বন্দনায় গঙ্গার নাম আছে। পঁড়ারি নারায়ণ বা নারায়ণ পণ্ডা হলেন একজন ওড়িয়া ব্রাহ্মণ। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামীতে নামটি আছে—'চক্রবর্ত্তিশিবানন্দং শ্রীনারায়ণসংজ্ঞকম্।' মাধব দাস গরুড়াই কাশীশ্বরের নাম করেছেন। ইনি ব্রাহ্মণ, আকনা-নবদ্বীপবাসী ছিলেন। মাল্যানী দেবী হলেন অন্যদের কথিত মালিনী দেবী। ইনি শ্রীনিবাস পত্নী। বক্রেশ্বর পণ্ডিত হলেন আকনা-হুগলীবাসী ব্রাহ্মণ। বসুধা (বারুণী) হলেন নিত্যানন্দ পত্নী। সারঙ্গদাস একজন ব্রাহ্মণ, মেদিনীপুরের গড়বেতায় এঁর সমাধি মন্দির আছে। দেখা যাচ্ছে যে, শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর সংস্কৃত বৈষ্ণব বন্দনায়

যতজনের নাম করেছেন মাধব দাসে সেগুলি সবই প্রায় আছে। অতএব, মাধবের এই বন্দনা অপ্রামাণিক নয়।

উপসংহার

বাংলার বৈষ্ণবধর্ম ও চৈতন্যজীবন নিয়ে গবেষণা করতে হলে বৈষ্ণব বন্দনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দেবকীনন্দন, বৃন্দাবন দাস, মাধব দাস স্বতন্ত্র বৈষ্ণব বন্দনা লিখেছেন। দেবকীনন্দনের মতো কেউ কেউ বৈষ্ণব-অভিধান রচনা করেছেন। নরোত্তম দাস, জয়কৃষ্ণ দাস, যদুনন্দনের মতো কয়েকজন কবি সংক্ষিপ্তভাবে বৈষ্ণব বন্দনা করেছেন তাঁদের কাব্য মধ্যে। এঁরা জাত-বৈষ্ণব নন, বিষ্ণুর ভক্ত-উপাসক। এঁদের জীবনের মূল মন্ত্র চৈতন্যের বাণীতেই ব্যক্ত হয়েছে—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ।।

আধুনিককালেও বৈষ্ণবপরিকরদের নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন ‘গৌরাঙ্গ পরিজন’। একশ আটজন বৈষ্ণবের কথা এতে অমৃতসমান হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সংস্করণ ১৯৯১, পৃ. ৩০৭
২. শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, বিমানবিহারী মজুমদার, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ২
৩. তদেব। পৃ. ২—১২
৪. পুঁথি।

কৃতজ্ঞতা : কুহেলী দত্ত, রামজীবনপুর, ঘাটাল, মেদিনীপুর।

মূল পুঁথির পাঠ
বৈষ্ণব বন্দনা : মাধব দাস
সংগ্রহ ও সম্পাদনা : অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

"৭শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ"
বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়োঃ।
সর্ব্বাবতার সংভক্ত সর্ব্বভক্ত জনাশ্রয়োঃ।।"
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র বলভদ্র নিত্যানন্দ
গাওনারে ভাই ভরিয়া বদন।
সুখে জন্ম গোঙাইবে বৈষ্ণবের সঙ্গ পাবে
না হবে শমন দরশন।।
কলিকালে সর্ব্বরূপে দংশিল সকল লোকে
বিষজ্বালায় জগত ঢলিল।
গৌরাঙ্গ গুণের ধাম জপকৃষ্ণ রামনাম
মহামন্ত্রের বলে জিয়াইল।।
বিশেষে বৈষ্ণবগণ ত্রিভুবন পাবনং
পতিত জীবিত জীব দেখি।
করুণা বানে হিয়া মন্ত্র উপদেশ দিয়া
কৃষ্ণসুখে করাইল সুখি।।
শুনরে পামর মন মিছা মায়া পরিশ্রম
ধর২ বৈষ্ণবের পায়।
বৈষ্ণবের কৃপা বলে গরাসিতে নারে কালে
অনায়াসে ভবতরি জায়।।
বৈষ্ণবের সঙ্গে চল বৈষ্ণবের অঙ্গ হের
বৈষ্ণবের বাক্য শুন কানে।
বিচারিয়া দেখ মনে কৃষ্ণের বৈষ্ণব বিনে
হরিভক্তি দিতে নারি আনে।।
বৈষ্ণবের মহত্ত্ব যত লোকে বেদে অবিদিত
দেবগণে তত্ত্ব[১] নাহি পায়।
মুই সে হীনের হীন পতঙ্গ হইতে ক্ষীণ[২]
ক্ষুদ্র[৩] মুখে কি বলিব তায়।।
তথাপি যে হেন শক্তি [১] অনুভবে দিবারাতি
নিতি২ উপজে ভাবনা।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সঙ্গে যত ভক্তবৃন্দ
তাহা কিছু ফিরিব বন্দিয়া।
আপন অন্তর কহি ত্ররসের যোগ্য নহি
তাহাতে লুব্ধ ভেল মন।
অঙ্গি মুই সব দোষে না করিহ উপহাসে
ভাব যাহি প্রভু জনার্দন।।
সহযে মুগধ প্রানি পূর্ব্বাপর নাহি জানি
ক্রমে সে গনন হে সভে।
অতএব পরিহার সর্ব্বভক্তে নমস্কার
অপরাধ কেহো না লইবে।।
অবনী লোটায়া কায় শচী জগন্নাথ পায়
প্রথমে করিলাম পরনাম।
এবে বন্দে বিশ্বরূপ ঠাকুর সন্ন্যাসী ভূপ
শঙ্কর অরুন্য ধন্য নাম।
প্রেমানন্দে কর জুড়ি বন্দো গৌরচন্দ্র হরি
ভুবনমঙ্গলে অবতার।
যুগধর্ম্ম পালিবারে জন্মিলা নদীয়াপুরে
সংকীর্ত্তন করিতে প্রচার।।
পরম সংভ্রম হয়্যা বন্দো লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া
তবে বন্দো দেব গদাধর।
যত বৈষ্ণব আছয় তত প্রিয় কেহো নয়
দ্বিতীয় চৈতন্য কলেবর।
বন্দো পদ্মাবতী মাতা হাড়াই পণ্ডিত পিতা
নিত্যানন্দ হেন পুত্র যার।
বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ সকল শ্রানন্দ স্কন্ধ[৪]
যেহো কৈল সকল নিস্তার।।[২ক]
বারুনি জাহার নাম অনঙ্গ মঞ্জরি ধাম
তছু পদে করি যে প্রনাম।
অনঙ্গ মঞ্জরী যেহো জাহ্নবা গোসাঞি সেহো
বারুনি যাহার পূর্বনাম।।
সানন্দে পড়িয়া ভূমি বন্দো বসু জাহ্নবি
বীরচন্দ্র জাহার নন্দন।
বন্দিব ঠাকুর বীর বীরভদ্র গভীর ধীর
যার গুনে ভরিল ভুবন।
ভালিরে গৌরাঙ্গ চান্দ পাতিল প্রেমের ফান্দ

বান্ধিল জীবের মনখানি।
হরিনাম প্রেমধনে ধন্য কৈল জগজনে
মরি জাও তোমার নিছনি।।
বন্দিব শ্রী মাধবপুরী পৃথিবীতে[৫] অবতরি
বিষ্ণুভক্তি যে করিল ব্যক্ত।
পরাচিহ্ন আদিগুরু বাঞ্ছা কল্পতরু
জেহোঁ মহাপ্রভুর আদিভক্ত।।
বন্দো শান্তিপুর পতি শ্রী অদ্বৈত মহামতি
সদাশিব সম প্রেম যার।
তাঁহার তপের ফলে আনি মহামণ্ডলে
পাতিল চৈতন্য অবতার।।
কৈলাসের আদ্যাশক্তি বন্দো মাতা সীতা দেবী
ভক্তি শক্তি সম তেজ যার।
তাঁহার প্রতিরূপ হৈতে অবতীর্ণ জগন্নাথে
করিল প্রসাদ প্রচার।।
সীতার চরণ ধূলি বন্দিব মস্তকে তুলি
আপনাকে মানিয়া শ্লাঘ্য [২]
তুচ্ছ প্রিয় সুত বন্দৌ শ্রী যুত অচ্যুতানন্দ
শিষ্যকালে জাহার বৈরাগ্য।।
পুরিয়া মনের আশ বন্দিব শ্রী শ্রী নিবাস
অভেদ নারদ মুনিবর।
বন্দো দেবী মাল্যানিরে মা বলি ডাকিল যারে
নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।।
বন্দো নারায়নী দেবী চৈতন্যচরণ সেবী
অবশেষ যে জন পাইল।
বন্দিব শ্রী হরিদাস স্বয়ং ব্রহ্মা পরকাশ
উচ্চে হরিনাম যে বলিল।।
বন্দিব পরমানন্দ পণ্ডিত জগদানন্দ
মূর্ত্তিভেদ যেন সরস্বতী।
ঠাকুর শ্রী গোপীনাথ পদে কৈল প্রণিপাত
প্রভুরে যে কৈল বহুস্তুতি।।
বন্দিব মুরারী গুপ্ত যেন সেই হনুমন্ত
রঘুনাথ যাঁর প্রাণধন।
শ্রী চন্দ্রশেখর বন্দো সুশীতল সমচন্দ্র
তবে বন্দো আচার্য্য রতন।।
গোবিন্দ চক্রবর্তী করিল প্রভুর স্তুতি
গৌর পদে যাহার ধিয়ান।
বন্দিব মুকুন্দ দত্ত কৃষ্ণগুণে সদা মত্ত
নাহি ভেদাভেদ জ্ঞান।।
বন্দো বাসুদেব দত্ত তাহার নিগূঢ় অর্থ
সহস্র মুখে কহা নাহি যায়।

যাহার ....
....
দামোদর পীতাম্বর জগন্নাথ শঙ্কর
নারায়ণ এই .... [৩ক]
নবদ্বীপ মাঝে বাস বন্দো গুরু গঙ্গাদাস
যার স্থানে প্রভুর অধ্যয়ন।
দশোনেতে ধরি হন বিষ্ণু দেব সুদর্শন
দৈনভাবে করিল বন্ধন।।
সদাশিব বিদ্যানিধি ভার্গব নিধি
বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রেমধনের অধিকারী
বন্দো এই ছয় মহাশয়।।
রামদাস কবিচন্দ্র লেখ কবি জয়ানন্দ
বন্দিল আচার্য্য রত্নেশ্বরে।
বন্দিব সিরোদার গৌরাঙ্গ গ্রাহক যার
বোড় কলা ফলের পসারে।।
বন্দে কর পুটাঞ্জলি পুত্র সহ বনমালী
ভক্তির ভিক্ষুক দুইজন।
হলাউধ বসুদেবে বন্দনা করিব তবে
চৈতন্য একান্ত যার মন।।
আইল সে কৃপা পাত্র বন্দো ঈশান দাস সত্য
আই যারে করিল [৩] পালন।
গরুড়াই কাশীশ্বরে বন্দিব তাহার পরে
জগদীসের বন্দিব চরণ।।
গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ বন্দো আর মুকুন্দ
বিশেষে পরম সমাদরে।
বন্দিব বল্লভাচার্য্য সার্থক যাহার কার্য্য
লক্ষী কন্যা যে দিল প্রভুরে।।
বন্দিব পরম যত্নে পণ্ডিত শ্রীসনাতনে
বিষ্ণুপ্রিয়া যাঁহার দুহিতা।
কোন তপস্যার ফলে না জানি কি পুণ্যবলে
মহাপ্রভু হইল জামাতা।।
জুড়িঞা যুগল হাথ বন্দো দ্বিজ কাশীনাথ
বন্দিব আচার্য্য বনমালী।
প্রভু সঙ্গে লক্ষীদেবী শুভ বিবাহের লাগি
যে আসি করিল ঘটকালি।।
বন্দিব ঈশ্বরপুরী প্রভু যারে গুরু করি
আপনাকে ধন্য করিয়াছি।।
কেশব ভারতী প্রতি বন্দো নর্ম্ম হঞা অতি
যে করিল প্রভুরে সন্ন্যাসী।।
বন্দো রামচন্দ্র পুরী যাহার বিক্রম হেরি

নিরন্তর করিল প্রভুবাস।
শ্রীপুরী পরমানন্দ বন্দো তছু পদ দ্বন্দ্ব
যারে বলি ঠাকুর উদ্ধার।।
বন্দো দামোদর পুরী যার বশ গৌরহরি
সত্যভামা সম যার রীতি।
নরসিংহানন্দন্যাসী সংকীর্ত্তন সুবিলাসী
বন্দো সত্যানন্দ মহামতি।।
বন্দো গোরুড় অবধূত যার প্রেম অদ্ভুত
চমৎকার দেখিতে শুনিতে।*[৪ক]
বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী বন্দিব মাধবপুরী
যে করিল লোক নিস্তারিতে।।
বন্দো বিশ্বেশ্বরানন্দ যার প্রাণ গৌরচন্দ্র
ভবে বন্দো শ্রী কেশবপুরী।
বন্দো অনুভবানন্দ ভাবচিত্ত চিতানন্দ
বন্দিনাম মনোরথপুরী।।
বন্দো রূপসনাতন বসতি শ্রী বৃন্দাবন
পরম রিক্ত উদাসীন।
রাজ্যপদ পরিহরি ভিক্ষুকের বেশধরি
যেহো লইল বারঙ্গকপীন।।
বন্দো জীব গোস্বামীরে সকল বৈষ্ণব যারে
জিজ্ঞাসিল কোন যোগসার।
বিচারিয়া সব শাস্ত্র কহিলেন এইমাত্র
ভক্তিযোগ বিনা নাহি আর।।
শ্রীরাধা কুণ্ডে বাস বন্দো রঘুনাথ দাস
যেজন চৈতন্য মর্ম্ম জানে।
রাঘব গোসাঞি তবে বন্দো বড় ভক্তিভাবে
যাহার বিলাস গৌরকুলে।।
বন্দিব গোপাল ভট্ট সনাতন নিকট
বসতি কেবল একস্থানে।
অন্যকথা নাহি মুখে দিবস রজনী সুখে
বঞ্চিলেন গোবিন্দের নামে।।
রঘুনাথ ভট্ট বন্দো হইয়া পরমানন্দ
অধ্যাপক যেহোঁ ভাগবতে।
রাধাকৃষ্ণ নামগুণে সদা বহে নিগমনে
বন্দো সেই গোসাঞি লোকনাথে।।[৪]
বন্দো বহুবিধ ভক্তি প্রবোধানন্দ সরস্বতী
পরমতত্ত্ব কৃষ্ণ প্রেমধাম।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত পুস্তক তাহার কৃত
সে পুঁথি ভক্তিধন প্রাণ।।
বন্দো হরষিত অতি কাশীশ্বর মহামতি
ক্ষ্যাত ভক্ত যারে বলে সভে।

বন্দো শুদ্ধ সরস্বতী গৌর পদে দৃঢ়ভক্তি
পশু পক্ষ বন্দি যার ভাবে।।
বন্দিব রাঘবানন্দ যার ঘরে নিত্যানন্দ
অনুভব করিল বিদিত।
বাড়ির জাম্বির গাছে কদম্ব ফুল ফুটাঞাছে
সর্ব্বভক্ত দেখিয়া বিস্মিত।।
বন্দো অতি মনোহর ঠাকুর শ্রী পুরন্দর
যেন সেই অঙ্গদ ঠাকুর।
এক বিপ্র লয়্যা তারে আদর করিল ঘরে
গোষ্ঠী সহিত দেখিলা লঙ্গুড়।।
বন্দো কাশী মিশ্রবর উৎকলেতে যার ঘর
যাহার আশ্রমে গৌর রায়।
পট্টনায়ক কালীনাথ যার প্রাণ জগন্নাথ
বন্দনা করিব তার পায়।।
বন্দো রায় রামানন্দ যার সনে গৌরচন্দ্র
বিচারিল ভক্তির লক্ষণ।
বন্দিব শ্রী বক্রেশ্বর যার নৃত্যে বিশ্বম্ভর
মজিয়া করিল কীর্ত্তন।।
বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র শ্রীনৃসিংহানন্দ আদি
মনে২ বন্দিল জাঙ্গাল। [৫ক]
নদিয়া নাগর হৈতে গৌড় দেশ পর্যন্ত্য তাথে
সুখে প্রভু গেলা কুতূহলে।।
বন্দো গদাধর দাস অপরূপ সুবিলাশ
প্রেমরসময় তনুখানি।
বন্দো সদাশিব বৈদ্য যাহার পরশে সদ্য
পাষাণে গলিয়া হয় পানি।।
বন্দো সেন শিবানন্দ চৈতন্য পদারবৃন্দ
বিনে যার নাহিক ভাবন।
শ্রী বৈদ্যকুলেতে বাস বন্দিব মুকুন্দ দাস
যার পুত্র শ্রী রঘুনন্দন।।
মুকুন্দ দাসের ভক্তি অকথ্য কৃষ্ণের শক্তি
অদ্যাবধি বিদিত সংসারে।
মউরের পাখা দেখি চঞ্চল হইল আখি
বিভোলে পড়িলা প্রেম ডোরে।
বন্দিব শ্রী নরহরি দাস ধন্য বলিহারি
চৈতন্য বিলাস যার ঘটে।
বন্দিব শ্রীরঘুনন্দন মুরতি সম মদন
জগত মোহিত যার নাটে।।
বন্দো রঘুনাথ দাসে প্রেমসুখে যে বিলসে
পিরিতের ফান্দে মন বান্দে।
বন্দো আচার্য্য পুরন্দর কৃষ্ণ প্রেম নিরন্তর

ফুকরি২ সদা কান্দে।।
ঠাকুর শ্রী কৃষ্ণদাস আকাই হাটেতে বাস
শান্ত দান্ত শুচি অকিঞ্চন।
মহাপ্রভুর সতীর্থ পরমানন্দ পণ্ডিত
ভক্তিভাবে [৫] করিলাম বন্দন।।
বন্দিব শ্রী শিবানন্দ পণ্ডিত পরমানন্দ
যার পাট সদা ভাগবত।
বন্দিব আচার্য্যচন্দ্র যে জানে প্রেমের ফন্দ
সর্ব্বকথা জগতে বিদিত।।
গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব ঘোষ বন্দো
তিন ভাই গুণের সাগর।
শুনিয়া তাহার গান ধরিতে না পারে প্রাণ
সর্ব্বগুণে প্রভু বিশ্বম্ভর।।
গদাধর দাস বন্দো বাসুদেবের পদ দ্বন্দ্ব
এই দুই বন্দিব সাবধানে।
করবি মঞ্জরি কলি আছিলা কর্ণেতে পরি
পদ্ম গন্ধ হৈল ভাষণে।।
অদ্বৈত শ্রী গৌরচন্দ্র ধন্য২ নিত্যানন্দ
ধন্য২ ভকত মণ্ডল।
ধন্য নাম ধন্য গুণ ধন্য প্রেম সকীর্ত্তন
ধন্য কলি যুগেতে সকল।।
বন্দো ভক্ত অগ্রগণ্য ঠাকুর রামদাস
কলিযুগে খ্যাতি দেখ অদ্ভুত প্রকাশ।।

ষোল সাঙ্গেরে কাষ্ঠখানা পড়িয়াছিল।
অবহেলে তুলি বাঁশি করিয়া নিল।।
দুভঙ্গ হইয়া পুন বাজাল্য মুরুলি।
বাজিল বিনোদ বাদ্য শুনি কুতূহলি।।
শ্রীদাম গোপাল বন্দো অভিরাম গোসাঞিং।
দ্বিতীয় চৈতন্য মহিমার অন্ত নাই।।
ব্রজের বসুদেব বন্দো ঠাকুর সুন্দর।
অগ্নিসম তেজ যার[৫ক] অতি মনোহর।।
তাঁর দাসে ধরিয়া বনের ব্যাঘ্র আনে।
কোলা দিয়া কৃষ্ণ নাম শুনায় শ্রবণে।।
বন্দিব শ্রীগৌরদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
নিত্যানন্দের কৃপাপাত্র মহিমা প্রচুর।।
প্রভুর আদেশ শিরে ধরি গিয়া শান্তিপুর।
শ্রীবিগ্রহ করি সেবা করিল প্রচুর।।
যারে বলি গোকুলের সুবল গোপাল।
সুজনের স্মরণ দাতা দুর্জনের কাল।।
তার কৃষ্ণ ভক্তি শক্তি বিদিত জগতে।
পাষণ্ড দলন নাম হৈল যাহ হৈতে।।
অম্বিকাতে লোক মধ্যে তাঁর অবস্থিতি।
যার ঘরে নিত্যানন্দ চৈতন্য মুরতি।।
প্রভু বিদ্যমানে সেহ মূর্ত্তির প্রকাশ।
সে মূর্ত্তি দেখিলে সর্ব্ব কর্ম্ম বন্ধ নাশ।।
দিব্য গন্ধ পুষ্প মাল্য বসন অলঙ্কারে।
যে করিলা বিভূষিত নিতাই চান্দেরে।।
পরমেশ্বর ঠাকুর বন্দ জোড় হাথে।
যে করিল নিজ ব্যক্ত কীর্তনে নাচিতে।।
গঙ্গাদাস শৃগাল ডাকি একে একে।
হরিনাম বোলাইল সকলের মুখে।। [৬]
পিপিলাই ঠাকুর বন্দো বাল্য রসে ভোলা।
বালকের প্রায় তাঁর সব লীলা খেলা।।
তবে বন্দো ঠাকুর কমলাকর দাস।
কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে নাচে পরম উল্লাস।।
পুরুষোত্তম তীর্থ বন্দো রসিক শেখর।
কৃষ্ণ প্রেম রসে মত্ত আনন্দে সাগর।।
উন্মাদি বিনোদ বন্দো কাল্যা কৃষ্ণদাস।
প্রেমাবিভোল হঞা না সম্বরে বাস।।
সারেঙ্গ ঠাকুর বন্দো জুড়ি দুই কর।
গুধড়িতে ছিল যার কৃষ্ণ অজগর।।
মকরধ্বজ কর বন্দো গুণের নিধান।
প্রভুস্থানে কৃষ্ণগুণ সদা যার গান।।
ভাগবত আচার্য্য বন্দো মিশ্রি কবিরাজ।
অনন্ত আচার্য্য বন্দো নবদ্বীপ মাঝ।।
তারপর বন্দো মধুপণ্ডিত চরণ।
বৈষ্ণব পণ্ডিত যারে বলে সর্ব্বজন।।
গোবিন্দ আচার্য্য পদ করিল বন্দনা।
রাধা সহিত কৃষ্ণরস করিল রচনা।।
বন্দো সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য মহামতি।
যাহারে বলিয়ে দেবগুরু বৃহস্পতি।।
নৃপতি প্রতাপরুদ্র করিলাআম বন্দন।
যে পাইল মহাপ্রভুর ষড়ভুজ দর্শন।।
রঘুনাথ দাস [৭ক] দ্বিজের চরণ বন্দিয়া।
বৈদ্য বিষ্ণুদাস বন্দো কৃষ্ণদাস উৎকলিয়া।।
কানাঞি খুঁটায়া বন্দো প্রেমরস ধার।
প্রকৃতি স্বভাব তার যেন গোপীকার।।
তার পুত্র জগন্নাথ দাস বলরাম।
তাহার মহত্ত্বের কিবা করিব উপাম।।
জগন্নাথ দাস বন্দো গানের সে গুরু।
যার গানে অরুণ্যে ঝুরে লতা তরু।।

বন্দো বলরাম দাস উড়িয়া বৈষ্ণবে।
জগন্নাথ বলরাম বন্দি যার ভাবে।।
শ্রীগোবিন্দানন্দ মোর প্রভু যে ঠাকুর।
নিতাই চৈতন্য লাগি সে তো বন্দিল প্রচুর।।
বন্দো কাশীশ্বর সিংহ সেন শিবানন্দ।
চন্দনেশ্বর বন্দো করিয়া আনন্দ।।
বন্দনা করিব পট্টনায়ক মাধব।
হরিপট্ট বন্দিব মাহিতি বলদেব।।
সুবুদ্ধি মিশ্রি বন্দি নির্বুদ্ধিতার বুদ্ধিদাতা।
শ্রীনাথ মিশ্রি বন্দি তিহোঁ কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যক্তা।।
তলসিমিশ্রি বন্দনা করিব সাবধানে।
কাশীনাথ মাহিতি বন্দিব সাবধানে।।
বসুবংশে তিলক বন্দিব রামানন্দে।
যার গোষ্ঠী ভ্রমরা গৌরাঙ্গ পদদ্বন্দ্বে।।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী শ্রী মধু পণ্ডিত।
বন্দো দুই মহাশয় চৈতন্যের ভৃত্য।।
দ্বিজ রামচন্দ্র বন্দো পণ্ডিত শেখর।
যদু কবিচন্দ্র [৭] বন্দো সুখের সাগর।।
পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় করিলাম বন্দনা।
প্রসিদ্ধ বৈরাগ্য যার সংসারে ঘোষণা।।
লক্ষ্মীর সম ধন প্রভুরে সমর্প্পিয়া।
ভাণ্ড হাথে করি গেলা কোপীন পরিয়া।।
পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ করিলাম বন্দন।
শ্রীকৃষ্ণদাস বন্দো আচার্য্য লক্ষ্মণ।।
সূর্য্যদাস পণ্ডিতের বন্দো পদদ্বন্দ্ব।
যাহার জামাতা হৈল প্রভু নিত্যানন্দ।।
বন্দিব ঠাকুর বংশীবদন চরিত।
পূর্ব্বে বিহারিলা তিহোঁ কৃষ্ণের সহিত।।
মুরারি চৈতন্যদাস বন্দিব যতনে।
যার খেল লীলা সদা কালসর্প্প সনে।।
সেন জগন্নাথ বন্দো গুপ্ত রামানন্দ।
বন্দিব বালকরাম মুকুন্দ কবিচন্দ্র।।
বন্দিব বল্লভ সেন কংসারি।
বন্দিব ভাস্কর বিশ্বকর্ম্মা অবতারি।।
বনমালি দাস বন্দো সঙ্গীত আচার্য্য।
নিত্যানন্দ সেবা বিনু নাহি অন্য কার্য্য।।
বন্দো কৃষ্ণ উন্মাদি মহেশ পণ্ডিত।
নর্ত্তক পণ্ডিত বন্দো জগদীশ পণ্ডিত।।
নারায়ণীর পুত্র বন্দো বৃন্দাবন দাস।
সর্ব্বভক্ত যাহারে বলেন বেদব্যাস।।
শ্রীচৈতন্যভাগবত যাহার গ্রন্থন।
যে গ্রন্থে মহিমা কৈল এ ত্রিভুবন।।
যে জন পিরিতি ফান্দে [৮ক] নিতাইচান্দেরে।
বন্দি করি রাখিয়াছিলেন নিজ ঘরে।।
পণ্ডিত ঠাকুর তাহা বুকে দিয়া তালি।
কঁচা ধরি লঞা গেলা মোর প্রভু বলি।।
নিত্যানন্দ বিরহে শ্রীবৃন্দাবন দাস।
বাউলের প্রায় গোঙাইল মাঘ মাস।।
পুনরুপি নিত্যানন্দ তার ঘরে গেলা।
নিত্যানন্দ পাঞা মনে সুস্থির হৈলা।।
বন্দিব পরমানন্দ অবধূত বর।
প্রেমরসে পরিপূর্ণ যার কলেবর।।
পণ্ডিত গঙ্গাদাস বন্দো অনাদি নিবাসি।
যদুনাথ দাস বন্দো মধুর বিলাসি।।
পুরুষোত্তম তীর্থ বন্দো তীর্থ শ্রীরাম।
রঘুনাথ দাস বন্দো পুরি মনস্কাম।।
আশ্রম উপেন্দ্র বন্দো হরি হরানন্দ।
তীর্থ বাসুদেব বন্দো পুরি শ্রী অনন্ত।।
মধুর মুরতি বন্দো মুকুন্দ কবিরাজ।
রাজীব পণ্ডিত বন্দো পণ্ডিত ত্রিসমাজ।।
শিশু কৃষ্ণদাস বন্দো গোপ শিশুজনু।
নিত্যানন্দ স্বহস্তে পালিল তার তনু।।
তবে ত বন্দনা কৈল মাধব আচার্য্য।
কৃষ্ণগুণ বর্ন্নন সদা আর নাহি কার্য্য।।
যে কৃষ্ণমঙ্গলে কৈল ভাগবত মতে।
সে গীত বিদিত হৈল সকল জগতে।।
নৃসিংহ চৈতন্যদাস আর কৃষ্ণদাস।
বন্দো দুই মহাশয় পিরিতে আভাস।।
বড় অকিঞ্চন [৮] বন্দো শ্রী শঙ্কর ঘোষ।
যে কৈল ডম্বুর বাদ্যে প্রভুরে সন্তোষ।।
মাধবাচার্য্যে বন্দো দ্বিজ কুলমণি।
নিত্যানন্দ সুতা গঙ্গা তাহার গৃহিণী।।
বন্দনা করিব গঙ্গা দেবীর চরণ।
শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী পড়ারি নারায়ণ।।
এই হৈতে হৈল কিছু বৈষ্ণব বন্দন।
অনন্ত চৈতন্য ভক্ত না যায় গণন।।
আর কত শত অর্ব্বুদ আছ এ বৈষ্ণব।
ত্রিভুবন জুড়িয়া বৈসে যত সব।।
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ভূমিতে।
অনন্ত বৈষ্ণব অবতীর্ণ অবনীতে।।
কলিযুগে বিশেষে চৈতন্য অবতারে।
চৈতন্যের কৃপায় সব বৈষ্ণব ঘরে ঘরে।।

অতএব শ্রী বৈষ্ণব অসংখ্য গণন।
স্বচ্ছন্দ বিহরে সভে পতিত পাবন।।
সভাকার ঠাকুর চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দুই মহাপ্রভুর এ সকল ভক্তবৃন্দ।।
বৈষ্ণব গোসাঞিঃ ত্রিভুবনের পূজিত।
নিশ্চয় কৃষ্ণের তনু বেদে অবিদিত।।
কেবা জানিবারে পারে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
শ্রীভাগবতে কহেন বৈষ্ণবের মহত্ত্ব।।
এ হেন বৈষ্ণব গণের চরণ বন্দন।
পড়িলে শুনিতে হয় দুঃখ বিমোচন।।
পাপে মুক্ত হঞা হয় পুণ্য কলেবর।
পঠনে শ্রবণে হয় প্রসন্ন অন্তর।।
বদনে স্ফূরায় তার কৃষ্ণ হেন নাম।
পরিপূর্ণ হয় তার যেবা মনস্কাম।।[৯ক]

কণ্ঠে বিলসে তার দেবী সরস্বতী।
কমলা করেন আসি গৃহেতে বসতি।।
যথা তথা যার পরম ভাবনা হিয়ায়।
সর্ব্ব শমনে জয় যুক্ত হইবে জয়।।
ব্যাধি জ্বর জ্বালাতার দেহে না পরশে।
আরুগ্ন হইয়া থাকে মনের সন্তোষে।।
নির্ম্মল হইয়া ভক্তি হয় সুনিশ্চিত।
বৈষ্ণব বন্দনা মাধব দাসের চরিত।।
"জদক্ষরং পরিদ্রষ্টা মাত্রাহিনঞ্চ জদ্ভবেত।
পুর্ন্নস্তবতৎ সর্ব্বং য়ৎ প্রসাদতব্রজেশ্বর।। ইতি
শ্রী বৈষ্ণব বন্দনা সমাপ্ত।। পঠনিয়ং।
পুস্তকমিদং শ্রী স্রিনিবাস কর্ম্মকার সাঃ
সালবাদ্যা। [৯]

পুঁথিতে যা পাঠ আছে—
১. তত্ত ২. খিন ৩. খুদ্র ৪. স্কন্দ ৫. প্রীথিবি ৬. অধ্যায়ন ৭. অর্থটি বোঝা যাচ্ছে না! ৮. খ্যাত ৯. মস্কাম ১০. সছন্দ

শব্দার্থ

ত্রিসমাঝ–তিনসমাজ
বোড়–বড়
গোঙাইবে–কাটাইবে
শমন–যমন
জিয়াইল–জীবিত হইল
পামর–পাপী মুঞিঃ–আমি
ভেল–হল
অঙ্গী–অংশীভূত
মুগধ–মুগ্ধ
সভে–সবে
ভূপ–শ্রেষ্ঠ, মহান

নিছনি–বালাই
মরিজাঙ–মরে যাক
প্রণিপাত–প্রণাম
তছু–তাঁর
ক্ষ্যাত–বিখ্যাত
মুই–আমি
যেহোঁ–যাঁর
বন্দোঁ–বন্দনা করি
পঁড়ারি–পণ্ডা
মাহিতি–মাইতি

ক্রো ড় প ত্র

স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা ও পাশ্চাত্য অনুষঙ্গ

নি-বদিতা -থ-ক সমর্পিতা : অতুলনীয় জীবনান্তর

স্বপনকুমার মণ্ডল

-দশ জয় করার -চ-য় -দশবাসীর মন জয় করা শুধু কঠিন নয়, অসাধ্যপ্রায়। কেননা -সই ম-নর অধরা মাধুরীর পরশপাথরটির হদিশ -মলা-না দায়। গান্ধীজির ম-তা মহাত্মা তথা জাতির জনক সম্প-র্ক লুইস ফিসা-রর সক-লর প্রিয় না-হওয়ার চেতনাবনি প্রসঙ্গে ঈশ্বরতুল্য মহামানবদের সর্বজনীন আবেদনে অভাব-বা-ধর কথাও উ-ঠ এ-স-ছ। -সখা-ন সক-লর আপনজন হওয়ার আ-বদ-ন আপনা-তই হাত গুটিয়ে আসে, জিহ্বা শুকি-য় যায়। আত্মিক সং-যা-গ হৃদ-য়র প্রসারতা-ক ভাব-ভাষায় -ম-লধর-লই হ-ব না, তা-ক বাস্ত-বর অকৃত্রিমতায় আবেদনক্ষম করে তুলতে হবে। হৃদ-য়র -সই আত্মিকতার ভাব-ভাষার সঙ্গে বাস্তবের যোগসূত্রের অভাববোধেই সেই আ-বদন অচি-রই ব্যর্থ হ-ত বাধ্য হয়। অথচ তা -য সম্ভব এবং শুধু সম্ভবই নয়, অত্যন্ত -বশিরক-ম সফলকাম, তারও নিদর্শন বর্তমান। স্বামী বি-বকান-ন্দর ভারতবন্দিত শিষ্যা তথা স্ব-দশ-ক তাঁর -শ্রষ্ঠ উপহা-র নন্দিত নন্দিনী ভগিনী নি-বদিতা (২৮.১০.১৮৬৭-১৩.১০.১৯১১) তার বিরলপ্রায় প্রতিভূ। প্রখর আত্মস-চতন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নি-বদিতার -সই অসাধারণ অনন্যার কথাই তাঁর ''ভগিনী নি-বদিতা'য় তু-লধ-র-ছন। তাঁর কথায় :

‘‘বস্তুত তিনি ছি-লন -লাকমাতা। -য মাতৃভাব পরিবা-রর বাহি-রর একটি সমগ্র -দ-শর উপ-র আপনা-ক ব্যাপ্ত করি-ত পা-র তাহার মূর্তি -তা ইতিপূ-র্ব আমরা -দখি নাই। এ সম্ব-ন্ধ পুরু-ষর -য কর্তব্য-বাধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমনীর -য পরিপূর্ণ মমত্ব-বাধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলি-তন ঘয়ক্ষ সনষসরন তখন তাহার ম-ধ্য -য একান্ত আত্মীয়তার সুরটির লাগিত, আমা-দর কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। ভগিনী নি-বদিতা -দ-শর মানুষ-ক -যমন সত্য করিয়া ভা-লাবাসি-তন, তাহা -য -দখিয়া-ছ, -স নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়া-ছ -য, -দ-শর -লাক-ক আমরা সময় দিই, অর্থ দিই, এমনকি জীবনও দিই, কিন্তু তাহা-ক হৃদয় দি-ত পারি নাই---তাহা-ক -তমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিক-ট করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।’ ভগিনী নিবেদিতা সেই শক্তি লাভ ক-রছি-লন শুধু তাই নয়, তার সফল প্র-য়া-গও সিদ্ধহস্ত ছি-লন, তা আর বলার অ-পক্ষা রা-খ না। ত-ব অ-পক্ষা রা-খ -স-কাজ তিনি -কন সম্পন্ন করেছিলেন এবং সেক্ষেত্রে কীভা-ব তা সম্পন্ন হ-য়ছিল, -স-সব প্র-শ্নর। অথচ শুধু তাই নয়, -সখা-ন তাঁর স্বকীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হ-য়ছিল, না-কি, তা-ত অমলিন ছিল আজীবন, তা নি-য় পরিপ্র-শ্নর অবকাশও তৈরি হয়। -কননা আপনা-ক সঁ-প -দওয়ার -চ-য় আপন অস্তি-ত্ব অবিচল -থ-ক আ-ত্মাৎসর্গ করা শুধু দুরূহ নয়, সাধনাসা-পক্ষও। -স সাধনায় ভগিনী নিবেদিতার অন্তিমযাত্রায় এসে মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলের দিকে ফিরে তাকানোর অবকা-শ স্বাভাবিকভা-বই তাঁর রূপান্তরকামী পরিস-র তাঁর অস্তি-ত্বর -সাপানটি প্রশ্নাতুর ক-র -তা-ল।

আপাতভাবে নিবেদিতার জীবনের সোপানে তাঁর উত্তরণের রূপরেখার সঙ্গে অতীত জীব-নর বীজ -থ-ক মহীরূহ হ-য় ওঠার সম্প-র্কর আধারটি-ত সরলীকর-ণর ছায়া দি-য় কায়া গঠ-নর প্রয়াস বর্তমান । তাতে তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের পরিসরটি মিলিয়ে দেওয়ার বাতিক আপনাতেই সক্রিয় হয়ে ও-ঠ। অথচ তা শুধু তাঁর জীবন-ক মূর্তি -থ-ক প্রতিমায় পূজার আস-ন সামিল ক-র। তা-ত ভাঙা-গড়ার মধ্য দি-য় আত্মিক প্রতিষ্ঠার -সাপা-ন তাঁ-ক অনন্যতার পরিচ-য় আ-বদনক্ষম করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। তার ফলে নিবেদিতার পরিচয়টি অমানুষিক সত্তায় যেভাবে সক্রিয়তা লাভ করেছে, -সভা-ব অনন্যতায় বিস্ময় সৃষ্টি ক-রনি। শুধু তাই নয়, তাঁর মানবিক আ-বদনও -সখা-ন ধর্মীয় আধা-র আচ্ছাদিত হ-য় র-য়-ছ। -সক্ষেত্রে তাঁর ধর্মীয় পরিসরে রূপান্তরিত জীবনের পরিচয়ই প্রাধান্য লাভ ক-র-ছ, স্বাজাত্য-বা-ধর আ-লায় -দ-শর ঐতিহ্য গ-ড় -তালায় আত্মনি-বদিত প্রকৃতি উদাসীনতায় উ-পক্ষিত হ-য়-ছ। স্বামীজি তাঁ-ক শুধু পথ -দখি-য়ছি-লন, কিন্তু তাঁর -সই পথচলা -থ-ক প-থর বিস্তার সবেতেই তিনি ছিলেন স্বকীয় সত্তায় অবিচল। -সই অবিচলতার কথা -সভা-ব উচ্চকিত হয়নি। -সখা-ন স্বামীজির ছায়ায় নি-বদিতার কায়া অ-নকাং-শ ঢাকা প-ড় -গ-ছ। শুধু তাই নয়, গুরুর আলোয় শিষ্যাকে -দখার বাতিকও অনেকক্ষেত্রে ভর করেছে। সেক্ষেত্রে বিদেশি চারাকে স্বদেশি বৃক্ষে পরিণত করার মহত্ত্ব স্বাভাবিক হ-য় উ-ঠ-ছ। অন্যদি-ক বি-বকান-ন্দর মাধ্য-ম -যভা-ব রামকৃষ্ণ পরমহংস-দ-বর পরিচয় আ-লাকিত হ-য়-ছ, -তমনই নি-বদিতার মাধ্য-ম বি-বকান-ন্দরও বিস্তার ঘ-ট-ছ নানাভা-ব। প্রসঙ্গত উ-ল্লখ্য ১৯০২-এ কলিকাতায় স্বামীজির জীবিতকা-লই বি-বকানন্দ -সাসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছি-লন তাঁর নি-বদিতা। এছাড়া সতীশচন্দ্র মু-খাপাধ্যা-য়র ‘‘ডন -সাসাইটি’(১৯০২)ও তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল। গুরুর ভাবাদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিবেদিতার সক্রিয় উ-দ্যাগ নানাভা-ব বিকশিত হ-য়ছিল। শুধু তাই নয়, স্বামীজির মানুষগড়ার সদিচ্ছার রূপায়ণেও তাঁর সবিশেষ প্রয়াস লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নি-বদিতা বি-বকানন্দ -সাসাইটির মাধ্য-ম সাত বছর ধ-র (ছয় মাস পড়া-শানা আর বাকি ছয় মাস তীর্থ ভ্রম-ণর মাধ্য-ম শিক্ষা লাভ) শিক্ষানবিশীর মাধ্য-ম যুবসমাজ তৈরি করার জন্য নতুন ম-ঠর পরিকল্পনা কর-ল স্বামী ব্রহ্মানন্দ তার অনুমতি -দননি। ফ-ল তা ফলপ্রসূ হয়নি। অন্যদি-ক স্বামীজির জীবনাদর্শকে সাধারণ্যে নিবিড় করে তোলার ক্ষেত্রে নিবেদিতার লক্ষ্যাভিমুখী ক-র্মা-দ্যাগ আজীবন সচল

ছিল। সেক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যমুখর প্রকৃতি আপনা-তই সবুজ হ-য় উ-ঠ-ছ। অথচ তাঁর হলুদ প্রকৃতি সবুজ হওয়ার অবকাশ পায়নি। নি-জর সবুজটুকুও তিনি স্বামীজির সজীবতায় ব্যয় ক-রছি-লন। নি-জ-ক নিঃস্ব করে নিবেদিতা তাঁর গুরুকে গরীয়ান করে সার্থকাম হলেও স্বকীয়তাকে প্রদীপের নী-চর অন্ত্যজ অন্ধকারে সংগুপ্ত রে-খছি-লন। সেক্ষেত্রে নিবেদিতা তাঁর সাধনার আভিজাত্যেই তিনি ব্রাত্য হয়ে প-ড়-ছন।

-নতাজি সুভাষচন্দ্র বসু -যমন বি-বকান-ন্দর -লখা প-ড় ভারতবর্ষ-ক ভা-লাবাসার কথা ব-ল-ছন, -তমনই নি-বদিতার -লখায় বি-বকানন্দ-ক -চনার কথাও অকপ-ট জানি-য়-ছন। অথচ সেক্ষেত্রে নি-বদিতার ভূমিকাটি আ-লাকিত হয়নি। -সখা-ন তাঁ-ক স্বামীজির ভারতবর্ষ -চনা-নার কথা -যভা-ব সক্রিয়তা লাভ করে, -সভা-ব তাঁর এ-দ-শর ঐতিহ্য-ক তু-লধরার কথা স্বতঃস্ফূর্ত হ-য় ও-ঠ না। শুধু তাই নয়, নি-বদিতা সম্প-র্ক জনমান-স পূর্ণ পরিচ-য়র অভাব তাঁর মৃত্যু অব্যবহিত পরিস-রও প্রকট হ-য় উ-ঠ-ছ । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ -যখা-ন ব-ল-ছন, ''তাঁহার ছিল সর্ব-তামুখী প্রতিভা', -সখা-ন নি-বদিতার প্রতিভার পরিচয় সম্প্রসারিত হয়নি। শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর ''নি-বদিতা -লাকমাতা'(১৯৬৮) গ্র-ন্থর কয়েকটি খণ্ডে তার পরিচয় দিয়েছেন। অথচ তিনিই আবার তাঁর জীবিতকা-ল অপ্রকাশিত, ''সাপ্তাহিক বর্তমান'-এ (২৮ অক্টোবর ২০১৭) প্রকাশিত রচনায় দেখি-য়-ছন, নি-বদিতার মৃত্যুর অববহিত পরিসরে পত্রপত্রিকায় শোকবার্তায় যেভাবে তাঁর অবদানকে স্বীকার করা হয়েছে, তা-ত -দশ-সবায় আত্মনিবেদিত প্রকৃতির সঙ্গে চারিত্রিক বিভূতির কথা উঠে এলেও তাঁর লেখনীশক্তির পরিচয় -সভা-ব প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেনি। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কথায়, ''এইখা-ন স্বীকার কর-ত হ-ব, শোকনিবন্ধগুলিতে নিবেদিতার অন্যবিধ কর্মমহিমা ও চরিত্রমহিমার উপর যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, প্রতিভাময়ী -লখিকার ভূমিকা সম্ব-ন্ধ ততখানি নয়'। অবশ্য নি-বদিতার সব -লখাই ইং-রজি-ত। সেক্ষেত্রে বাংলায় তার আ-বদন -সভা-ব প্রস্ফুটিত না হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া নি-বদিতার -লখার লক্ষ্যই ছিল ভারতবর্ষ সম্প-র্ক উচ্চধারণা গ-ড় -তালা। এ-দ-শর পাশাপাশি বি-দ-শর দি-কও তাঁর লক্ষ্য সম্প্রসারিত হ-য়-ছ। মিশনারি-দর -যাগ্য জবার -দওয়ার জন্য তিনি -যমন The Web of Indian Life (১৯০৪)লি-খ-ছন, -তমনই রামায়ণ-মহাভারত-পুরা-ণর গ-ল্পর হদিশ দি-য়-ছন তাঁর Cradle Tales of Hinduism (১৯০৭)। আবার তাঁর অমর সৃষ্টি The Master as I Saw Him (১৯১০)-এ তাঁর স্বামীজির পরশ প্রাপ্তির পরিচয় নিবিড় হ-য় উ-ঠ-ছ। অন্যদি-ক প্রথম বই Kali the Mother (১৯০০) -থ-ক তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী-ত -য-সমস্ত বই প্রকাশিত হ-য়-ছ, স-ব-তই স্বামীজির ছায়ায় এ-দ-শর কায়া নানাভা-ব বিকশিত হ-য়-ছ। -সই কায়ার ছায়া -দ-শর অস্থির পরিস-র প্রকট না হওয়াটা অসমীচীন ম-ন হয় না। -সদিক -থ-ক -লখিকা নি-বদিতার পরিচয় আজও দি-নর আকা-শ অদৃশ্য হ-য় র-য়-ছ। -সই ধারা আজও বিদ্যমান। অবশ্য শুধু তাই নয়, নি-বদিতার মানসপ্রতিমা-ক -যভা-ব আত্মত্যাগ ও -দশ-সবার মহিমায় আবৃত করা হ-য়-ছ, তা -থ-ক তাঁর অতুলনীয় অনন্যার পরিচয়-ক প্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য নয়। গভীর ভক্তি ও তীব্র অনুরাগ শুধু প্রশ্নবিমুখই করে তোলে না, সেইসঙ্গে মানবিক অন্তর্দৃষ্টি-কও ব্রাত্য ক-র -তা-ল। তার ফ-ল মহিমান্বিত প্রত্য-য়র উৎক-র্ষ জি'াসার দ্বার -যমন আপনা-তই রুদ্ধ হ-য় যায়, -তমনই নতুনতর প্রত্য-য়র প্রতি উদাসীনতা স্বাভাবিক হ-য় ও-ঠ। সেক্ষেত্রে নি-বদিতার পরিচ-য়র পরিসরটি শুধু নানাভা-ব সীমাবদ্ধ হ-য় প-ড়নি, বিতর্ক-কও সমান আমন্ত্রণ জানি-য়-ছ। সেই বিতর্কের আধারে তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্বের পরিচয় শুধু ব্যাহত হয়নি, নানাবিধ প্র-শ্নর অবতারণায় স-ন্দহের বাতাবরণকে সক্রিয় করে তোলে। স্বাভাবিকভা-ব স-ন্দহ শুধু শ্রদ্ধা-বা-ধ অন্তরায় সৃষ্টি ক-র না, প্রত্য-য়ও অনিশ্চিয়তা ব-য় আ-ন। -সদিক -থ-ক নি-বদিতার ত্যাগ ও -সবার ধর্মীয় পরিস-র তাঁর পরিচ-য়র মহিমা আবর্তিত হ-য়-ছ। অথচ তাঁর -সই সীমায়ত পরিচ-য়র আধা-রই

বিতর্কের অবকাশে তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ প্রকৃতি সবুজ হ-য় উঠ-ত পারত। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক অনুষঙ্গে তাঁর কথা যাও-বা এ-স-ছ, তাও বিতর্কিত।

নিবাদিতার আকস্মিক প্রয়া-ণ তাঁর প্রতি -যভা-ব দৃষ্টি আকর্ষ-ণর অবকাশ তৈরি হ-য়ছিল, তা শুধু আন্তরিক শ্রদ্ধা'াপ-নর মাধ্য-ম নীরবতা পালন ক-র। অবশ্য সেক্ষেত্রে তিনি কোনোদেশের কা-ছ -থ-ক যথার্থ স্বীকৃতি লাভ ক-রননি। ব্রিটিশ জনমান-স স্ব-দশ -ছ-ড় অপর -দ-শরই শুধু নয়, ভিন্নধ-র্ম দীক্ষিত হ-য় পর-দশী হ-য় ওঠাটা যেমন বিমুখতাকে সক্রিয় করেছে, -তমনই এ-দ-শর ভিন-দশী মানু-ষর জন্য আ-ত্মাৎসর্গ শ্রদ্ধা লাভ কর-লও তাঁ-ক আপনার ক-র -নওয়ার ম-তা উদারতা ও -যাগ্যতার অভাবই -সই অন্তরায়-ক আন্তরিক ক-র তু-ল-ছ। মৃত্যুর অব্যবহিত পরিস-র যাও-বা চর্চার অবকাশ তৈরি ক-র-ছ, তাও সময়ান্ত-র উ-পক্ষিত হ-য় প-ড়। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক অনুষঙ্গে তাঁর কথা যাও-বা এ-স-ছ, তাও বিতর্কিত। ১৯৪০-এর মাঝামাঝি-ত ''উ-দ্বাধন' পত্রিকায় গিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরী শ্রীঅরবি-ন্দর রাজনৈতিক জীবন সম্ব-ন্ধ দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রব-ন্ধ নি-বদিতার ভাবধারার -বশ কিছু প্রসঙ্গ প্রকাশ করেন। অন্যদি-ক নি-বদিতার জীবনীরচনার দায় পর্যন্ত এদেশে সক্রিয়তা লাভ ক-রনি। তাঁর প্রথম জীবনীকার স্বামীজির অনুরাগিনী ও নিবেদিতার অন্তরঙ্গ বান্ধবী মিস জোসেফীন ম্যাকলাউ-ডর ঘনিষ্ঠ -লখিকা লি-জল -রমঁ। বহু পরিশ্র-ম তিনি ফরাসি ভাষায় নি-বদিতা-জীবনী ''Nivedita--Fille de I'Inde' রচনা ক-রন। -সটি ১৯৪৫-এ প্রকাশিত হয়। -সই জীবনীটির ইং-রজি ভাষান্তর অবলম্ব-ন নারায়ণী -দবী কৃত অনুবাদ ''মাসিক বসুমতী'-ত ১৯৫২--ত ধারাবাহিক ভা-ব প্রকাশিত হয়। -সদিক -থ-ক নারায়ণী -দবীর অনূদিত লি-জল -র-মঁর ''ভারতকন্যা নি-বদিতা'র (১৯৫৫) মাধ্য-ম বাংলায় নি-বদিতার পরিচয় স্বাধীনতা-উত্তর পরিসরে সম্প্রসারিত হওয়ার অবকাশ -প-লও তা নি-য় বিত-র্কর -মঘও ঘনীভূত হ-য়-ছ। অবশ্য -সই -ম-ঘ ছিল শর-তর আবহ, বর্ষার আ-বদন তা-ত অন্তর্হিত। এজন্য তা-ত বিদ্যু-তর চমক ছিল, বর্ষ-ণর অবকাশ ছিল না। শুধু তাই নয়, বিত-র্কর স্বাস্থ্যকর দিকটিই সেক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যের আধার হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নারায়ণী -দবীর দুই বছর প-র প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা ইং-রজি-ত নি-বদিতার জীবনী রচনা ক-রন। অন্যদি-ক ১৯৬০-এ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর ''ভগিনী নি-বদিতা ও বাংলার বিপ্লববাদ' প্রকাশিত হয়। -সদিক -থ-ক নারায়ণী -দবীর অনুবা-দর মাধ্য-ম নি-বদিতাচর্চার সূচনাটি তাই বি-শষভা-ব স্মরণীয়। দীর্ঘদিন প-র নি-বদিতার জীব-ন আ-লার পরশ ছড়ি-য় পড়ার অবকা-শই তাঁর এ-দ-শ আগম-ন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংস্পর্শে আসার ইতিবৃত্তে যেভাবে বিতর্কের বার্তা উঠে আসে, তা-ত মঠ-মিশনের সঙ্গে সম্প-র্কর বুনিয়াদী -চতনায় আপনা-তই প্রমা-ণর অভা-বর আধা-র -সই আ-লার বিপ্রতী-প আঁধার ব-য় আ-ন। শুধু তাই নয়, শ্রদ্ধা-বা-ধ স-ন্দ-হর পরিসর -যমন প্রতিকূল আবহ ব-য় আ-ন, -তমনই বিত-র্কর আবহও শ্রদ্ধা-বা-ধ বিমুখতা-ক ত্বরান্বিত ক-র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফরাসি ভাষায় লিখিত নি-বদিতার জীবনী বইটির সমা-লাচনা ক-রছি-লন বিনয়কুমার সরকার। -সটি ১৯৪৬-এ ''প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যদি-ক নারায়ণী -দবী কৃত অনূদিত জীবনীটি ''মাসিক বসুমতী'-ত প্রকাশিত হওয়ার সময়ই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশ-নর দৃষ্টি আকর্ষণ ক-রছিল। স্বাভাবিকভা-ব তার ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে বিরূপ মানসিকতা লিখিত আকারে প্রতিবাদের পরিসরে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারই ফসল রামকৃষ্ণ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী কুমুদবন্ধু -স-নর নিবন্ধ ''নি-বদিতা'। -সটি ১৩৬৩-এ বৈশাখ সংখ্যার ''প্রবাসী'-ত প্রকাশিত হয়। তাতে পূর্বা সেনগুপ্ত কৃত (''নি-বদিতা ও কিছু বিতর্কিত প্রশ্ন', ''মাতৃশক্তি', শারদীয়া ১৪২৩) দশটি অভি-যা-গর ম-ধ্য নি-বদিতার এ-দ-শ এ-স মঠ ও মিশ-নর সান্নিধ্যে আসার তিক্ত অভি'তা থেকে তাঁর রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ -যাগ বিষ-য় মিশ-নর বিরূপ ধারণা উ-ঠ এ-স-ছ। আস-ল সত্যকাম মূর্তি বিষ-য় আমা-দর ধারণা আ-পক্ষিক। এজন্য -সই মূর্তি কারও

কা-ছ প্রতিমায় পূজিত হয়, কারও কা-ছ পুতুলবৎ হাস্যকর হ-য় ও-ঠ। আবার কারও কা-ছ তা বিমূর্ত-চতনায় রহস্যমুখর ম-ন হয়। অথচ সত্যকাম মূর্তি পূজাও চায় না, হাসি-কও আমন্ত্রণ জানায় না, রহস্য আমদানি করাও তার লক্ষ্য নয়, চায় শুধু সত্য প্রকাশ কর-ত। -সই প্রকা-শই আমা-দর যত দ্বিধা, ততই সঙ্কট। আর সেই সঙ্কটমোচনে -কৌশলী অবস্থান স্বাভাবিক হ-য় আ-স। অথচ সত্য স্বীকারের দায়ে যে মহত্ত্ব বর্তমান, তা -গাপন করায় শুধু নিঃস্ব হ-য় প-ড় না, মূল্য-বাধ-কই বিপ-থ চালনা করায় তার সম্পর্কে বিরূপ ধারণাকেই সক্রিয় করে না, প্রকারান্ত-র তার বিমুখতা-কও আমন্ত্রণ জানায়। নিবেদিতার ক্ষেত্রে তার পরিচয় অত্যন্ত নিবিড়।

জীবনীরচনার ম-ধ্য থা-ক -শ্রেষ্ঠত্ব-বাধ। সে বোধ জাগরণের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিকূলের মধ্যেও আনুকূল্য লা-ভর পরিসর আপনা-তই প্রকাশমুখর। মার্গা-রট এলিজা-বথ -না-ব-লর অসীম প্রতিকূলতার আধারে ভগিনী নিবেদিতা হয়ে ওঠার জীবনবৃত্তান্তে স্বাভাবিকভাবেই এদেশের সংস্কারশাসিত রক্ষণশীল পরিস-রর অনাত্মীয়সুলভ বিপন্ন প্রকৃতির ছায়া কায়ারূপ লাভ ক-র-ছ। স্বয়ং স্বামী বি-বকানন্দই -সবিষ-য় তাঁ-ক -লখা চিঠি-ত -স-বিষ-য় -চতাবনি দি-য়-ছন। আল-মাড়া -থ-ক ১৮৯৭-এর ২৯ জুলাই-এ -লখা চিঠি-ত স্বামীজি -যমন ''কল্যাণীয়া মিস -নাব্‌ল'-ক এ-দ-শ ''এক বিরাট ভবিষ্যৎ'-এর আ-বদ-ন ''সরাসরি' আমন্ত্রণ জানি-য়-ছন, -তমনই তার প্রতিকূল আবহ সম্ব-ন্ধও স-চতন ক-র -তালায় প্রয়াসী হ-য়-ছন : ''কিন্তু বিঘ্ন আ-ছ বহু। এ-দ-শর দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কী ধর-নর, তা তুমি ধারণা কর-ত পা-রা না। এ-দ-শ এ-ল তুমি নি-জ-ক অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নরনারী-ত পরি-বষ্টিত -দখ-ত পা-ব। তা-দর জাতি ও স্পর্শ সম্ব-ন্ধ বিকট ধারণা ; ভ-য়ই -হাক বা ঘৃণা-তই -হাক---তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়ি-য় চ-ল এবং তারাও এ-দর ঘৃণা ক-র। পক্ষান্ত-র, শ্বেতাঙ্গেরা তোমাকে খামখেয়ালি মনে করবে এবং প্র-ত্যকটি গতিবিধি স-ন্দ-হর চ-ক্ষ -দখ-ব।' সেদিক থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে নি-বদিতার সম্প-র্কর বুনিয়া-দ -য এ-দশ--স-দ-শর উভয় পরিসরই -নতিবাচকতায় সক্রিয়তা বর্তমান, তাও সহ-জ অনু-ময়। বিশেষ করে মঠ ও মিশনের সংস্পর্শে নিবেদিতার তিক্ত অভি'তার কথা তাঁর জীবনী-ত উ-ঠ এ-স-ছ, তার ক্ষেত্রপ্রস্তু-ত স্বামীজির চিঠিটিই য-থষ্ট হ-য় ও-ঠ। সেক্ষেত্রে নিবেদিতাকে আপন ক-র -নওয়ার মানসিকতার অভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক। স্বামীজি নি-জও তাঁর শিষ্যার গ্রহণ-যাগ্যতা বিষয়ে যথেষ্ট রকম সক্রিয় ছিলেন এবং তা-ত তিনি সফলও হ-য়-ছন। আমা-দর সমস্যা হ-চ্ছ বিখ্যাত পরিসর দি-য় অখ্যাত পরিচ-য়র হদিশ -মলা-না। নিবেদিতা স্বামীজির বৃত্তে ক্রমশ শুধু গ্রহণীয় নয়, শ্র-দ্ধয় হ-য় উ-ঠছি-লন। তাই ব-ল তাঁর প্রতি প্রাথমিক বিমুখ প্রকৃতি-ক অস্বীকার করা যায় না। অন্যদি-ক -সই বিরূপতা-ক রঙিন ক-র তু-ল তার আভিজাত্যে মহত্ত্বকে বনেদি করাও সমীচীন নয়। একথা স্মরণীয়, মৃত্যুর সুদীর্ঘ অবকা-শর প-র লি-জল -রঁম নি-বদিতার জীবনী -লখায় ব্রতী হ-য়ছি-লন। সেক্ষেত্রে ম্যাকলাউডের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার বিষয়টিও স্মরণীয়। তা-ত জীবনী--লখিকার সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধাবোধও নিবিড়ভা-ব জড়ি-য় থাকাটাই সমীচীন। সেক্ষেত্রে প্রতিকূলতাকে জয় করার জয়ী প্রকৃতি আপনাতেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই জয়ী প্রকৃতির ব-নদিয়ানায় নি-বদিতার প্রতিকূলতার পরিসর আ-বদনক্ষম ম-ন হ-য়-ছ। সেক্ষেত্রে নিবেদিতা নিজেই জানিয়েছেন, ''The Swami's influence proved all powerful, and I was accepted by society'। -সখা-ন স্বামীজির প্রভা-ব নি-বদিতার গ্রহণীয়তার বিষয়টিই ব-ল -দয় মঠ ও মিশ-নর পরিস-র তাঁর প্রতিকূলতার অস্তি-ত্বর কথা। সেই অস্তিত্বই স্বামীজির বর্তমানে নিবেদিতার সঙ্গে রাজনীতির সংযোগে আরও তীব্রতা লাভ ক-র। আর তা থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগ-বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি স্বাভাবিকভা-বই সবু-জ সজীব হ-য় ও-ঠ। সেক্ষেত্রে নিবেদিতার মঠ-মিশনবিচ্ছিন্ন পরিসর -যমন অসুস্থ বিত-র্কর অবকাশ তৈরি ক-র-ছ, -তমনই তাঁর মহত্ত্বের পরিচয়কে ম্লান করে তুলেছে। অথচ

তাঁর রাজনৈতিক -যা-গর কথা স্বীকার ক-রও প্রকারান্ত-র রাজনীতির -নতিকবাচক -চতনায় তা অস্বীকা-রর সামিল করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ-ত নি-বদিতার -গৌরবান্বিত পরিচয় শুধু -ম-ঘ ঢাকায় তারায় আচ্ছাদিত থা-কনি, তাঁর মহত্ত্বর ও বৃহত্তর আত্মত্যা-গর -সাপানটিই রুদ্ধ হ-য় প-ড়-ছ। আমৃত্যু তিনি -সবিষ-য় নীরবতার সাধনায় আত্মমগ্ন ছি-লন। সেক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সরকারের সুদৃষ্টি বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিবেদিতাকে মুক্ত করে তোলার সদিচ্ছায় তাঁকে বিচ্ছিন্ন করার -চ-য় তাঁর নীরবতার সাধনা অ-নক-বশি মহত্ত্বের মনে হয়।

আসলে রাজনীতির প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের রাজনীতিমনস্কতার অন্তরায় সৃষ্টি ক-র থা-ক। অথচ মানু-ষর অস্তি-ত্বর -সাপা-নও রাজনীতির -যাগ বর্তমান। অধিকার, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বৃত্তায়নে মানুষের অধিকারবোধের মধ্যেই রাজনৈতিক পরিসর অনিবার্য হ-য় ও-ঠ। -সখা-ন রাজনীতির ক্ষমতায়নের নেতিবাচক চেতনায় তাকে সংকীর্ণ করে দেখার মধ্যে অবমূল্যায়নের দ্বার আপনাতেই মুক্ত হ-য় প-ড়। এজন্য ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক আবেদনক্ষম না হলেও তার অস্তিত্ব-ক অস্বীকার করার উপায় -নই। কেননা সেক্ষেত্রে শুধু ধর্মকে রক্ষার জন্যই রাজনীতির প্রয়োজন পড়ে না, রাজনীতি-ক সুরক্ষিত করার জন্য ধ-র্মর সং-যাগ স্বাভাবিক হ-য় ও-ঠ। শুধু তাই নয়, ধ-র্মর বিস্তার শুধু ধর্মীয় পরিস-রই সীমাবদ্ধ হ-য় প-ড় না, মানবিক ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়। -সদিক -থ-ক রাজনীতির সংস্পর্শ এড়া-নার ম-ধ্যও রাজনীতি বর্তমান। রাজনীতি না-করাও রাজনৈতিক -কৌশল। সেক্ষেত্রে নিবেদিতাকে স্বাধীনভা-ব রাজনীতি করার সু-যাগ ক-র -দওয়ার -চ-য় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন-ক সরকা-রর স-ন্দহ ও -রাষানল -থ-ক রক্ষার মানসিকতা সেখানে অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। -সদিক -থ-ক নি-বদিতা-ক রাজনৈতিক পরিসরে মুক্ত রাখার দায়িত্ববোধে তাঁকে মঠ-মিশন -থ-ক দূ-র রাখার সদিচ্ছার ম-ধ্য -যমন সম্পর্কের দূরত্ব আপনাতেই সক্রিয়তা লাভ করে, -তমনই তাঁর রাজনৈতিক সত্তা জনমানসে বিরূপ মানসিকতা-ক আমন্ত্রণ জানি-য়-ছ। মঠ ও মিশনের সঙ্গে সংযোগ-বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি সমাজমান-স নি-বদিতার গ্রহণ-যাগ্যতার পরিসর-ক বিতর্কিত ক-র তু-ল-ছ। তাছাড়া এদেশে রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার প্র-য়াজ-নর কথা অ-নক পূ-র্বই -ভ-বছি-লন নি-বদিতা। ১৯০১-এর ১০ জু-ন -লখা চিঠি-ত মিস ম্যাকলাউডকে প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানাচ্ছেন : ''......আর হিন্দুধর্মই এখন সব-চ-য় -বশী ক-র আমার ধর্ম, কিন্তু সেই সঙ্গে রাজনৈতিক প্র-য়াজন এত স্পষ্ট ক-র -দখ-ত পাচ্ছি! এই আমার বক্তব্য, এবং এর কা-ছ আমায় খাঁটী থাক-তই হ-ব।' এজন্য স্বামীজির মুখা-পক্ষী -থ-কও তিনি তা -থ-ক বিরত হননি। অন্যদি-ক তাঁর মঠ-মিশনত্যা-গ কলকাতার পরিচিত মহ-ল -শার-গাল প-ড়ছিল। ১৯০২-এর ১৯ জুলাই নি-বদিতার সংঘত্যা-গর সংবাদ ''অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মানন্দ-ক -লখা চিঠিতেই তিনি জানিয়েছিলেন সংবাদপত্রেও তাঁর অবস্থান সম্প-র্ক অবগত কর-বন। তার প-রই দিনই অমৃতবাজা-র তা -বরি-য় যায়। স্বাভাবিকভা-বই তার প্রভাব প-ড়। সরলা -ঘাষাল ''ভারতী' পত্রিকার (ভাদ্র ১৩০৯) সম্পাদকীয়তে কটূক্তি করেছিলেন। অথচ সঙ্ঘ -থ-ক -কা-না প্রতিবাদ না হ-লও -সই প্রভা-ব -কা-নারকম -নতিবাচক ধারণা যা-ত গ-ড় না ও-ঠ, তার জন্য স-চষ্ট হ-য়ছি-লন স্বয়ং নি-বদিতা। তিনিই ''ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় (৩১ জুলাই, ১৯০২) জানি-য় -দন -য, ''সং-ঘর কর্তব্য ধর্মীয় সম্পদ ভাণ্ডারের সংরক্ষণ ও বিস্তারসাধন এবং নিবেদিতার সম্পর্ক তাহার সহিত দীন শিক্ষার্থিনী ব্রহ্মচারিণীর, পূর্ণব্রতী সন্ন্যাসিনীর ন-হ ইত্যাদি।' তাতে নিবেদিতার সঙ্গে মঠ-মিশন সম্পর্ক শুধু বিতর্ক-ক আমন্ত্রণ জানায়নি, তাঁর প্রতি স্বচ্ছ ধারণার অন্তরায়ে বিমুখতার পরিসরও সক্রিয়তা লাভ করে। তাঁর রাজনীতির -যাগ-ক নানাভা-ব লঘু ক-র -দখার প্রয়া-সর ম-ধ্যই তা প্রতীয়মান। অর্থাৎ প্রকারান্ত-র নি-বদিতার রাজনীতির -যাগ-ক অস্বীকার করার প্রবণতা সেখানে সক্রিয়তা লাভ করেছে। -যন নি-বদিতার প-ক্ষ রাজনীতির সং-যাগ ছিল অনভি-প্রত। সেক্ষেত্রে রাজনীতির প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই শুধু নয়, সেইসঙ্গে একজন ধর্মীয় সেবাপরায়ণ ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক প্রকৃতিও সেই বিমুখতাকে সক্রিয় করে

তু-ল-ছ। অথচ মানবধর্মকে রক্ষার মহত্ত্বর ও বৃহত্তর স্বার্থে রাজনীতির পরশ স্বাভাবিক হ-য় ও-ঠ। পরাধীন -দ-শ রাজনীতিই হ-য় ও-ঠ স্বাধীনতা লা-ভর পদ-ক্ষপ। -সই পদ-ক্ষ-প পা মিলি-য়ছি-লন নি-বদিতা এবং তা ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি। নি-বদিতার বার্তা-তই র-য়-ছ -সই স্বাধীনতার সঙ্গে জীব-নর গভীর অন্বয়-বাধ। তাঁর কথায় : ''জীবন, জীবন, জীবন, আমি জীবন চাই। আর জীব-নর একমাত্র প্রতিশব্দ হল স্বাধীনতা। তা না থাকলে মৃত্যুও শ্রেয়।' স্বাভাবিকভা-বই তাঁর -দ-শর -সবায় রাজনীতির -যাগ অনিবার্য হ-য় ও-ঠ। -কননা -দশগঠ-নর স্বা-র্থ প্রথমে পরাধীনতা মুক্ত হতে হবে। -সজন্য এ-দ-শ এ-স -দশ-সবার -সাপা-নই তাঁর রাজনৈতিক সং-যাগ ছিল অনিবার্য। তাঁর ম-ন হ-য়ছিল, ''-দশ চায় -দহ ম-ন বলিষ্ঠ -দশ-প্রমিক-দর ; বলিষ্ঠ -দশ-প্রমিকরাই -কবল -দশ-ক তুল-ত পার-ব।' সেক্ষেত্রে গুরু বি-বকান-ন্দর আদর্শ-ক অস্বীকার নয়, বরং ফলপ্রসূ করায় উ-দ্যাগী হ-য়ছি-লন নি-বদিতা।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, স্বামীজি -দ-শর স্বাধীনতার জন্য আগামী প'াশ বছর অন্যস-বর পূজার পরিব-র্ত -দশমাতার উদ্ধা-র ব্রতী হওয়ার কথা ব-লছি-লন। তাঁর বাণী ও রচনাবলিই -দশ-প্রমী-দর পাঠ্য হ-য় উ-ঠছিল। অন্যদি-ক নি-বদিতার প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। তাঁর জীবিতকা-লই নি-বদিতা রাজনীতির সংস্প-র্শ এ-সছি-লন। ১৭ নং -বাসপাড়া-তই তাঁর স-ঙ্গ রাজনীতির লোকজনের আলোচনা চলত। এবিষ-য় স্বামীজির -য সায় ছিল, তা পূর্বা সেনগুপ্তের লেখাতেই উঠে এসেছে। -সখা-ন জীবনীকা-রর কথা-কই শুধু অস্বীকার করা হয়নি, বরং কটাক্ষও বর্ষিত হ-য়-ছ। নি-বদিতার রাজনীতির সং-যাগ বিষ-য় পূর্বা সেনগুপ্তের স্পষ্ট অভিমত বর্তমান। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তাঁর অভিমত : ''স্বামীজির উপ-দ-শ বা -প্ররণায় নি-বদিতার আগ্রহ সজাগ হয়নি, হল সু-রন ঠাকু-রর সঙ্গে ওকাকুরা যখন দেখা ক-রন তখন। এর -চ-য় আশ্চর্য কী হ-ত পা-র? রাজনৈতিক -নতারা -বাসপাড়ায় নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্টভা-বই মিশ-তন। ব্রহ্মানন্দ স্বামীর পরামর্শ ম-তা নি-বদিতা-ক স্বাধীনভা-ব কাজ করবার জন্য মিশ-নর সা-থ সম্বন্ধ ত্যাগ কর-ত হয়।' অথচ তারপ-রও ''নি-বদিতা প্র-ত্যক কা-জই স্বামীজির গুরুভ্রাতাদের পরামর্শ নিতেন এবং শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ প্রার্থনা কর-তন।' অবশ্য তা-ত -য নি-বদিতার পরিসর স্বাভাবিকতার আ-লায় প্রসারিত হয়নি, তার কথাও পূর্বা সেনগুপ্তই তাঁর ''ভারতপ্রাণা নি-বদিতা : সমাজবি'ানীর দৃষ্টি-ত'(২০১৫) বই-এর ভূমিকায় জানি-য়-ছন : ''নি-বদিতা অবশ্যই উ-পক্ষিতা। স্বামী বি-বকান-ন্দর -দহরক্ষার পর কাগ-জ কল-ম রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগ তাঁ-ক মূল আ-ন্দালন -থ-ক -যমন একপা-শ সরি-য় -র-খছিল, তেমনি তাঁর জীবন সম্বন্ধে বহুভ্রান্ত ধারণাও গড়ে উঠেছিল । নারীর যুক্তি ও বুদ্ধি-ক এখনও কি আমরা মূল্য দি-ত -প-রছি? এ প্রশ্ন এ যু-গর নারীর।' সেক্ষেত্রে বিয়োজনের অন্তরায়ই সং-যাজন-ক আন্তরিক কর-ত পা-রনি। এনিয়ে রাজনীতির নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিবেদিতার আন্তরিক প্রয়াসও রক্ষণশীল সমাজমান-স আনুকূল্য লা-ভ ব্যর্থ হ-য়-ছ। বি-শষ ক-র -দ-শাদ্ধা-র সশস্ত্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সন্ন্যাসিনীপ্রতিম ব্যক্তিত্বের সংযোগকে সহজ করে নেওয়াতেই যেখানে ম-নর সায় পাওয়া দুরূহ, সেখানে তাঁর মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াটা স্বাভাবিক হ-য় না-আসাই দস্তুর।

-সদিক থেকে নিবেদিতার রাজনৈতিক সক্রিয়তাকে লঘু করে দেখার মধ্যে দুধর-নর -চতনা বিস্তার লাভ ক-র। প্রথমত, তাঁর সঙ্গে রাজনীতির যোগকে অস্বীকার করার প্রবণতা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, তাঁর রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে পারিবারিক বিপ্লবী ঐতিহ্যকে মিলিয়ে দেওয়ার বাতিক সক্রিয়তা লাভ ক-র-ছ। তা-ত সরলীকর-ণর প্রয়াস বিদ্যমান। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, নিবেদিতা রাজনীতি করেছেন গুরু স্বামীজির ব্রত উদযাপ-ন, মার্গারেট তাঁর নিজের দেশে পারিবারিক সূত্রে সক্রিয় রাজনীতির পরিসরেও শিক্ষকতায় নি-জ-ক সঁ-প দি-য়ছি-লন। -সখা-ন সক্রিয় রাজনীতি করার কথা জানা যায়নি। লি-জর রেঁমের লেখার সূত্রে জানা যায় ফ্রি আয়ারল্যান্ড সংগঠনের সঙ্গে মার্গারেট একসময় জড়িয়েছিলেন এবং

রাশিয়ান বিপ্লবী প্রিন্স ক্রপটকিনের দ্বারা গভীরভা-ব প্রভাবিতও হ-য়ছি-লন। স্বামীজির মৃত্যু-পরবর্তী পরিসরে নিবেদিতার মধ্যে প্রিন্স ক্রপটকি-নর প্রভাব আরও তীব্রতা লাভ ক-র। পাশ্চা-ত্য দুই বছর থাকার সময় নি-বদিতা তাঁর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে সাক্ষাৎও ক-রছি-লন। তাঁর লেখাতেও প্রিন্স ক্রপটকি-নর কথা উ-ঠ এ-স-ছ। তৃণমূল স্ত-র আ-ন্দালন ছড়ি-য় না দি-ল বিপ্ল-বর সাফল্য আসা সম্ভব নয়, এই ধারণা নি-বদিতা তাঁর কাছ -থ-কই -প-য়ছি-লন। -সদিক -থ-ক নি-বদিতার বিপ্লবী-দর -যাগ-ক অস্বীকার করার প্রবণতা সক্রিয় হয়ে ওঠে। অথচ বিপ্লবও রাজনৈতিক পন্থা, তা-ক -তা আর অস্বীকার করা চলে না। রাজনীতির সঙ্গে নিবেদিতার প্রত্যক্ষ ও প-রাক্ষ সং-যাগ বর্তমান। তার পরিচয় নানাভা-বই উ-ঠ এ-স-ছ। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, মার্গারেটের পিতা স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবল পৈত্রিকসূত্রেই ছিলেন ধর্ম ও -দ-শর -সবায় নি-বদিত প্রাণ। তাঁর পিতা জন নোবল ছিলেন উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তিসংগ্রামের অবিসংবাদিত -নতা। শুধু তাই নয়, তিনি আবার চা-র্চর ধর্মযাজকও ছি-লন। আর স্যামু-য়লর মাতা মার্গা-রট এলিজা-বথ পরিবা-রর বন্ধন ছিন্ন ক-র জন -নাবল-কই বি-য় ক-রছি-লন। -সদিক -থ-ক কর্ক ব্যবসায়ী ও আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি-আ-ন্দাল-নর -নতা রিচমন্ড হ্যামিলট-নর কন্যা -মরির সঙ্গে স্যামুয়েল রিচমণ্ডের বৈবাহিক সম্পর্ক আন্তরিক হ-য় উ-ঠছিল। তাঁ-দর প্রথম সন্তান মার্গা-রট এলিজা-বথ -নাব-লর নামকর-ণর ম-ধ্যই তাঁর পিতামহীর স্মৃতি জড়িত হ-য় র-য়-ছ। অথচ অতী-তর -সই রাজনৈতিক যোগসূত্রের আধারে নিবেদিতার রাজনীতির সংযোগ দেখলে মূল্যায়নের অন্তরায় আপনা-তই আন্তরিক হ-য় ও-ঠ।

আস-ল নি-বদিতার রাজনীতির -যা-গ র-য়-ছ তাঁর গুরু তথা স্বামীজির অন্তর্দৃষ্টির পরশ। -দশ-সবার -সাপা-ন স্বাভাবিকভা-বই বি-দশি শাসন--শাষ-ণর পীড়া-বা-ধর -চতনা এ-দ-শ আসার পর প্রত্যক্ষভা-ব অনুভব ক-রন। আর তাঁর মান-স স্বামীজির গভীর দেশপ্রেমের আহ্বান সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। এ-দ-শ আসার পর ম্যাকলাউড-ক -লখা চিঠি-ত (২২ -ফব্রুয়ারি ১৮৯৯) লর্ড কার্জ-নর জনপ্রিয় শাস-নর মানবিক মু-খর কথা ব-ল-ছন। তখনও নি-বদিতার ম-ধ্য রাজনীতির প্রতি -কা-নারকম আগ্রহ ছিল না। -সই নি-বদিতাই ১৯০১-এ রীতিমতো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্টভা-ব আ-লাচনায় সক্রিয় হয়েছেন। ১৯০৩-এর ২৮ জানুয়ারি-ত ম্যাকলাউড-ক -লখা চিঠি-ত তিনি লর্ড কার্জন-ক ভয়ঙ্কর ভাইসরয় ব-ল অভিহিত ক-র-ছন। স্বামীজির মৃত্যুর পর রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় । নি-বদিতা নারীশিক্ষা বিস্তার, সেবামূলক কাজকর্মাদির পাশাপাশি দেশের মুক্তির জন্য স্বামীজির আদর্শে যুবসমাজ-ক -দশ-প্র-ম উদ্বুদ্ধ করার মান-স নানাভা-ব নিজেকে সক্রিয় রেখেছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক সংযোগের আধারে ছিল দেশের মুক্তি। সেই মুক্তির জন্য বিপ্লবী গড়ে তোলায় তাঁর সদর্থক ভূমিকা বি-শষভা-ব উ-ল্লখ্য। -সদিক দি-য় স্বামীজির খতশ লতযভশফ নি-বদিতার কা-ছ গতঢ়ভষশ লতযভশফ-এ বিবর্তিত হয়। সেই সোপানে সরাসরি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে যুবসমাজ-ক উদ্বুদ্ধ করায় প্রয়াসে তাঁর সক্রিয় উ-দ্যাগ অত্যন্ত স্বাভাবিক হ-য় ও-ঠ। -সই অগ্নিযু-গ অরবিন্দ -ঘা-ষর প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতির লাইব্রেরিতে প্রায় শ'-দ-ড়ক বিপ্ল-ব -প্ররণাদায়ক বই উপহার দি-য়ছি-লন নি-বদিতা। শুধু তাই নয়, অরবিন্দকে নানাভাবে তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর সার্বিক সহ-যাগিতাও বি-শষভা-ব স্মরণীয়। তাঁর ''কর্মবাদিন' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গেও নিবেদিতার যুক্ত থাকার কথা সুবিদিত। শুধু তাই নয়, তাঁর ব্রিটিশবি-রাধী রচনাও -গা-য়ন্দা-দর -শ্যন দৃষ্টি-ত ছিল। কং-গ্রস -নতা -গাপালকৃষ্ণ -গাখ-লর আহ্বা-ন নি-বদিতা ১৯০৫-এর ডি-সম্ব-র কং-গ্র-সর -বনারস অধি-বশ-ন অংশ নিয়ে বক্তৃতাও দি-য়ছি-লন। সেখানে তাঁর বক্তৃতায় নিবেদিতা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের স্বাধীনতার আদর্শ বিস্মৃতির কথা তু-লধ-রছি-লন। অন্যদি-ক লি-জল -র-মঁর সংগৃহীত ত-থ্যও নি-বদিতার শুধু রাজনৈতিক -যাগই নয়, বৈপ্লবিক সং-যাগও সুনিবিড়। -সখা-ন ''হিংসাত্মক বিপ্ল-বর কথা'ও উ-ঠ এ-স-ছ। রামানন্দ চ-ট্টাপাধ্যা-য়র স্মৃতিচার-ণ (''উ-দ্বাধন' পত্রিকা, ১৩৩৫) -সকথাই প্রত্যয়সিদ্ধ ক-র -তা-ল। তাঁর কথায়,

‘‘তাঁহার রাজনৈতিক মত সম্ব-ন্ধ আ-রকটি কথা এই বলিব -য, তিনি সকল অবস্থা-তই অহিংসার পক্ষপাতী ছি-লন না ; প্র-য়াজন-বি-শ-ষ স্থান-বি-শ-ষ বলপ্র-য়াগ ও যুদ্ধ তিনি আবশ্যক ম-ন করি-তন।’ এসবের পরও নিবেদিতার আদর্শব্রতী সন্ন্যাসীপ্রতিমায় সক্রিয় রাজনীতির পরিসরটি আবেদনক্ষম হয়ে ও-ঠনি, বরং বলা ভা-লা ওঠা-তও আমা-দর দ্বিধা বর্তমান। -সজন্য আরও অকাট্য প্রমা-ণর অভাব-বা-ধ তা না-মানার আনুকূ-ল্য নি-বদিতার আত্মত্যাগ ও -সবার আদ-শর -সাপানটি উচ্চকিত হ-য়-ছ ঠিকই, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের নীরব সাধনার পরিসরটি -থ-ক-ছ অন্তরা-ল। তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রচারবিমুখ প্রকৃতিটি কত সাধনাসা-পক্ষ ছিল, ভাব-ল বিস্মিত হ-ত হয়। -দ-শর -সবায় আত্মনি-বদিত প্রকৃতি-ক তু-লধরার ম-ধ্যও আত্মপ্রকাশের চেতনা সক্রিয়তা লাভ করে। -সখা-নও নি-বদিতা সহজতার বিস্ময়কর অভিব্যক্তি লক্ষনীয়।

আস-ল নি-বদিতা -চ-য়ছি-লন স্বামীজির প্রদর্শিত প-থ চল-ত। -সই চলার প-থ তাঁর আত্মস-চতন প্রকৃতিই তাঁ-ক স্বাধিকারবোধে সর্বদা সক্রিয় রেখেছিল। এজন্য তাঁর আত্মনি-বদ-নর গরিমা প্রকা-শ অস্তিত্ব-সংক-টর -ফ-র পরতে হয়নি। সর্বত্র তাঁর অবাধ বিচরণ। অথচ -কাথাও তাঁর নীরব বিস্তার লঙ্ঘিত হয়নি। -সক্ষেত্রে স্বামীজির অবাধ স্বাধীনতা তাঁকে উচ্ছৃঙ্খল না ক-র বরং আরও সংযমী ক-র তু-ল-ছ। আস-ল নি-বদিতার প্রতি স্বামীজির অবাধ আস্থা ছিল। -সই আস্থা-তই তাঁর -দ-শর -সবায় বহুমুখী ক-র্ম আত্মনি-য়া-গর -সাপা-ন তিনি সহ-জই নি-জ-ক -ম-লধর-ত -প-রছি-লন। -দশজ ধর্ম-বি`ান-শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহি-ত্যর প্রভৃতি বহুধাব্যাপ্ত ক্ষেত্রের সমৃদ্ধিতে তাঁর স্বকীয় মনীষার আন্তরিক প্রয়াস অবিস্মরণীয়। সর্বত্রই তাঁর দেশের প্রতি ঐকান্তিক শ্রেষ্ঠত্ববোধের সুমহান ঐতিহ্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকট হ-য় উ-ঠ-ছ। বি`ানচর্চায় জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠালাভে যেমন তাঁর সক্রিয়তার -যা-গ ধ-র্মর প্রাচীর ছিল না, -তমনই বাংলা সাহি-ত্যর ইতিহা-সর ইং-রজি অনুবা-দ দী-নশচন্দ্র -সন-ক অকাত-র সাহায্য কর-তও তিনি ছি-লন দ্বিধাহীন চিত্ত। আবার -দশীয় শিল্পচর্চা নি-য়ও নি-বদিতা ‘‘মডার্ণ রিভিউ’ পত্রিকায় লেখনীধারণ করেছিলেন। সর্বত্রই অবাধ বিস্তার থাকলেও কোথাও তাঁর প্রকাশমু-খ প্রমুখতা -নই। স-ব-তই নীরবতার সাধনা, সবকিছুর ম-ধ্যই -দ-শর গরিমা-ক মহিমান্বিত করার প্রয়াস। দেশের সেবায় আত্মনিবেদিত প্রকৃতিতে নিবেদিতা যখন যেভাবে সক্রিয়তার প্রয়োজনবোধ ক-র-ছন, তখনই তা-ত আত্মনি-য়াগ ক-র-ছন। সেখানে শুধুমাত্র মৌখিক উৎসাহ--প্ররণা বা বাধা কাটিয়ে ওঠার কথায় সক্রিয় হননি, নি-জও তা-ত সামিল হ-য়-ছন। সেক্ষেত্রে তাঁর সহযোদ্ধার ভূমিকায় আত্মত্যাগী মহামান-বর পরিচয় অত্যন্ত প্রকট। অথচ তা-ত তাঁর আত্ম-গাপনের নীরব সাধনা সর্বত্র বিরাজমান। জগদীশচন্দ্র বসু-ক বি`ানসাধনার জন্য নি-বদিতার অনুলিপিক-রর ভূমিকা -থ-ক দী-নশচন্দ্র -স-নর বাংলা ভাষা ও সাহি-ত্যর ইতিহা-সর ইং-রজি তর্জমা কর-ত গি-য় সং-শাধ-কর পরিচয় স-ব-তই দেশজ মূল্যবোধে প্রখর সচেতনতা বর্তমান। বিদেশিদের কাছে স্বদেশের ঐতিহ্যকে তুলেধরার ক্ষেত্রে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি-তই -দশঅন্তপ্রাণ প্রকৃতিটি সবুজ হ-য় ও-ঠ। -সখা-ন রামপ্রসা-দর গান -থ-ক রবীন্দ্রনা-থর -ছাটগল্প (‘‘কাবুলিওয়ালা’) সবেতেই তাঁর অনুবাদ সক্রিয়তা লাভ ক-র-ছ। দী-নশচন্দ্র -স-নর বাংলা সাহি-ত্যর ইতিহা-স ধনপতির গ-ল্প নিরপরাধী খুল্লনার শাস্তিবিধা-ন -দ-শর বিচারব্যবস্থার প্রতি -হয় মানসিকতা -জ-গ ওঠার জন্য তা সং-শাধ-ন নি-বদিতার দৃঢ় মনোভাব সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এজন্য -দশজ রীতিনীতি তিনি মান-ত চাই-তন না। দী-নশচন্দ্র -সন তাঁর ‘‘ঘ-রর কথা ও যুগসাহিত্য’ গ্রন্থে খুল্লনার বিচার নিবেদিতার উক্তি স্মরণ করেছেন : ‘‘এ -কমন সমাজ ? আপনার গ-ল্প যদি একথা থা-ক, ত-ব পৃথিবীর -লাক এটা-ক ‘‘কাজির বিচার’’ ব-ল আপনা-দর ঠাট্টা কর-ব --- -না -না -না একথা আপনি রাখ-ত পার-বন না, গল্প হ-ত এটি -ছঁ-ট -ফলুন।’ অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে নি-বদিতার আত্মস-চতন প্রকৃতি-ত -কা-নারকম অনধিকার চর্চার অবকাশ ছিল না। দী-নশচন্দ্র -সন-ক অনায়া-সই তিনি ব-ল-ছন, ‘‘ওটি আপনার ক্ষেত্র নহে’। একইভা-ব নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার

হালদার-ক রাজনীতি -থ-ক বিরত থাকার কথায় বারবার স-চতন ক-র দি-তন নি-বদিতা। যা-ত -কা-নাভা-ব তাঁ-দর জাতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্য রক্ষার ব্রতে বিপত্তি দেখা না দেয়। শুধু তাই নয়, প্র-য়াজন-বা-ধ নি-বদিতা রীতিম-তা তর্ক কর-তন, স্বকীয় ধারণাকে প্রতিপন্ন করায় সক্রিয় হতেন। রামানন্দ চ-ট্টাপাধ্যায় তা অকপ-ট স্বীকার ক-র-ছন। চিত্রশিল্পে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদা-রর -দশীয় শি-ল্পর পরিচ-য় নি-বদিতার মূল্য-বাধ আজ অনস্বীকার্য।

দেশের বিচিত্র ক্ষেত্রে নিবেদিতা নিজেকে সামিল করে যেভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে যে তাঁর দেশঅন্তপ্রাণের চেতনা সক্রিয় ছিল, তাও অকপ-ট প্রস্ফুটিত হ-য়-ছ। তাঁর সাহা-য্য জগদীশচন্দ্র বসুর অসংখ্য গ-বষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হ-য়-ছ। যথা, ‘‘Living and Non-living’, ‘‘Plant Response’, ‘‘Comperative Electro-physology’, ‘‘Irritability of Plants’ প্রভৃতি। সেক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের বি'ানসাধনার ম-ধ্য তিনি -দ-শর -সবা-ক খুঁ-জ -প-য়ছি-লন। -সখা-ন তাঁর নীরব সাধনার উদার হাতছানি আপনা-তই আ-বদনক্ষম হ-য় ও-ঠ । তাঁর কথায়, ‘‘I feel that his success is his country’s success, his struggle, India’s struggle.’ লক্ষণীয়, সেখানে জগদীশচন্দ্রের সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত থেকেও নিবেদিতা তাঁর সাফল্যের গৌরবের মধ্যে নিজেকে খুঁ-জ না ফি-র দেশের সঙ্গে সরাসরি অন্বিত করেছেন। অথচ জগদীশচ-ন্দ্রর সাফ-ল্য নি-জর সাফ-ল্যর ম-নাভা-বও হীনতা-বা-ধর পরিচয় ছিল না, বরং তা-ত তাঁর উদারতার পরিচয়ই প্রকট হ-য় উ-ঠ-ছ। তাঁর নির্মোহ নিরাসক্ততায় ব্যক্তিগত সদিচ্ছার কোনো স্থান নেই। সর্বত্রই তাঁর দেশ ও দেশের মানুষ। -সদিক -থ-ক শুধু জগদীশচ-ন্দ্রর আত্মপ্রতিষ্ঠার -সাপা-ন নি-বদিতার অবিসংবাদিত ভূমিকার জন্যই তাঁ-ক ভারতবন্দিত ম-ন হয়। তাঁর সেই উদাত্ত প্রতিশ্রুতি লিজেল রেমেঁর বর্ণনায় পাঠকম-ন দীপিত পরিসর তৈরি ক-র। মনের সেই অব্যক্ত কথাকে ব্যক্ত করা দায় নিয়ে সেদিন নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রকে আশ্বস্ত ক-রছি-লন : ‘‘নিবেদিতা উত্তর দিলেন, আমি -তা আছি। আমার কলম অনুগত ভৃ-ত্যর ম-তা -তামার কাজ কর-ব। ম-ন ক-রা এ -লখা -তামারই।’ -সদিক -থ-ক নি-বদিতা শুধু কথা রা-খননি, সর্ব-তা ভা-ব জগদীশচন্দ্র-ক সাহায্য ক-রছি-লন। -দ-শর -সই সাফল্য ও সমৃদ্ধি-ক রক্ষা করার জন্য নি-বদিতার মাতৃ-ত্বর নীরব অথচ কঠিন সাধনা আপনা-তই সচকিত ক-র -তা-ল। আত্মত্যা-গর মাতৃমহিমায় তা প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অথচ -সসব তাঁর অন্তরা-ল আত্ম-গাপন ক-র থাকায় তা সাধার-ণ্য অনা-লাকিত র-য় -গ-ছ। তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তা কত দেশাত্মবোধে প্রাণিত ছিল, তার পরিচয়ও সেখানে সংগুপ্ত থেকে গেছে। শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে নিবেদিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরিসরেও সেগুলি অব্যক্ত থাকার কথা স্মরণ করি-য় দি-য়-ছন। তাঁর কথায় : ‘‘সব জড়ি-য় সামাজিক জীব-ন তাঁর ব্যাপক ও গভীর ভূমিকার কথা এখা-ন আ-ছ। লক্ষণীয়, এইসব রচনার ম-ধ্য তাঁর রাজনৈতিক জীব-নর কথা -নই, যার কিছুটা কলম খু-লছি-লন র‍্যাটক্লিফ ও -ব্লয়ার প্রমুখ ইং-রজ বন্ধুরা। আর -নই জগদীশচন্দ্র বসুর বি'ানসাধনায় তাঁর নিরন্তর সাহা-য্যর কথা, যা মেলে তাঁর চিঠিপত্র ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ চ-ট্টা- পাধ্যা-য়র পরবর্তী রচনায়, ডঃ বসুর চিঠিতে ও অন্যান্য সূত্র থেকে। নি-বদিতা চাননি তাঁর ম-তা পুলি-শর স-ন্দহভাজন মানুষ বসুর বি'া-ন সহায়তা ক-র-ছন, একথা প্রচারিত -হাক, তাহ-ল বসুর বি'ান সরকারি -কা-প বিপন্ন হবার সম্ভাবনা ছিল।’ -সদিক -থ-ক নি-বদিতার আত্ম-গাপ-নর মাহাত্ম্য প্রকৃতি -যমন সবুজ হ-য় ও-ঠ, -তমনই তাঁর ‘‘পুলি-শর স-ন্দহভাজন মানুষ’-এর মধ্যে তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক বিপ্লবী প্রকৃতিও সজীবতা লাভ ক-র। অথচ সেক্ষেত্রে স্বীকারের মাহাত্ম্য অস্বীকারে শুধু উপেক্ষিত হয়নি, বিত-র্কর অবকা-শ তার ভূমিকাটি স-ন্দ-হর অবকা-শ অবমূল্যায়নের দ্বারকে মুক্ত করে তুলেছে। নি-বদিতার ভাবমূর্তি-ত -সই অবমূল্যায়-নর ধারা

আজও অব্যাহত। অন্যদিকে তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের নির্লিপ্ত প্রকৃতিও তাঁকে সাধারণ্যে প্রকা-শর অভিমু-খ অন্তরায় সৃষ্টি ক-র-ছ।

নি-বদিতা এ-দ-শ এ-সছি-লন সম্পূর্ণ স-চতন ভা-বই। -সখা-ন আ-ব-গর বশবর্তী হ-য় প্রাণজুড়া-নার তাগিদ ছিল না, ছিল স-চতন ল-ক্ষ্য নি-জ-ক খুঁ-জ -ফরা। আর তার পথপ্রদর্শক হিসা-ব স্বামীজির ভূমিকা নিঃস-ন্দহে তাঁর চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে নিবেদিতার মতো সুশিক্ষিতা ঋজু ব্যক্তিত্বের প্রতিভাদীপ্ত শিষ্যার প্রতি স্বামীজির শ্রদ্ধা-বাধ ছিল আজীবন। সেইসঙ্গে তাঁর প্রতি গুরুসুলভ আধিপ-ত্যর রাশ কখনও সুদৃঢ় হয়নি। বরং তাঁকে মুক্ত থাকার প্রতিশ্রুতি-তও আপনার ক-র নি-য়ছি-লন তিনি। -সকথা এদেশে আসার আমন্ত্রণপত্রেও লক্ষণীয়। আল-মাড়া -থ-ক ১৮৯৭-এর ২৯ জুলাই-এ -লখা চিঠি-ত স্বামীজি পরিষ্কার ক-র জানি-য় -দন : ''ক-র্ম ঝাঁপ -দবার পূ-র্ব বি-শষভা-ব চিন্তা ক-রা এবং কাজের পরে যদি বিফল হও কিংবা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে, ত-ব আমার দিক -থ-ক নিশ্চয় -জ-না -য, আমা-ক আমরণ -তামার পা-শই পা-ব---তা তুমি ভারতব-র্ষর জন্য কাজ কর আর নাই কর, -বদান্ত-ধর্ম ত্যাগই কর আর ধ-রই রা-খা। ''মরদ কি বাত হাতি কা দাঁত'--- একবার -বরু-ল আর ভিত-র যায় না ; খাঁটি -লা-কর কথারও -তমনি নড়চড় -নই---এই আমার প্রতি'া।' স্বামীজি -সকথা আজীবন রক্ষা ক-র গি-য়-ছন। শুধু তাই নয়, তাঁর নি-বদিতা-ক অনুশাস-নর -বড়ি-ত -বঁ-ধ লক্ষ্যাভিমুখী চলার ব্র-ত সামিল করার ক্ষেত্রেও কোনোরকম প্রয়াসী হননি। -সদিক -থ-ক নিবেদিতার স্বচ্ছন্দ জীবনের মুক্ত পরিসরই তাঁকে চিত্ত সংযমে সক্রিয় করে তুলেছিল। ১৮৯৯-এর ১ -ম মিস ম্যাকলাউড-ক -লখা চিঠি-ত নি-বদিতা জানি-য়-ছন : ''আমি তাঁ-ক (স্বামীজি-ক) জি'াসা করলাম, সন্ন্যাসিনী হতে গেলে কি ধরনের উন্নতি প্রয়োজন ? উত্তরে দ্রুত বল-লন, ''তুমি -যমন আছ, -তমনই থাক।' ফ-ল আমার ইচ্ছা রুদ্ধ হ-য় -গল চিরত-র। তবু আমি অতি সতর্কভা-ব বার করবার -চষ্টা করতাম, আমার ঘু-র -বড়া-না, নানাজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, এসব তাঁর -চা-খ -দা-ষর জিনিস কি না, -যটা আমার কা-ছই অনুচিত ব-ল ম-ন হ-ত শুরু ক-র-ছ। তিনি জানা-লন, না, তা নয়। সুতরাং -সই সন্ধ্যা-তই আমি বসু-দর (জগদীশচন্দ্র) জানালাম, আমি শুক্রবার-শুক্রবার আসতে থাকব, যদি তাঁরা চান।' নিবেদিতার প্রতি স্বামীজির অবাধ স্বাধীনতা যেমন তাঁকে দেশসেবার বিস্তৃত ক্ষেত্রে সক্রিয় হওয়ার অবকাশ দি-য়ছিল, -তমনই -দ-শর -সবায় আত্মসমাহিত করার নীরব সাধনার পথ-কও প্রশস্ত ক-র তু-লছিল। পথের বাধা শুধু বিকল্প পথের ক্ষেত্রপ্রস্তুত করে না, অতিক্রমের প্রতিস্পর্ধাও সরবতার আধার হ-য় ও-ঠ। স্বামীজির কা-ছ -সই অবাধ স্বাধীনতা-ত নি-বদিতার সরবতার পরিসর আপনা-তই নীরবতা পালন ক-র-ছ। অন্যদি-ক -সই নীরবতাই তাঁ-ক আরও সংযমী, আরও আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ক-র তু-লছিল এবং তা তাঁর আত্ম-গাপন প্রকৃতি-ক সবুজ ক-র তু-ল-ছ। প্রথম -থ-কই স্বামীজি নি-বদিতার প্রতি গভীর আস্থাশীল ছি-লন। তাঁ-ক দি-য় তিনি ১৮৯৯-এর ১৩ -ফব্রুয়ারি কলকাতার অ্যালবার্ট হ-ল ''কালী ও কালীপূজা' বিষয়ে বক্তৃতা করিয়ে রক্ষণশীল সমা-জর উন্নাসিকতায় ঘা দি-য়ছি-লন। আবার -সবছর ৮ -ম কালীঘা-টর মন্দি-রও ''কালীপূজা' সম্ব-ন্ধ নিবেদিতার বক্তৃতার আ-য়াজন হ-য়ছিল। অন্যদি-ক ১৮৯৯-এ প্লেগের আক্রমণ প্রতিরো-ধ স্বামীজি নি-বদিতা-ক সমস্ত ভার অর্পণ ক-রন। রামকৃষ্ণ মিশ-নর গঠিত কমিটির সম্পাদিকার দায়িত্বভার কাঁ-ধ নি-য় নি-বদিতা অমানুষিক পরিশ্রমই শুধু নয়, নি-জ-ক সর্মপণ ক-র দি-য় -রাগীয় -সবায় আত্মনি-য়াগ ক-রছি-লন। এভা-ব ধর্মীয় পরিস-র নি-বদিতার অধিকার-ক সম্প্রসারিত ক-র -তালার ম-ধ্যই স্বামীজি তাঁর সু-যাগ্যা শিষ্যার অগ্রণী ভূমিকা-ক নিবিড় ক-র তুল-ত -চ-য়ছি-লন। অথচ এই ধর্মীয় ক্ষেত্রে রক্ষণশীল হিন্দুমানসে নিবেদিতার প্রতি বিমুখতা স্বাভাবিক হ-য় উ-ঠছিল।অন্যদিকে সঙ্ঘের যোগসূত্র আপাতভাবে বিচ্ছিন্নতাবোধে তাঁর প্রতি উচ্চকিত ধারণা বিকশিত হ-ত পা-রনি। এছাড়া নি-বদিতার প্রখর আত্মসচেতন রূঢ় ব্যক্তিত্বও

তাঁর জনপ্রিয়তার প্রসা-র অন্তরায় সৃষ্টি ক-রছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর সেই সুদৃঢ় প্রদীপ্ত ব্যক্তিত্ব আত্মস্থ করা কত কঠিন, তা রবীন্দ্রনাথ -থ-ক অ-ন-কই স্মরণ ক-র-ছন।

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল স্বামীজির নিবেদিতা হয়ে উঠলেও তাঁর প্রকট ব্যক্তিত্বের ছায়ায় প্রশান্তির -চ-য় দৃঢ়-চতা উষ্ণ আবহ অমলিন ছিল। -সখা-ন দীন-হীন প্রকৃতির অসহায়তা-বা-ধর -কা-না স্থান -নই, সর্বদা বলিষ্ঠতায় আত্মপ্রত্যয়ী পরিসর হাতছানি দি-য় চ-ল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নি-বদিতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময়ের অভি'তায় তার পরিচয়-ক তাঁর ''ভগিনী নি-বদিতা' নিব-ন্ধর সূচনা-তই স্মরণ ক-র-ছন। তাঁর কথায় : ''ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি অল্পদিনমাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত ইং-রজ মিশনারি মহিলারা -যমন হইয়া থা-কন ইনিও -সই -শ্রণীর -লাক, -কবল ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।

-সই ধারণা আমার ম-ন ছিল বলিয়া আমার কন্যা-ক শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহা-ক অনু-রাধ করিয়াছিলাম। তিনি আমা-ক জি'াসা করি-লম, তুমি কী শিক্ষা দি-ত চাও? আমি বলিলাম, ইং-রজি, এবং সাধারণত ইং-রজি ভাষা অবলম্বন করিয়া -য শিক্ষা -দওয়া হইয়া থা-ক। তিনি বলি-লন, বাহির হই-ত -কা-না একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কী? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বি-শষ ক্ষমতারূ-প মানু-ষর ভিত-র -য জিনিসটা আ-ছ তাহা-ক জাগাইয়া -তালাই আমি যথার্থ শিক্ষা ম-ন করি। বাঁধা নিয়-মর বি-দশী শিক্ষার দ্বারা -সটা-ক চাপা -দওয়া আমার কা-ছ ভা-লা -বাধ হয় না।' উদ্ধৃতির পরিমাণ না বাড়ি-য়ও -সদিন রবীন্দ্রনা-থর বিরূপ অভি'তা সহ-জই অনু-ময়। বিফল ম-নার-থ -সদিন তাঁ-ক ফি-র আস-ত হ-য়ছিল। অথচ -সদিনই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি ক-রছি-লন নিবেদিতার প্রখর ব্যক্তিত্ব, অত্যন্ত আত্মস-চতন প্রতিভাময়ী অনন্যার। অন্য মিশনারি-দর -থ-ক তাঁর আদর্শনিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী প্রকৃতিকে সেদিন সাইত্রিশ বছরের রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবেই চিনে নিয়েছি-লন। এ-কারণে নিবেদিতার প্রবল ব্যক্তিত্বের অপরা-জয় চলিষ্ণুতার প্রতাপ জনমান-স কীভা-ব অপ্রতি-রাধ্য বিমুখতায় সক্রিয়তা লাভ করে, -স-সম্প-র্কও রবীন্দ্রনাথ স-চতন ক-র তু-লছি-লন। তাঁর কথায় : ''তাঁহার সর্ব-তামুখী প্রতিভা ছিল, সেইসঙ্গে তাঁহার আর-একটি জিনিস ছিল ; -সটি তাঁহার -যাদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং -সই বল তিনি অ-ন্যর জীব-নর উপর একান্ত -ব-গ প্র-য়াগ করি-তন---মন-ক পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার ম-ধ্য কাজ করিত। -যখা-ন তাঁহা-ক মানিয়া চলা অসম্ভব -সখা-ন তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নি-জর দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্ত-রর ম-ধ্য আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। -স -য ঠিক অনৈ-ক্যর বাধা তাহা ন-হ, -স -যন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।'

আসলে নিবেদিতার সনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রবল আধিপত্যে শুধু অসাধারণত্ব নেই, সেইসঙ্গে তার যুদ্ধং -দহি সংসশপ্তক প্রকৃতি বর্তমান। তারফ-ল তাঁর অসাধারণত্ব ব্যতিক্রমী -চতনায় দূ-র স-র গি-য়-ছ। সাধার-ণ্য অসাধারণত্ব -যভা-ব শ্রদ্ধা লাভ ক-র আপনার সমন্ব-য় জনপ্রিয়তা লাভ ক-র, ব্যতিক্রমে শ্রদ্ধা সহজলভ্য হ-লও সমন্ব-য়র অভাব স্বাভাবিক হ-য় ও-ঠ। নিবেদিতা সেই ব্যতিক্রমে শুধু অনন্যা নয়, জনমান-স অ-সতুসম্ভব সম্প-র্কর বিস্ময় হ-য় -থ-ক-ছ, আপনার জ-নর সমাদ-র অধরামাধুরী হ-য় র-য় -গ-ছ। তাঁর জনসমাদ-র ধন্য না-হওয়ার ক্ষেত্রে স্বকীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে স্বামীজির আদর্শও যুক্ত হয়েছিল। ১৮৯৯-এর ৯ অক্টোবর মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা স্বামীজির ''তিতিক্ষা অভ্যাস ক-রা'র আদ-র্শ ''মানু-ষর অর্থহীন স্তুতি ও নিন্দা-ক ঘৃণা' করার কথা স্মরণ ক-র-ছন। তাছাড়া স্বামীজির আদর্শ-বা-ধও ছিল ব্রত উদযাপ-ন সৈনি-কর ম-নাভাব। নি-বদিতা-কও -সকথা স্মরণ করি-য়

দি-য়ছি-লন। সেখানে নিবেদিতার মনোভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ যা লক্ষ করেছিলেন, বি-বকান-ন্দর আদ-র্শ তাই ছিল সাধনার পথ। ১৯০০-এর ২৬ -ম ভগিনী নি-বদিতা-ক -লখা চিঠি-ত বি-বকানন্দ স্মরণ করি-য় দি-য়-ছন : ''ক্ষত্রিয়শোণি-ত -তামার জন্ম। আমাদের অঙ্গের গৈরিক বাস তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা। ব্রত উদ্‌যাপ-ন প্রাণপাত করাই আমা-দর আদর্শ, সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হওয়া ন-হ।' সেক্ষেত্রে নিবেদিতার ব্রতের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন বলে, তাঁর পক্ষে সাধনক্ষেত্রে প্রসাধনের কোনোরকম কৃত্রিম সং-যাগ ছিল না। এজন্য -সবা কর-ত গি-য় শুধু -সবিকার ভূমিকা-ক বিস্তা-র আন্তরিক হননি, একাত্মতায় আত্মীয় হ-য় উ-ঠ-ছন। স্বাভাবিকভা-ব -সবিকার প্রতি সহ-জই দৃষ্টিনিবদ্ধ হ-য় প-ড়, কিন্তু আত্মীয়তার উপলব্ধি-তই সাধার-ণ্য ফাঁক -থ-ক যায়। -স ফাঁক পূর-ণ নি-বদিতার বিন-য়র অভিনয় ছিল না, ছিল অকৃত্রিম আন্তরিকতার আত্মিক পরশ যা সাধার-ণ্য সম্প্রসারিত হয়নি। অন্যদি-ক ত্যাগ ও -সবার আদর্শে মোড়া জীবনে নির্মোহ ও নিরাসক্ত থাকার ব্রতে নিবেদিতার আদর্শের পরাকাষ্ঠা ব্যতিক্রমিতায় শুধু উ-পক্ষিত হয়নি, সেইসঙ্গে দেখনদারির আতিশয্যবোধে তা বিমুখতায় বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। রবীন্দ্রনা-থর ''-গারা' উপন্যা-সর গোরা চরিত্রে তার প্রতিফলন লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনা-থর -গারা আইরিশ সন্তান। নি-বদিতা আইরিশ কন্যা। দুজ-নই -দশ-প্র-ম নি-বদিত প্রাণ। এই দুই আধা-র -গারায় নি-বদিতার ছায়ার কায়ায় বিতর্ক স্বাভাবিক হ-য় উ-ঠ-ছ। রবীন্দ্র-জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়ে দেন : ''স্বামী বি-বকান-ন্দর বাণী-ত হিন্দুত্ব ও জাতীয়তা সমন্বিত হইয়াছিল ; তিনি -য হিন্দুভারত-ক সুমহান করিয়া -দখিয়াছি-লন তাহা -য কতখানি বাস্তবতাবর্জিত তাহা তাঁহার অকালমৃত্যু-হতু তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইবার অবকাশ পায় নাই। তাঁহার আদর্শায়িত হিন্দুসমা-জর সাধ্য ছিল না -য আইরিশ মহিলা মিস্ মার্গা-রট -নাবল-ক ''ভগিনী নি-বদিতা' আখ্যা দিয়া হিন্দুসমাজের কোন্ পর্যায়ে কণামাত্র স্থান করিয়া দি-ত পা-র। সনাতন ব্রাহ্মণ-ত্বর সংস্কার বর্জন না করিয়া -কান ব্রাহ্মসমা-জর প-ক্ষ সন্ন্যাসিনী নি-বদিতার সহিত পংক্তিভোজন করাও অসম্ভব ছিল। গোরা চরিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ও নিবেদিতার মিশ্রিত স্বভাবকে পাই বলি-ল আশা করি -কহ আঘাত পাই-বন না। নি-বদিতার প-ক্ষ হিন্দু হওয়ার অসম্ভবত্ব কল্পনা করিয়াই রবীন্দ্রনাথ -যন আইরিশম্যানের পুত্র গোরাকে উপন্যা-সর নায়করূ-প সৃষ্টি করি-লন। মিস্ -না-বলও জাতি-ত আইরিশ।' স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে বিতর্কের পরিসরে না গিয়ে শুধুমাত্র নিবেদিতার প্রসঙ্গটি লক্ষ করলেই একথা সহ-জই অনু-ময়, হিন্দু ও ব্রাহ্ম -কা-না সমা-জই নি-বদিতার বিস্তার সহজসাধ্য ছিল না। সর্বত্র ধর্মীয় প্রাচী-রর বাই-র তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় আড়াল হয়ে থেকেছে। শুধু তাই নয়, -গারা ম-তা ধর্মীয় -চতনার উগ্র আড়ম্ভ-রর ব্য''নার -নতিবাচকতায় নি-বদিতা-ক মিলি-য় -দখার বাতিক বিত-র্কর পরিস-র আরও তাঁর জনবিমুখতাকে সক্রিয় করে রেখেছিল। অন্যদিকে গোরার সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক বিষয়ে উইনস্ট্যানলি পিয়ার্সন-ক রবীন্দ্রনাথ যা ব-লছি-লন, তা-ত -সই সম্পর্ক স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু নিবেদিতাকে রবীন্দ্রনাথ গোরা সম্পর্কে জানিয়েছিলেন । তাতে বিদেশি হওয়ায় জন্য গোরার সঙ্গে সুচরিতার সম্পর্ক -ভ-ঙ যাওয়ার বিষয়টি-ক নি-বদিতা -ম-ন নি-ত পা-রনি। উপন্যাসটি অবশ্য -গারা ও সুচরিতার মিল-নই -শষ হ-য়-ছ। সেক্ষেত্রে জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর ''-গারা ও বি-বকানন্দ'(''শনিবা-রর চিঠি', বৈশাখ ১৩৭০) প্রব-ন্ধ -গারার ম-ধ্য নি-বদিতার পরিচয়-ক অস্বীকার কর-লও ''-গারা ও সুচরিতার গুরু-শিষ্য সম্পর্কটি বি-বকানন্দ ও নি-বদিতার সম্প-র্কর আদ-ল গ-ড় উ-ঠ-ছ কি না' -স-বিষয়টি প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। -সদিক -থ-ক নি-বদিতা-ক নি-য় বিত-র্কর পরিসর শ্রীবৃদ্ধি লা-ভ ক্ষেত্রপ্রস্তুত হওয়ায় তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবমূর্তিও জনসমাদরে আদৃত না হয়ে রহস্যের ঘেরাটোপে বন্দি হ-য় প-ড়-ছ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনা-থর ''-গারা' উপন্যাসের গোরা চরিত্রে স্বামী বি-বকানন্দ ও নি-বদিতা ব্যতীত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও স্বয়ং ঔপন্যাসি-কর ছায়াও বিত-র্কর পরিস-র উ-ঠ এ-স-ছ।

অন্যদি-ক ''-গারা' ব্যতীত রবীন্দ্রনা-থর ''চার অধ্যায়'(১৯৩৪) পর্যন্ত আটটি উপন্যা-সর ম-ধ্য পাঁচটি-তই স্বামীজি ও নি-বদিতার অনুষঙ্গের কথা সমালোচনায় উঠে এসেছে। ''চার অধ্যায়'-এর -শ-ষর দি-ক এলার সংলা-প (''অন্তু অন্তু আমার, আমার রাজা, আমার -দবতা, -তামা-ক কত ভা-লাবাসি, আজ সম্পূর্ণ ক-র তা জানা-ত পারলাম না। -সই ভা-লাবাসার -দাহাই, মা-রা, আমা-ক মা-রা।') নিবেদিতার গুরুভক্তি মিলি-য় -দখার প্রয়াস বর্তমান। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, নি-বদিতা স্বামীজি-ক ''গুরু', ''রাজা' নানাভা-ব অভিহিত ক-র-ছন। সেদিক থেকে মাত্র চার বছরের ছোট-বড় গুরু-শি-ষ্যর -যৌব-নর অপরূপ রূপ-সুধা সমন্বিত মানবিক বিভূতির ম-ধ্যও দুজ-নর সম্প-র্কর প্রতি -কৌতূহলী রহস্য নানাভা-ব বিকশিত হ-য়-ছ। তার ফলেও নিবেদিতার মহত্ত্বের আবেদন সেই রহস্যবোধে পীড়িত হওয়ায় জনসমাদ-র ধন্য হওয়ার অবকা-শ অন্তরায় সৃষ্টি ক-র-ছ। নিবেদিতার প্রতিভাময়ী যৌবনশ্রীমণ্ডিতা প্রকৃতি নি-য় চর্চার পরিসর -থ-ম থা-কনি। রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর ''কবি ও কর্ম-যাগী : রবীন্দ্রনাথ ও বি-বকানন্দ' (''-কারক', বি-বকানন্দ সংখ্যা ১৪১৩) নিব-ন্ধ -সই চর্চার কথা স্মরণ ক-র-ছন। তাঁর কথায় : ''নি-বদিতা যখন ভার-ত এ-স -পৌঁছা-লন তখন তাঁর বয়স ৩১, বি-বকান-ন্দর ৩৫, রবীন্দ্রনাথের ৩৭। তিনজনেই মনস্বী ব্যক্তিত্ব। দুই পুরুষ মহাব্যক্তিত্বের মাঝে এক নারী নিবেদিতা। না, তথাকথিত ওসব কিছু নয়, মাপ কর-বন । তথাপি -জায়ার-ভাঁটার ম-তাই দুটি প্রতিভার আকর্ষণ-বিকর্ষণ -যন অনিবার্য।' অর্থাৎ নি-বদিতার নারী প্রকৃতির বিভূতি -যখা-ন অসাধারণ-ত্ব জনসমাদ-র ধন্য হওয়ার অবকাশ ছিল, তাই রহ-স্যর পরিস-র অন্তরা-ল -থ-ক -গ-ছ। সেক্ষেত্রে স্বামীজির মানবিক অস্তিত্ব -যভা-ব ধর্মীয় -চতনায় সম্প্রসারিত হ-য়-ছ, নি-বদিতার ধর্মীয় অস্তিত্ব মানবিক -চতনায় সংকীর্ণ হ-য় প-ড়-ছ। অথচ নি-বদিতাই স্বামীজির ধর্মীয় অস্তিত্ব-ক উৎকর্ষমুখর করায় আজীবন ব্রতী ছি-লন। অন্যদি-ক নি-বদিতার মহতী পরিচয় সাধার-ণ্য সমাদৃত না-হ-য় ওঠার -নপ-থ্যও র-য় -গ-ছ তাঁর স্বামীজি-ত আত্মনি-বদিত প্রকৃতি। এজন্য শিষ্যার প্রতি গুরুর অকুণ্ঠ আশীর্বাদ ও গভীর শ্রদ্ধাপ্রসূত প্রত্যয় ঝ-র প-ড়-ছ। স্বামীজি নি-বদিতা-ক নি-য় -য-দুটি কবিতা (Peace J A Benediction) রচনা ক-র তাঁ-ক উপহার -দন, তার ম-ধ্যই শি-ষ্যর প্রতি গুরুর অপার আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। অবশ্য আরও একটি কবিতার হদিশ -ম-ল। ১৯০০-এর ৩ জানুয়ারি-ত স্বামীজি-ক -লখা নি-বদিতার চিঠির সূচনাবা-ক্য (''গতরাত্রে আপনার প্রেরিত আমার জন্মদি-নর কবিতাটি -প-য়ছি।) তার অস্তিত্ব বর্তমান। যাই-হাক, অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেরিকার রিজলি ম্যানরে অবস্থানকালে নিবেদিতা পরিচ্ছেদ গ্রহ-ণর মাধ্য-ম নি-জ-ক সঁ-প -দওয়ার পরিচ-য় প্রীত হ-য় ১৮৯৯-এর ২১ -স-প্টম্বর স্বামীজি শান্তিকামী শিষ্যা-ক প্রথম কবিতাটি রচনা ক-র দিশা -দখি-য়-ছন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার অনুবাদে -সই ''শান্তি' কবিতায় স্বামীজি আত্মত্যা-গর -সাপা-ন শান্তির পরিচয়-ক নিবিড় ক-র -তা-লন : ''যার লা-গ অশ্রুজল ঝ-র, / স্মিত হাসি বিলাবার ত-র, / জীব-নর লক্ষ্য সুনিশ্চিত--- / শান্তি এর একান্ত আশ্রয়।' -সই শান্তির দুর্গম প-থ নি-বদিতার সহজ-সুন্দর অভিযানই ব-ল -দয় তাঁর গভীর নিষ্ঠা ও সততার প্রতি দায়বদ্ধতা কত আন্তরিক, কত আত্মপ্রত্যয়ী নীরব সাধনাপ্রসূত। ঠিক এক বছর প-র স্বামীজিই তার অভিব্যক্তিতে সেকথা প্রত্যয়সিদ্ধ করে তুলেছেন। নারায়ণী -দবী কৃত অনুবা-দ প-রর কবিতা ''আশীর্বাণী'র (রচনা ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০০) শেষে গুরু সেই অভিব্যক্তি ঝরে পড়েছে : ''অনাগত ভার-তর -য-মহামানব, / -সবিকা, বান্ধবী, মাতা ; তুমি তার সব।' অথচ নি-বদিতা তাঁর ভগিনীর ছায়ায় জনমান-স -যভা-ব বিস্তৃত হ-য়-ছন, মাতৃ-ত্বর কায়ায় -সভা-ব সমাদর লাভ ক-রননি। অথচ আত্মগত ভা-বই তিনি মাতৃ-ত্বর আস-ন নি-জ-ক সঁ-প দি-য়ছি-লন। শুধু তাই নয়, -সই আত্মার সম্প-র্ক ন্যূনতম সম্ভ্র-মর দূরত্ব বজায় রাখ-তন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ''-লাকমাতা' সম্প-র্ক অকপ-ট সাক্ষ্য দি-য়-ছন।

আস-ল নি-বদিতা -দ-শর জনগ-ণর ম-ধ্য -দশ-ক খুঁ-জ -দখ-তন। -সদিক -থ-ক এ-দ-শর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-বাধ জনগণের মধ্যেও সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। -সখা-ন নররূ-প নারায়ণ-সবার ব্রত আত্মিকভা-ব আন্তরিক হ-য় উ-ঠছিল। নি-বদিতার -সই -দশব্রতী প্রকৃতি সম্প-র্ক রবীন্দ্রনাথ -য গভীর মূল্যায়ন ক-র-ছন, তা-তই তাঁর পরিচয় নিবিড় হ-য় ও-ঠ। তাঁর কথায় : ''-য -লাক -দ-শর প্র-ত্যক -লা-কর ম-ধ্য সমগ্র -দশ-ক -দখি-ত পায় না, -স মু-খ যাহাই বলুক -দশ-ক যথার্থভা-ব -দ-খ না। ভগিনী নি-বদিতা-ক -দখিয়াছি তিনি -লাকসাধারণ-ক -দখি-তন, স্পর্শ করি-তন, শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে ম-ন ভাবি-তন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটিরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমানরমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়া-ছন -দখিয়াছি, সামান্য -লা-কর প-ক্ষ তাহা সম্ভবপর ন-হ---কারণ ক্ষুদ্র মানু-ষর ম-ধ্য বৃহৎ মানুষ-ক প্রত্যক্ষ করিবার -সই দৃষ্টি, -স অতি অসাধারণ। -সই দৃষ্টি তাঁহার প-ক্ষ অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতব-র্ষর এত নিক-ট বাস করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।' -স-ক্ষত্রে অবশ্য স্বামীজির ভূমিকাও স্মরণীয়। তিনি তাঁর শিষ্য-ক ''ভারতবাসীমাত্রই ঋষির সন্তান'-এর কথা ভা-লা ভা-বই বুঝি-য়ছি-লন। -য-কার-ণ -দ-শর সাধারণ মানু-ষর প্রতি নি-বদিতার অপরিসীম শ্রদ্ধা-বাধ আত্মিকতায় আপনার হ-য় ও-ঠ। বাংলার দীন-দুঃখী মেয়ের করুণ প্রকৃতিতে তাঁর অভিব্যক্ততে শুধু সহানুভূতি -নই, র-য়-ছ আত্মিক -যাগও। ১৮৯৯-এর মা-র্চ কলকাতার ভয়াবহ -প্ল-গর সময় নি-বদিতার মাতৃমূর্তির পরিচয় বিস্ময় সৃষ্টি ক-র। -সখা-ন আপনি আচরি প-র'-র -শখাও-এর আদ-র্শ তাঁর বাগবাজা-রর রাস্তার -নাংরা পরিষ্কা-রর জন্য ঝাড়ু--কাদাল নি-য় -ন-ম পড়ার কথায় বিস্মিত আচার্য যদুনাথ সরকার -ল-খন, ''নাগরিক জীব-ন স্বাবলম্বন শিক্ষার প্রথম পাঠ আমরা ভগিনী নি-বদিতার নিকট হই-তই পাইয়াছিলাম।' -সখা-ন -শষ নয়। -সই সম-য়র প্রত্যক্ষ অভি'তায় বিস্মিত স্বনামধন্য চিকিৎসক রাধা-গাবিন্দ কর নি-বদিতা অপরূপ মাতৃত্বের কথা তুলেধরেছেন। সন্তা-নর রক্ষা-হতু মাতৃ-ত্বর পরশ তাঁর সহজাত। এজন্য প্লেগে আক্রান্ত মা-মরা মুমূর্ষু শিশু-কও তিনি -সবা-যত্ন কর-ত বিরত হননি। মৃত্যুর পূ-র্ব শিশুটি তাঁ-কই ''মা মা' ব-ল মৃতুর -কা-ল -ঢা-ল প-ড়। অন্যদি-ক ১৯০৪-এ শিলাইদ-হ গ্রাম্য -ম-য়-দর -দ-খ তাঁর ম-ন হ-য়-ছ, ''এরা ঋষির -ম-য়, আমরাই এ-দর সুখী কর-ত পারিনি ।' আবার ১৯০৬-এ পূর্ববঙ্গের ভয়াবহ বন্যায় নিবেদিতার অসুস্থ ও দুর্বল শরীর নিয়ে বিপর্যস্ত মানু-ষর পা-শ দাঁড়া-নার অভি'তার বিবরণ -তা তাঁর -লখনী-তই ''মডার্ন রিভিউ'-ত আন্তরিক হ-য় উ-ঠ-ছ । -সখা-ন পর-ন কাপড় না থাকায় মহিলা-দর জ-ল দাঁড়ি-য় থাকার বীভৎসতাও তাঁর -লখনীর পর-শ আত্মিক সং-যাগ রক্ষা ক-র চ-ল। এই -সই নি-বদিতার ''আওয়ার পিপল', ''আওয়ার উই-মন'-এ হার্দিক বিস্তার আপনা-তই আত্মীয়তার সং-যাগ-ক নিবিড় ক-র -তা-ল। অথচ -সই নিবিড়তাও নি-বদিতা-ক আপনার ক-র -নয়নি, ঘ-রর মানুষ হ-ত চাই-লও তাঁ-ক পর ক-র রাখার বাতিক ভর ক-র-ছ। সেক্ষেত্রে তাঁর ত্যাগ ও সেবার আদর্শ সফল হলেও তার পরিসর সাধার-ণ্য আ-বদনক্ষম হ-য় ও-ঠনি। বরং সেই রিক্ততাবোধের মধ্যেও তাঁর নীরব সাধনা অগ্রসর হ-য়ছিল। -সখা-ন স্বামীজি-ত আত্মনিবেদিত নিবেদিতাই ক্রমে এ-দ-শর জন্য আতসমর্প-ণ সামিল হ-য়-ছন। গুরুর আকস্মিক মৃত্যু-ত শিষ্যার দায়-বাধ আরও তীব্রতা লাভ ক-র। -সজন্য তাঁর ম-ধ্য শূন্যতা-বাধই তাঁ-ক পূর্ণ ক-র -তা-ল। ১৯০৩-এর ২০ মে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে নিবেদিতা লিখেছেন : ''কিন্তু তাঁ-দর আমি ক্ষমা কর-ত পারি না ; ''তাঁ-দর' বল-ত---শ্রীমা, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজী। কিন্তু তাহ-লও, পৃথিবীর বিনিম-য়ও, আমি স্বামীজীর শান্তি বিঘ্নিত করব না। আমি শুধু তাঁর -বাঝা তাঁরই জন্য বই-ত -চ-য়ছি!---যদি আমা-ক স-র যাবার স্বাধীনতা -দওয়া হত! তুমি জা-না, আমি বিশ্বস্ত থাক-ত -চ-য়ছি। তাঁরা এক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য ক-র-ছ, ঠিকপ-থ রাখ-ত পার-তন। হাঁ, ঠিক, ত-ব কিনা আমা-ক -তা কখ-নাই ঠিকভা-ব চালা-না সহজ নয়।' অথচ তারপ-রও নি-বদিতা শুধু চ-লননি, নি-জ-কই চালি-য়-ছন

বৃহত্তর ও মহত্ত্বর পরিসরে। তিনি স্বামীজির ''-বাঝা' বই-ত গি-য় -দ-শর ভার লাঘ-ব -যভা-ব আমৃত্যু সক্রিয় থেকেছেন, তা-ক -কা-না দৃষ্টা-ন্তই সংকুলান করা সম্ভব নয়।

স্বামীজির আমন্ত্র-ণ সাড়া দি-য় নি-বদিতা যখন এ-দ-শ এ-সছি-লন, তখন তাঁর বয়স আঠাশ বছর। আর স্বামীজির মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স বত্রিশ বছর। -সদিক -থ-ক বয়-সর বি-শষ-ত্বই নি-বদিতার তখনও মুক্ত বিহঙ্গ। বাঁধনছিন্ন পরিস-র অনায়া-সই নি-বদিতা -দ-শ ফি-র -য-ত পার-তন। তাছাড়া তাঁর সমকালীন পরিস-র -য-ক-য়কজন স্বামীজির অনুরাগী ও অনুরাগিনী এ-দ-শ এ-সছি-লন, তাঁরাও স-ব সময়ান্ত-র -দ-শ ফি-র যান। -কউই তাঁর ম-তা স্থায়ী হননি। বি-শষ ক-র অকা-ল স্বামীহারা অগাধ বিত্তশালিনী সারা চ্যাপম্যান বুল তথা ''ধীরা মাতা', মিস -জা-সফীন ম্যাকলাউড তথা ''জয়া' প্রমু-খর দেশে ফেরার বিষয়টি নিবেদিতার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গতায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটা-না অত্যন্ত স্বাভাবিক। বি-দশ বিভুঁই-য় এভাবে সঙ্গিনীর অভাববোধ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। অন্যদি-ক স্বামীজির অকাল প্রয়া-ণ -সই নিঃসঙ্গতা আপনা-তই প্রকট হ-য় ও-ঠ। -সই নীড় ভাঙা পরিস-র তিনিও ইচ্ছা কর-লই -দ-শ ফি-র অন্যভা-বও -সবাকা-জ আত্মনি-য়াগ কর-ত পার-তন এবং তাঁর অফুরান প্রতিভায় নিষ্ঠা ও সততার মাধ্য-ম আত্মপ্রতিষ্ঠাও লাভ কর-ত পার-তন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমা-দর স্মরণ করি-য় দি-য়-ছন -সকথা,''তাঁহার সর্ব-তামুখী প্রতিভা ছিল'। তিনি আরও জানি-য়-ছন, ''এ কথা ম-ন রাখি-ত হই-ব ভগিনী নি-বদিতার -য ক্ষমতা ছিল তাহা-ত তিনি নি-জর -দ-শ অনায়া-সই প্রতিষ্ঠালাভ করি-ত পারি-তন।' -স -তা -গল তাঁর প্রতিভার আনুকূল্য। অন্যদি-ক এ-দ-শ তাঁর প্রতিকূলতাও স্বামীজির অবর্তমা-ন অনুকূল হ-য় উঠ-ব, তা সহ-জই অনু-ময়। আত্মীয়-স্বজন -ছ-ড় যাঁ-ক পরমাত্মীয়-বা-ধ আপনার ক-র নি-য়ছি-লন, -সই স্বামীজিও তাঁ-ক -ছ-ড় -গ-লন। অন্যদি-ক মঠ ও মিশনের সঙ্গেও তাঁর দূরত্ব -ব-ড় চ-ল। সেই রিক্ত পরিসরে নিবেদিতার স্ব-দ-শ -ফরার অবকাশ অপ্রত্যাশিত ম-ন হ-ব না। অথচ তারপরেও তাঁর অবিচল প্রকৃতিই বলে দেয় তাঁর প্রাণশক্তি কত সবুজ, কত সজীব। কিছু-তই তাঁ-ক স্ব-দশব্রত -থ-ক বিরত করা যায়নি। সেকথা রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন : ''নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর--কা-না মানু-ষ প্রত্যক্ষ করি নাই। -স সম্ব-ন্ধ তাঁহার নি-জর ম-ধ্য -যন -কা-নাপ্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব যু-রাপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজ-নর -স্নহমমতা, তাঁহার স্ব-দশীয় সমা-জর উ-পক্ষা এবং যাহা-দর জন্য তিনি প্রায় সমর্পণ করিয়া-ছন তাহা-দর ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকা-রর অভাব কিছু-তই তাঁহা-ক ফিরাইয়া দি-ত পা-র নাই।' প্রসঙ্গত স্মরণীয়, স্বামীজির মৃত্যুর পর নি-বদিতা বছরদু-য়ক (১৯০৭-এর ১৫ আগস্ট -থ-ক ১৯০৯-এর ১৬ জুলাই) এ-দশ -ছ-ড় পাশ্চা-ত্য ছি-লন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর মা-ভাইবোনের সঙ্গে মিলন হয়েছিল তাঁর। -সদিক -থ-ক তাঁর ঘ-র -ফরার পরিসর আপনা-তই তীব্র আ-বদনক্ষম হ-য় উঠ-ত পারত। অথচ তা -য হওয়ার নয়, -কননা তাঁর ঘরটি -য ১৭ নং -বাসপাড়া -ল-নই র-য়-ছ। এজন্য ক্ষণি-কর অতিথি হিসা-ব তাঁর স্ব-দ-শর কিছু উপহার তিনি নি-য় গি-য়ছি-লন। সেগুলির মধ্যে ছিল মাটির প্রদীপ, ধূপ, ধূপধানী, নানা রক-মর মালা, কবচ, পাথ-রর নুড়ি, -ছাট -ছাট বেতের বাক্স, কৃষ্ণ, -গাপালের পট আর বোতলে গঙ্গাজল প্রভৃতি। স্বাভাবিকভা-বই তাঁর -বাসপাড়া -ল-নর ঘ-র -ফরাটা ছিল সম-য়র অ-পক্ষা। ফ-ল পারিবারিক মায়ামমতা -য তাঁ-ক আটকা-ত পা-রনি, তা সহ-জই অনু-ময়। -সই সহজতার ম-ধ্যই তাঁর নীর-ব দুরূহ সাধনা -যখা-ন -স্বচ্ছায় স্বকীয় অস্তিত্ব বিপন্ন ক-র সর্বজনী-ন আপনা-ক বিলীন করার গৌরববোধ আজীবন সক্রিয় -থ-ক-ছ। বলা বাহুল্য, পাশ্চা-ত্যর গি-য়ও তিনি এ-দ-শর স্বা-র্থ নি-জ-ক কর্মমুখর -র-খছি-লন। তাঁর জীবনাদর্শই নবজন্মভূমি পরাধীন ভারতবর্ষ-ক -কন্দ্র ক-র আবর্তিত হ-য়-ছ। স্বাভাবিকভা-ব -সদিক -থ-ক সাধনার ল-ক্ষ্য সহজতার আভিজাত্য অনিবার্য হ-য় ও-ঠ। সেক্ষেত্রে নিবেদিতার এদেশের জন্য

আত্মোৎসর্গ কি শুধুমাত্র স্বামীজির অপূর্ণ কাজের দায়িত্বপালনেই সীমাবদ্ধ, নাকি নি-জ-ক খুঁ-জ -ফরার বাতিকই তাঁকে সক্রিয় রেখেছিল, তা নি-য় -ভ-ব -দখার অবকাশ আপনা-তই প্রকাশমুখর। তাঁর -সই মহৎ আত্মত্যাগ ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়েছে, অথচ তাঁ-ক ব্রতচ্যুত হওয়ার কথায় সক্রিয় ক-রনি। বরং নি-বদিতার এ-দ-শর ম-ধ্য স্ব-দশি-চতনা তীব্র -থ-ক তীব্রতর স্বপ্নরঙিন হ-য় উ-ঠ-ছ। জীবনদীপ নি-ভ যাওয়ার মুহূ-র্তও তাঁর সুগভীর আত্মপ্রত্যয় বর্ণরঙিন হ-য় উ-ঠ-ছ। ১৯১১-এর ১৩ অক্টোবর দার্জিলিং-এ জীবনের অন্তিম সময়ে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে : ''The Boat is sinking. But I shall see the Sunrise.'

নিবেদিতার আত্মনিবেদিত প্রকৃতির সঙ্গে অন্যকোনো ব্যক্তিত্বের পরিচয় নিবিড় হ-য় ও-ঠ না। সেক্ষেত্রে যে-সব দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে উ-ঠ আ-স, সেগুলোও যথেষ্ট মনে হয় না। বি-শষ করে বাস্তবের সঙ্গে না হলেও সাহিত্যের পরিস-র মহৎ জীবনাদ-র্শর পরিচয় বর্তমান। -সখা-ন অস্কার ওয়াই-ল্ডর ''দ্য হ্যাপী প্রিন্স'(১৮৮৮)-এর -ছাট -সায়া-লা পাখির ভূমিকাটি স্মর-ণ আস-ত পা-র। মৃত্যুর পরে মূর্তিতে সুশোভিত রাজপুত্র রাজ্যের প্রজাদের করুণ অবস্থার নিরসনে তাঁর শরীরে যা-কিছু বহুমূল্য রত্নাদি ছিল, সবই এ-ক এ-ক -ছাট -সায়া-লা-ক অনুরোধক্রমে তার মাধ্যমে প্রদান ক-রন। এদি-ক শীত -থ-ক উদ্ধার পাওয়ার জন্য মিশ-র যাওয়ার দিন ফুরি-য় যায়। অন্যদিকে রাজপুত্রের আত্মত্যাগে রত্নাদির সঙ্গে তাঁর চোখের মণিও নিঃ-শষ হ-য় পড়ায় অন্ধত্ব -ন-ম আ-স। -শ-ষ মিশর যাওয়ার চেয়ে সর্বস্ব ত্যাগী রাজপুত্রের সঙ্গী হয়ে থাকাই ছোট সোয়ালোর কাছে শ্রেয় মনে হওয়ায় -সখা-নই তার মৃত্যু অনিবার্য হ-য় ও-ঠ। সেদিক থেকে স্বামীজির ব্রত উদযাপনের সঙ্গে নিবেদিতার আত্মত্যা-গ -ছাট -সায়া-লার ভূমিকাটি স্মরণীয় হ-য় উঠ-লও তা প্রথ-মই বাতিল হ-য় প-ড়। -কননা ছোট সোয়ালো শুধুমাত্র সুখী রাজপুত্রের সঙ্গী হ-য় থাক-ত -চ-য়ছিল, তার -বশি নয়। -সখা-ন নি-বদিতার জীবনসংগ্রাম করা কল্পনাতীত। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যা-য়র ''আনন্দমঠ'(১৮৮২) উপন্যা-সর ''উপক্রমণিকা'য় ঔপন্যাসিক আত্মত্যা-গর -চ-য়ও মহত্ত্বর মহার্ঘ্যের পরিচয় তুলেধরেছেন। নির্জন গভীর অরণ্যানীর নিশীথে নীরবতার মধ্যে মনুষ্যকণ্ঠে ধ্বনিত হয়, '''‘আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হই-ব না ?''' অব-শ-ষ ঔপন্যাসি-কর ভাষায় : ''এইরূপ তিন বার -সই অন্ধকারসমুদ্র আ-লাড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, ''-তামার পণ কি?''

প্রত্যুত্তরে বলিল, ''পণ আমার জীবনসর্বস্ব।''

প্রতিশব্দ হইল, ''জীবন তুচ্ছ ; সক-লই ত্যাগ করি-ত পা-র।''

''আর কি আ-ছ ? আর কি দিব?''

তখন উত্তর হইল, ''ভক্তি।'''

-সই ''ভক্তি' দি-য়ও নি-বদিতার আ-ত্মাৎসর্গ-ক -মলা-না যায়। স্বামীজির নি-বদিতায় তাঁর জীবন ভক্তির পরাকাষ্ঠার উপনীত হ-য়-ছ। সেক্ষেত্রে ''ভক্তি'র পরিসর -ছ-ড় তাঁর জীবনাদর্শ সুদূর প্রসারিত। ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করে কীভাবে আত্মনিবেদনে সক্রিয় হয়ে স্বকীয় সত্তাকে সর্বজনীনে একাত্ম করে -তালা যায়, তার বিরলপ্রায় দৃষ্টান্ত রচনা ক-র-ছন নি-বদিতা। -সখা-ন বহুমুখী প্রতিভাশালিনী হ-য়ও তাঁর শিক্ষিকার আত্মপরিচয়-ক বহন ক-র ত্যাগ ও -সবার ম-ন্ত্র দীক্ষিত ক-র শুধু তার পরিসর-ক সম্প্রসারিতই ক-রননি, গ-ড় তু-ল-ছন জাতীয় শিক্ষার মহান আদর্শ-ক। স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে

শিক্ষিকার পরিচ-য় তাঁর স্বতন্ত্র আভিজাত্য বর্তমান। -সখা-ন -য়াহান হাইনরিখ -পস্তা-লাৎজি (১৭৪৬-১৮২৭) ও ফ্রিডরিখ ভিল-হলম -ফ্রা-য়-বল (১৭৮২-১৮৫২) শিক্ষা আ-ন্দাল-নর শরিক হ-য় নি-বদিতা -যভা-ব জীব-নর মূ-ল শিক্ষার ভূমিকা-ক সম্প্রসারিত কর-ত -চ-য়ছি-লন, তাতে আজীবন সক্রিয় ছি-লন। স্বামীজি তাঁর প্রিয়তম শিষ্যার শিক্ষিকাসত্তাকে এদেশ গঠনে সবচেয়ে ব্রাত্য পরিসর তথা নারীশিক্ষায় কা-জ লাগা-ত -চ-য়ছি-লন। সেক্ষেত্রে নিবেদিতার জীবনবোধের শিক্ষাভাবনা কতটা ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সঙ্গে জাতিগত নৈপুণ্যে ঐতিহ্যমুখর, তা রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম সাক্ষা-তই উপলব্ধি ক-রছি-লন। -সদিক -থ-ক স্বামীজির জীবনাদর্শে দীক্ষিত হয়ে নিবেদিতা তাঁর শিক্ষিকাসত্তাকে এদেশের জাতীয়তাবোধের জাগরণ সক্রিয় ক-র তু-লছি-লন, তা সহ-জই অনু-ময়। আর তা কর-ত গি-য় তাঁর দেশভক্তি শুধু বিস্ময়কর মনে হয় না, -সইসঙ্গে দেশঅন্তপ্রাণ প্রকৃতিও তুলনারহিত।

নি-বদিতা স্বামীজির নি-বদিতায় আ-ত্মাৎসর্গ ক-রই ক্ষান্ত হননি, এ-দ-শর জাতীয়তা-বা-ধ আত্মসমাহিত কর-ত দ্বিধা ক-রননি। এজন্য শুধু হিন্দু-ত্বর আদর্শ-ক আপন ক-র -ননি, তার সংস্কার-চতনার আ-লা-ক এ-দশ-ক স্ব-দশ ক-র তু-ল-ছন। ক্রমশ তিনি এদেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম হ-য়-ছন, আপনার -খালস ত্যাগ ক-র-ছন। হাত -দখা, -জ্যাতি-ষ বিশ্বাস -থ-ক বিদ্যাল-য় সরস্বতী পূজা করা স-ব-তই তাঁর সমান আগ্রহ। শুধু তাই নয়, এ-দ-শর দীন-হীন নারী-দর সংস্কারাচ্ছন্ন জীব-নর মধ্যে নিবেদিতা মহত্ত্ব খুঁজে পেয়েছেন। -সখা-ন অগাস্ত -কাঁ-তর অতীত-ক অবলম্বন ক-র বর্তমা-নর মাধ্য-ম ভবিষ্য-ত উপনীত হওয়ার (''By the past, through the present, to the future.') ভাবাদর্শ-ক পা-থয় ক-রছি-লন নি-বদিতা। এজন্য স্বীকা-রর ঔদা-র্য তাঁর প-থ -নতির আবাহন না থাকায় তাঁর ঔপনি-বশিক -শ্রষ্ঠত্ব-বা-ধ তাড়িত না হ-য় এ-দশ-ক তাঁর স্ব-দশভাবনার সংকট অচি-রই -ক-ট যায়। -সদিক -থ-ক -দ-শর ঐতিহ্য-ক অব'। বা অস্বীকার ক-র নয়, বরং আত্মগরিমার সঙ্গে স্বীকার ক-রই তাঁর -দশগঠ-নর ব্রত -যভা-ব উদ্‌যাপিত হ-য়-ছ, তা-ত শুধু তাঁর গুরুভক্তির পরিচয় উ-ঠ আ-স না। বরং সেই ভক্তির স্তর অতিক্রম করে দেশের বৃহত্তর ও মহত্ত্বর স্বার্থে আত্মসমর্পণে নি-জ-ক সঁ-প -দওয়ার আদর্শ অতুলনীয় পরিসর ব-য় এ-ন-ছ। স্বামীজির লাগামহীন জীবনাদ-র্শ নি-বদিতা আপনা-তই -যভা-ব ধরা দি-য়ছি-লন, তাঁর অবর্তমানে সেই মুক্ত পরিসরই তাঁ-ক আবার দায়-বা-ধ আবদ্ধ ক-রছিল। অন্যদি-ক তাঁর শিক্ষা-শাভন ম-নর ম-ধ্য -গাঁড়ামির অবকাশ না থাকায় অনায়া-সই সবকিছু-ক সহজসুন্দর ক-র নি-ত পার-তন। সেক্ষেত্রে স্বকীয় সত্তায় আস্থাশীল থাকায় যে--কা-নারকম প্রতিকূলতা-ক কাটি-য় ওঠার জন্য -যমন বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় তাঁর সহ-যাগী হ-য় উ-ঠ-ছ, -তমনই সত্যনিষ্ঠায় তাঁর যুক্তিসিদ্ধ মননের সক্রিয়তাও তাঁকে প্রাণিত করেছে। -সখা-নই এ-দ-শর স্বার্থই তাঁর কা-ছ বড় হ-য় উ-ঠ-ছ। স্বামীজির কথাও তাঁর কা-ছ সবসময় -বদবাক্য থা-কনি। ঠাকুরবাড়ি সম্প-র্ক নি-বদিতা-ক বিরূপ ধারণা দি-য়ছি-লন স্বয়ং বি-বকানন্দ। মিস ম্যাকলাউড-ক -লখা চিঠি-ত -সকথা স্মরণ ক-র-ছন নি-বদিতা। তা-ত ঠাকুরবাড়ির বিরূপতায় আদির-সর প্রবা-হর দায় নিবিড় হ-য় উ-ঠ-ছ : ''Remember that family has poured a flood of erotic venom over Bengal.' সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কবিতায় যে আদিরসের পরিচয়ে স্বামীজি তাঁর শিষ্যাকে মেলা-মশায় বিরত কর-ত -চ-য়ছি-লন, তা -য ফলপ্রসূ হওয়ার ছিল না, সময় তার পরিচয়বাহী। শুধু তাই নয়, নি-বদিতাই ঠাকুরবাড়ির যোগসূত্র রক্ষা করেছিলেন। স্বামীজির ব্রাহ্ম-দর ম-ধ্য ঢু-ক পড়ার নি-র্দশও তিনি পালন ক-র-ছন। অন্যদি-ক তাঁর ব্রাহ্মবি-রাধী মানসিকতাও -দ-শর স্বা-র্থ উ-ব গি-য়ছিল।

আ-মরিকায় অর্থসংগ্রহের সময় নিবেদিতার ব্রাহ্মবিরোধিতার সূত্রক্রমে বরেণ্য দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পালের তিক্ত অভি'তাই সময়ান্ত-র সুমিষ্ট হ-য় উ-ঠ-ছ। বিপিনচ-ন্দ্রর ভার-তর আধ্যাত্মিকতা বিষ-য় প্রশংসা'াপক বক্তৃতা শুনেই বিমুগ্ধ নিবেদিতাই বক্তাকে আপন করে নিয়েছেন। -দ-শর প্রতি

তাঁর এই প্রগাঢ় ভা-লাবাসাই তাঁর কা-ছ স্বধর্ম হ-য় উ-ঠছিল। -সই ভা-লাবাসার ব্যাপ্তি ও গভীরতায় তাঁর স্বধর্ম-ক আজীবন শিক-ড় ছড়ি-য় দি-য়-ছন । -সই শিকড় উপ-ড় তাঁর প্রা-ণর সজীবতা বিনষ্ট না করাই -তা দস্তুর। বাগবাজা-রর -বাসপাড়া -ল-নর -সই অস্বাস্থ্যকর পুর-না বাড়ি-ত বারবার অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তা ছেড়ে দিতেও যার তীব্র অনীহা (''এই গলি আমা-ক আশ্রয় দি-য়-ছ, এ-ক -ছ-ড় যাওয়া ঠিক হ-ব না।'), -সখা-ন স্বধর্ম ত্যাগ ক-র এই স্ব-দশচ্যুত হওয়া তাঁর প-ক্ষ -য সম্ভব ছিল না, তা সহ-জই অনু-ময়। -কননা জীব-নর সবকিছু দি-য়ই নি-বদিতা তাঁর স্ব-দ-শর -সবায় আত্মনি-য়াগ ক-রছি-লন। -সখা-ন স্ব-দশমাতার পূজার নৈ-বদ্যই ছিল জীব-নর সাধনা। অথচ তাঁর -সই আত্মনি-বদন স্বামী বি-বকান-ন্দ সীমায়িত হ-য় -থ-ক-ছ, আত্মসমর্পণ প্রচলিত ধর্ম ও রাজনীতির -ঘরা-টা-প আবদ্ধ হ-য় প-ড়-ছ। -সখা-ন হিন্দুধ-র্মর সন্ন্যাসিনীর পরিচ-য় তাঁর অস্তিত্ব -যমন আত্ম-গাপন ক-র-ছ, -তমনই রাজনৈতিক পরিস-র বিত-র্কর আধা-র তাঁ-ক আঁধার ক-র রাখা হ-য়-ছ। অথচ দল বা সংগঠন অথবা সঙ্ঘ ক-র অনায়া-সই নি-বদিতা নি-জর নামাবলিটি সুরক্ষিত ক-র -য-ত পার-তন। -য নি-জর নাম-কই নি-বদিতায় সামিল ক-র-ছন এবং -স-না-ম নি-জ-ক মিশি-য় -দওয়ার জন্য আপ্রাণ স-চষ্ট হ-য়ছি-লন, তাঁর প-ক্ষ আত্মসমর্প-ণ আত্মবি-লাপ অনিবার্য ছিল। এজন্যই তিনি নি-বদিতা -থ-ক সমর্পিতা হ-ত -প-রছি-লন। রবীন্দ্রনাথও -সকথা স্মরণ করি-য় দি-য়-ছন : ''দল বাঁধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার প-ক্ষ কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহা-ক দলপতির -চ-য় অ-নক উচ্চ আসন দিয়াছি-লন, আপনার ভিতরকার -সই স-ত্যর আসন হই-ত নামিয়া তিনি হা-টর ম-ধ্য মাচা বাঁ-ধন নাই। এ -দ-শ তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়া-ছন কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই।' -সই অমূল্য ''জীবন'-এর উপলব্ধির করার ম-তা নির্দলীয় পরিসর আপনাতেই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে। অন্যদি-ক নি-বদিতার নীরব সাধনায় র-য়-ছ নিরাসক্ত প্রকৃতি। -স-সম্প-র্ক দী-নশচন্দ্র -সন অকপ-ট জানি-য়-ছন : ''এরূপ নিঃস্বার্থ, আত্মপর-ভাব-বিরহিত, প্রতিদান সম্প-র্ক শুধু সম্পূর্ণরূ-প উদাসীন ন-হ, একান্ত বি-রাধী, কা-র্য তন্ময় -লাক আমি জীব-ন -বশী -দখিয়াছি বলিয়া জানি না। তিনি আমা-ক নিষ্কাম ক-র্মর -য আদর্শ -দখাইয়া-ছন, তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম---তাঁহার ম-ধ্য এই ভাবটি পূর্ণভা-ব পাইয়াছিলাম।' -স-সবদিক -থ-কই -স্বচ্ছায় উ-পক্ষিতা নি-বদিতার আত্মসমর্পিতার বিরল প্রকৃতির পরিচয় আপনা-তই অন্তরা-ল সং-গাপ-ন আপন আভিজাত্য বজায় -র-খ চ-ল। তার পরিচয় প্রচা-র নয়, র-য়-ছ প্রকা-শ। -স-প্রকাশ নি-বদিতার এদেশের বহুমুখী কর্মকাণ্ডেই বর্তমান। তা-ক অতীত ক-র কার সাধ্য?

প্রব-ন্ধ অনু-ল্লখিত তথ্যঋণ :

১। ভগিনী নি-বদিতা, প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, সিস্টার নি-বদিতা গার্লস স্কুল,
২। ভারত-উপাসিকা নি-বদিতা, রচনা ও সংকলন রা-মন্দু ব-ন্দ্যাপাধ্যায়
৩। শনিবা-রর চিঠি প্রবন্ধ-সংকলন, সম্পাদনা রঞ্জনকুমার দাস
৪। রবীন্দ্রনাথ ও নি-বদিতা (প্রবন্ধ), নিতাই বসু, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদ সংখ্যা ১৪১৪
৫। কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বি-বকানন্দ সংখ্যা, বই-মলা ১৪১৩
৬। ভার-তর নি-বদিতা (প্রবন্ধ), -দবাঞ্জন সেনগুপ্ত, -দশ, ১৭ ডি-সম্বর ২০১৬
৭। -লাকমাতা সংখ্যা, -দশ, ১৭ অক্টোবর ২০১৭
৮। বই-য়র -দশ, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮
৯। সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৮ অক্টোবর ২০১৭
১০। সংবাদ প্রতিদিন, ২৩ জুন ২০১৮

ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার বিস্তারে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা

গৌতম বুদ্ধ সুরাল

আমরা জানি ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। সেই ঔপনিবেশিক শাসন ছিল স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক। কিন্তু এমন একটি শব্দবন্ধ যদি ব্যবহার করা যায় যাকে বলা যেতে পারে Spiritual Expansionism —তাহলে বোধহয় একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে এক্ষেত্রে সারা বিশ্বে ভারতবর্ষের স্থান শীর্ষে। আধ্যাত্মিক ঔপনিবেশিকতায় বোধহয় একমাত্র ভারতবর্ষেরই অধিকার—আগেও ছিল এবং তা আজও বিদ্যমান। এটুকু নিশ্চয়ই বলে নেওয়া প্রয়োজন যে রাজনৈতিক ঔপনিবেশিকতাবাদের সঙ্গে যে বলপ্রয়োগ, যে ক্ষমতাপ্রয়োগ বা অন্য একটি জাতি তথা দেশকে অবদমিত করার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে এখানে সেই বিষয়টি একেবারেই অনুপস্থিত। Spiritual Expansionism বলতে আমি বিশ্বজুড়ে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক প্রভাবের কথাই বলতে চাইছি।

বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের cultural ambassadors হিসেবে যে নামগুলি সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় সেগুলির মধ্যে একটি হল স্বামী বিবেকানন্দ ও অপরটি হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল একটি দর্শন - ‘Philosopy of tolerance.’ ধর্ম কেবল চাল-কলা, আচার-বিচার, অসহিষ্ণুতা নয়, আধুনিক জীবনে ধর্মের কাজ হল

বহুজনের মধ্যে, বহু মতের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আচার্যদেব স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের ওপর লেখা একটি বই, যার শিরোনাম *Prophet of A New Hindu Age : The Life and Times of Acharya Pranavananda*, সেখানে লেখক Ninian Smart রাষ্ট্রগঠনে হিন্দুধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন। আমি তাঁর বক্তব্যের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করছি : Vivekananda was the most luminous leader in the process of nation building, helping to formulate and present convincingly the theory that all religion point to the same Truth and that the genius of Hinduism is that it has always known this and it has always managed to put such pluralism into practice and also propagated the ideal. [১] হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য হল তার বহুত্ববাদী চরিত্র। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম ছিল এক Spiritual awakening বা আধ্যাত্মিক জাগরণের হাতিয়ার।

ভগিনী নিবেদিতা বা Sister Nivedita, যাঁর পারিবারিক নাম Margaret Elizabeth Noble, স্বামী বিবেকানন্দের এই আধ্যাত্মিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েই ভারতবর্ষের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে এবং ঐ সময়ে স্বামীজীর বেদান্ত সম্পর্কে বক্তৃতা এবং প্রশ্নোত্তর শুনে নিবেদিতার কাছে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়। ইউরোপীয় আধ্যাত্মিকতা ও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার তফাৎ তিনি বুঝতে পারেন এবং অনুভব করেন যে, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা একেবারেই পার্থিবভাব-সম্পর্কশূন্য। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, আমরা যাকে বলতে পারি multifaceted personality. ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায়, বিশেষত নারীশিক্ষা এবং ভারতবর্ষের স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ নিবেদিতার পক্ষে সহজ হয়নি। স্বামীজী তাকে বারে বারে পরীক্ষা করেছেন, কখনো কখনো তিরস্কৃত করেছেন, তার কারণ হিসেবে তাঁর গ্রন্থে প্রধানত দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, নিবেদিতা যাতে তাঁর ইংরেজ চরিত্রের গরিমা বিসর্জন দিতে পারেন এবং দ্বিতীয়ত, স্বামীজীর প্রতি নিবেদিতার যেন কোন ব্যক্তিগত অনুরাগ তৈরি না হয়। Roman Rolland -র বই *The Life of Vivekananda* থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করলাম : “He had not the slightest respect for her instinctive national loyalty, for her habits or her dislikes as a Westerner; he constantly humiliated her proud and logical English character. Perhaps in the way he wished to defend himself and her against the passionate adoration she had for him ; although Nivedita’s feelings for him was absolutely pure, he perhaps saw their danger.”[২]

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন যে ভারতকে যদি উন্নতি করতে হয় তবে সাধারণ মানুষ এবং নারীদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। নারীদের অবস্থার উন্নতির একমাত্র উপায় তাঁদের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার বিস্তার। শিক্ষার বিস্তার হলে নারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জেগে উঠবে এবং তখন তাঁরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করে নিতে সক্ষম হবে। এ প্রসঙ্গে সিস্টার নিবেদিতা তাঁর *The Master as I Saw Him*

বইটিতে বলেছেন : "He was consumed with a drive for the education of Indian Women, and for the scientific and technical education of the country."[৩] মার্গারেটকে এই কাজে বিশেষ উপযুক্ত মনে হয়েছিল স্বামীজীর। তিনি তাঁকে আহ্বান জানিয়ে চিঠিতে (২৯ জুলাই ১৮৯৭) লিখেছিলেন : "... আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতে নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে ধার করতে হবে। ... তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।"

উপরোক্ত চিঠিতেই স্বামীজী মার্গারেটকে জানান যে ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, এখানে এলে তাঁকে প্রভূত কষ্ট স্বীকার করতে হবে। স্বামীজী ভারতে আসার পরবর্তী সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য কেমন থাকবে সে সম্পর্কে উদ্বিগ্নতাও প্রকাশ করেন। কিন্তু পাশাপাশি মার্গারেটকে এটিও জানাতে ভোলেননি যে সব জানার পরও যদি মার্গারেট ভারতে আসার ব্যাপারে অবিচল থাকেন তাহলে তিনি আমৃত্যু তাঁর পাশে থাকবেন : "I will stand by you unto death." স্বামীজীর ভারত গঠনের ডাকে সাড়া দিয়ে মার্গারেট ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছালেন। ভারতবর্ষে আসার পর ১১ মার্চ ১৮৯৮, মার্গারেট –এর এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। সেই সভায় স্বামীজী তাঁকে পরিচিত করানোর সময় বলেন, "She is a gift of England to India."[৪] ১৭ মার্চ তিনি দর্শনলাভ করেন মা সারদাদেবীর। তাঁর সম্পর্কে মার্গারেট তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, "She is the very soul of sweetness, so gentle and loving."[৫] পরম মমতায় শ্রীশ্রীমা মার্গারেটকে গ্রহণ করলেন। মার্গারেটও অনুভব করলেন অকৃত্রিম ভালোবাসা, পবিত্রতা, মাধুর্য, সরলতা ও জ্ঞানের প্রতিমূর্তি শ্রীশ্রীমাকে। এরপর ওই মাসেই ২৫ তারিখে স্বামীজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন, মার্গারেট হলেন সিস্টার নিবেদিতা। ভারতবর্ষকে যাতে নিবেদিতা চিনতে পারেন তার জন্য দিনের পর দিন অসীম ধৈর্য্য ও সততা নিয়ে স্বামীজী তাঁর সামনে ভারতবর্ষের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, জনজীবন, সমাজতত্ত্ব, প্রাচীন ও আধুনিক মহাপুরুষদের জীবন ব্যাখ্যা করে চললেন। একদিকে দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পরাধীন ভারতবর্ষ; অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতার ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত পূর্ণ ত্যাগ ও তপস্যাময় এক মহান ভারতবর্ষ—মার্গারেটের সামনে উন্মোচিত হল এই দুই রূপই।

ভারতীয় নারী, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে নিবেদিতা ছিলেন ভীষণ শ্রদ্ধাশীল। একদিকে যেমন তাঁদের শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ইউরোপীয় নারীর তুলনায় ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতিতে তাঁরা যে অগ্রগণ্যা একথাও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন। ভারতীয় নারীর এই মূল্যায়ন নিয়ে ইংল্যান্ডের পত্রপত্রিকায় বিতর্ক হয়েছে। কেউ তাঁর বক্তব্যের মান্যতা দেওয়ার পাশাপাশি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, আবার কেউ কেউ সরাসরি নিবেদিতার বক্তব্য খণ্ডন করে ভারতীয় নারী সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণাকে হাস্যাস্পদ বলে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর লেখা *The Web of Indian Life* বইটি প্রথম ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বইটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন

বইটি ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতার "supreme gift of sympathy" এবং তিনি নিবেদিতার "extraordinary insight of love" যা বইটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯১৮ সালে বইটির একটি নতুন সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ বইটির একটি Introduction বা ভূমিকা লেখেন (২১ অক্টোবর ১৯১৭)। সেখানে তিনি লিখেছিলেন : "She lived our life and came to know us by becoming one of ourselves. She became so intimately familiar with our people that she had the rare opportunity of observing us unaware. As a race we have our special limitations and imperfections, and for a foreigner it does not require a high degree of keen-sightedness to detect them. We know for certain that these defects did not escape Nivedita's observation, but she did not stop there to generalize, as most other foreigners do. And because she had a comprehensive mind and extraordinary insight of love she could see the creative ideals at work behind our social forms and discover our soul that has living connexion with its past and its marching towards its fulfillment." এই বইটি ভারতবর্ষের সমাজ ও নারী সম্পর্কে নিবেদিতার বক্তব্য *The Queen* (২৮ অগষ্ট ১৯০৪) পত্রিকায় প্রশংসিত হয় : "It is seldom that a Western-born author succeeds as absolutely as Miss Noble in her *The Web of Indian Life* in penetrating the Eastern mind and heart .... If love is the first qualification towards understanding the character of a people, Miss Noble was thoroughly qualified, for she writes of the East as a lover might write of his beloved." *The Detroit Free Press* (২৪ জুলাই ১৯০৪) পত্রিকাও নিবেদিতার বইটিতে ভারতীয় নারীর উপস্থাপনার প্রশংসা করে।

কিন্তু এই প্রশংসার পাশাপাশি *The Athenaeum* নামক সাহিত্য পত্রিকা বা *The Church Times* এর মত পত্রিকা নিবেদিতার লেখা বইটি সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনার ঝড় তোলে। *The Athenaeum* (১৯০৪) নিবেদিতাকে আক্রমণ করে লেখে যে, ভারতীয় ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে নিবেদিতার মতামতকে কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য বলা যাবে না। পত্রিকায় লেখা হয় যে *The Web of Indian Life* "misunderstanding" এবং "misstatement"-এ পরিপূর্ণ। *The Church Times* (১৯ অগষ্ট ১৯০৪) মন্তব্য করে যে বইটিতে ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারাকে অতিমাত্রায় ইতিবাচক হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং ছবির অন্যদিকটি একেবারেই তুলে ধরা হয়নি।

নিবেদিতার শিক্ষার মূল কথা ছিল মানুষের অন্তঃস্থিত মানবতার বিকাশ। ভারতবর্ষের অগ্রগতি শিক্ষা ছাড়া কোনোমতেই সম্ভব নয়, এ তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ভারতীয় শিক্ষার চরিত্র শুধুমাত্র Nationalist বা জাতীয়তাবাদী হলে চলবে না, তাকে হতে হবে Nation Making বা জাতি গঠনের অনুকূল—এমন শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে যা কেবল মানুষকে রোজগার করতে শেখায় না, যে শিক্ষা মানুষের অন্তরের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে, যে শিক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ (Secular), যে শিক্ষা মানুষকে অন্তরমুক্তির পথ দেখায়, সেই শিক্ষা দিতে হবে এবং এই শিক্ষার ভিত্তি অবশ্যই হবে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে চরিত্র গঠন— তাঁর নিজের কথায় : “All education worth having must first devote itself to the developing and consolidating of character and only secondarily concern itself with intellectual accomplishment.”[৬]

ভারতীয় নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল যে, ভারতীয় নারী শিক্ষার মাধ্যমে আরো ভারতীয় হয়ে উঠবে। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভারতীয় নারী যদি ভারতীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে তাকে শিক্ষিত বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ভগিনী নিবেদিতা’ প্রবন্ধে (প্রবাসী, নভেম্বর ১৯১১) শিক্ষা সম্পর্কে নিবেদিতার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যার শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য নিবেদিতাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু নিবেদিতা সেই অনুরোধে সম্মতি দিতে তাঁর অপারগতার কথা জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : “... আমার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি শিক্ষা দিতে চাও? আমি বলিলাম, ইংরেজী এবং সাধারণত ইংরেজী ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কি? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।”[৭]

নিবেদিতা মনে করতেন যে, ভারতীয় নারী ভারতীয় শাস্ত্র জানেন, ভারতবর্ষের মহাকাব্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনি শিক্ষিত। হয়তো তিনি লিখতে পারেন না, হয়তো পাশ্চাত্য শিক্ষার মানদণ্ড অনুযায়ী কিছু বিশেষ বই তাঁর পড়া নেই, তাই বলে তিনি অশিক্ষিত একথা বলা যায় না। নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন যে, ভারতীয় নারীর অন্তরের শিক্ষার সঙ্গে তাঁর বহির্জগতের জীবনের সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন—তাঁর হৃদয়ে, তাঁর মস্তিষ্কে যে জ্ঞান রয়েছে তা যাতে হাতের মাধ্যমে কার্যে বাস্তবায়িত হতে পারে তার জন্য ভারতীয় সনাতন নারীর শিক্ষার প্রয়োজন।

স্বামীজীর অভিপ্রায়কে মর্যাদা দিতে নিবেদিতা যে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন, সেটি আকারে ছোট হলেও তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। একেবারেই ভারতীয় আদর্শে এই স্কুল পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্রী পেতে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নিবেদিতাকে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি অনুরোধ করতেন মেয়েদেরকে তাঁর বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য। বেশ কিছু বিধবা মহিলাও ছাত্রী ছিলেন এই বিদ্যালয়ের। প্রার্থনা হত ‘বন্দেমাতরম্’ গানের মধ্য দিয়ে। নিবেদিতা চরকা কাটার প্রবর্তন করেছিলেন স্কুলে। ছোট ছোট বাচ্চাদের নানারকম খেলনার মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। নারী শিক্ষা সম্পর্কে নিবেদিতার ধারণা কি ছিল তাঁর নিজের কথায় সেটি আমরা একটু দেখতে পারি : “Reading & writing are not in themselves education. The power to use them well is vastly more important than the things themselves. A woman in whom the great compassion is awakened, a woman who understands the

national history, who has ... a notion of what her country looks like, is much more truly and deeply educated than one who has merely read much."[৮]

ভারতের মত পুরুষ শাসিত দেশে Teacher বা শিক্ষক শুধু বৌদ্ধিক বিকাশ (intellectual development) এর সহায়ক হবেন তা নয়। তিনি হবেন প্রকৃত অর্থে emancipator বা আত্মিক/মানসিক মুক্তির রূপকার। মহিলাদের স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে পুরুষদের বিশেষ ভূমিকা আছে বলে নিবেদিতা মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎকারের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯০৫ সালে কলকাতা কংগ্রেসে যোগ দিতে সুব্রহ্মণ্য ভারতী যখন কলকাতায় আসেন তখন তিনি নিজেই একদিন নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে যান। আলাপ-আলোচনার সময় নিবেদিতা যখন শুনলেন যে, ভারতী বিবাহিত তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে আসেননি কেন? উত্তরে ভারতী বলেছিলেন : "আমাদের সমাজে স্ত্রীকে নিয়ে প্রকাশ্য সভায় যাবার রীতি নেই।" নিবেদিতা এই কথা শুনে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁকে বলেন, "গভীর দুঃখের সঙ্গে আমি আর একজন ভারতীয়কে দেখলাম, যে নারীকে ক্রীতদাসের চেয়ে বেশি কিছু ভাবে না। তোমার শিক্ষার কি মূল্য আছে যদি তুমি তোমাদের নারীজাতিকে নিজের স্তরে উন্নীত করতে না পারো? জাতির অর্ধাংশ কিভাবে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে যদি তা অপরাধকে পরাধীন করে রাখে?" ভারতী নিবেদিতার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং কথা দিয়েছিলেন যে তাঁর উপদেশ তিনি অবশ্যই পালন করবেন। এই সাক্ষাৎকার সুব্রহ্মণ্য ভারতীর মনে প্রগাঢ় দেশপ্রেমের সঞ্চার করেছিল। জাতিভেদ ও নারী-পুরুষের বৈষম্যবোধ চিরতরে দূর করে দিয়েছিল। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ নিবেদিতাকে উৎসর্গ করে তিনি লিখেছিলেন : "আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আমার শিক্ষাদাত্রীর শ্রীচরণে নিবেদন করলাম, যিনি আমাকে ভারতমাতার ভাবমূর্তি দর্শন করিয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে যথার্থ আত্মজ্ঞান দান করেছিলেন, সেইভাবে আমার মধ্যে দেশাত্মবোধ অনুপ্রবিষ্ট করিয়েছেন।"[৯]

স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত নিবেদিতার সংকল্প ছিল এমন নারী চরিত্র গঠন যার মধ্যে একদিকে থাকবে বীরের সংযম ও দৃঢ় চিত্ততা এবং অপরদিকে থাকবে জননীসুলভ কোমলতা। তিনি নিজেও ছিলেন সেইরূপই এক নারী। ভারতীয় নারীর পবিত্রতা ও মাধুর্যের সঙ্গে স্বাধীনতাস্পৃহা ও আত্মনির্ভরতার সংমিশ্রণ ঘটুক—এই ছিল নিবেদিতার ঐকান্তিক ইচ্ছা। স্বামী তেজসানন্দ তাঁর লেখা বই 'ভগিনী নিবেদিতা'-তে বলেছেন : "বলাবাহুল্য, নিবেদিতা এরূপ স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহার সাহায্যে আমাদের মাতৃজাতি একদিকে যেমন পবিত্র, সংযত, নিঃস্বার্থ ও ধর্মপরায়ণ হইবে, অপরদিকে তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রপরিচালনার কুশলতা অর্জন করিয়া জাতীয় জীবনের পুষ্টি বিধান করিতে সমর্থ হইবে—লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতিকে পুনরায় কেন্দ্রস্থ, আত্মস্থ ও জীবন্ত করিয়া তলিতে পারিবে। নিবেদিতা এই মহতী পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহারই নিজ হাতে গড়া বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে।"[১০]

নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত সেই বিদ্যালয় আজ 'রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল' নামে পরিচিত। আজকের ভারতবর্ষে স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে সিস্টার

নিবেদিতার ভূমিকা কখনো বিস্মৃত হবার নয়। ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়টির স্থাপনের মধ্য দিয়ে। শিক্ষা ছিল নিবেদিতার কাছে মেয়েদের মুক্তির অন্যতম মাধ্যম। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র শিক্ষাই পারে কুসংস্কারের কবল থেকে মেয়েদের মুক্ত করে তাদের মধ্যে বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে। তাঁর অক্লান্ত সাধনা যে বিফলে যায়নি তার প্রমাণ আমরা পাই আজকের ভারতবর্ষে যেখানে নারীশিক্ষার বিষয়টি সমধিক গুরুত্বপ্রাপ্ত। সিস্টার নিবেদিতা আজ ভারতের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নাম। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জুন ২০১৯ সংখ্যায় স্বামী চেতনানন্দ তাঁকে এক 'বিস্ময়' বলে অভিহিত করেছেন। আজকের দিনে তাঁর আদর্শের সামান্য কিছু অংশ যদি আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারি, তাহলেই তাঁর প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।

তথ্যসূত্র :

১. Smart, Ninian, *Prophet of A New Hindu Age : The Life and Times of Acharya Pranavananda*, George Allen and Unwin, London, 1985. p. 104

২. Rolland, Roman, *The Life of Vivekananda and the Universal Gospel*, Advaita Ashram, Kolkata , 1931. p. 114

৩. Sister Nivedita, *The Master as I Saw Him*, Udbodhan Kolkata, 1910. p. 36

৪. Rolland, Roman, *The Life of Vivekananda and the Universal Gospel*, Advaita Ashram, Kolkata , 1931. p. 114

৫. *The Complete Works of Sister Nivedita*, Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls' School, Calcutta, 1967. Vl. II. p. 415

৬. Sister Nivedita "The Future Education of the Indian Women" - in *Hints on National Education in India*, Udbodhan, Kolkata, 5th. Ed. 1966. p. 55

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভগিনী নিবেদিতা', প্রবাসী (সম্পাদক- রামানন্দ চট্টপাধ্যায়), নভেম্বর ১৯১১, পৃ. ১১

৮. *Sister Nivedita's Readings & Writings,* Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls' School, Calcutta, 1975. p. 222

৯. ভারতে নিবেদিতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, ১৮৯৮, পৃ. ৫০

১০. স্বামী তেজসানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, উদ্বোধন, কলকাতা, ১৯৬৪ (২য় সংস্করণ), পৃ. ৬৭-৬৮

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণের কয়েকটি দিক —একটি পর্যালোচনা

রুহিদাস বণিক

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা বর্তমান ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। হীনবল ও পরাধীন ভারতবাসীর মনে এই বক্তৃতা ও আনুষঙ্গিক ঘটনা যেমন আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করল, তেমনি বিশ্ব পেল ধর্মীয় উদারতার নতুন দিশা। একটি বক্তৃতার মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষিত ও বিশিষ্ট নরনারীর মনে এমন প্রভাব বিস্তার রূপকথার কাহিনিসুলভ আকস্মিক ও বিরল। বিশ্বধর্মসভায় নিজ ধর্মের বিজয়কেতন উড়ানো বিশ্বজয়ী বীরের বদলে আমরা তাঁর মধ্যে উদার বিশ্বপ্রেমিককেই খুঁজে পাই যিনি সমস্ত ধর্মান্ধতা ও সংকীর্ণতার অবসানধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন ধর্মমহাসভার উদ্বোধনী পবিত্র ঘণ্টানিনাদের মাধ্যমে।

****

ধর্মমহাসভার সঠিক দিনক্ষণ না জানায় স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই শিকাগো পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন জানলেন ধর্মমহাসভা আরম্ভ হতে তখনও

মোটামুটি দেড় মাসের মতো বাকি, অথচ শিকাগোর মত ব্যয়বহুল শহরে থাকতে গেলে তাঁর সমস্ত টাকাপয়সা শেষ হয়ে যাবার আশংকা, তিনি চলে যান পাশের শহর, অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল শহর বস্টনে। সেখানে বেশ কিছু বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক জন হেনরি রাইট। কথায় কথায় অধ্যাপক রাইট জানতে পারেন যে পরিচয়পত্র ও আমন্ত্রণ না থাকায় স্বামীজী ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিতে ইচ্ছুক নন, তখন তিনি সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন, "To ask you, Swami, for credentials is like asking the sun to state its right to shine!"[১]

বহু প্রতিকূলতা অতিক্রম করে অবশেষে ১১ সেপ্টেম্বর স্বামীজী উপস্থিত হলেন শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটের 'হল অব কলম্বাসে'। সেখানে সমবেত হয়েছেন আমেরিকার এবং বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত পাঁচ-সাত হাজার শিক্ষিত ও অতিবিশিষ্ট নরনারী। সকাল ১০ টায় ঘণ্টাধ্বনি ও প্রার্থনার মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। বক্তারা তাঁদের প্রস্তুত করা বক্তৃতা একে একে পাঠ করছিলেন। একটু যেন ভয়ে বা কুণ্ঠায় গুটিয়ে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যতবার সভার প্রেসিডেন্ট চার্লস ক্যারল বনি তাঁকে আহ্বান জানান, ততবারই তিনি বলেন, "না, এখন নয়।"

ঘটনাটা বিচিত্র এবং বিস্ময়কর বটে! আমেরিকার উদ্দেশ্যে ভারতত্যাগের মুহূর্তে তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেছিলেন : "হরিভাই, ধর্মমহাসভাটা এরই (নিজের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে) জন্য হচ্ছে। আমার মন তাই বলছে। শিগগিরিই এর প্রমাণ দেখতে পাবে।" সেই তিনিই কিনা প্রেসিডেন্ট বনিকে বারবার বলছেন : "না এখন নয়, পরে"!! এবং নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন : "সবাই তাদের বক্তৃতা লিখে নিয়ে এসেছে। আমিই বোকা, কিছু লিখে আনি নি!"[২]

****

অবশেষে সেই পরম লগ্ন উপস্থিত হল। প্রেসিডেন্ট বনি স্বামীজীর আগাম অনুমতি না নিয়েই তাঁর নাম ঘোষণা করে দেন এবং তিনি 'Sisters and Brothers of America' বলে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। 'Sisters and Brothers of America' সম্বোধন করার পর, স্বামীজী লিখছেন : "যখন আমি 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালি ধ্বনি হইতে লাগিল যে কানে তালা ধরিয়া যায়। তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, যখন আমার বলা শেষ হইল, তখন হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিন সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেইদিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছিল।"[৩]

****

রবি ঠাকুরের “সে পূর্ণ উদাত্ত ধ্বনি বেদগাথা সামমন্ত্রসম সরল গম্ভীর” কথাটি স্বামীজীর বক্তৃতা সম্পর্কে আমরা প্রয়োগ করতে পারি।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম দিনের বক্তৃতার পূর্ণাঙ্গরূপ সম্ভবত পাওয়া যায় না—কিছু কিছু সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিল। তারাও নিশ্চয়ই সম্পূর্ণত প্রকাশ করেনি। যেটুকু পাওয়া যায় তার কিছু কিছু অংশ নিম্নরূপ :

“ হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ আপনারা আমাদিগকে যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিবার জন্য উঠিতে গিয়া আমার হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসি-সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্বধর্মের যিনি প্রসূতি-স্বরূপ, তাঁহার নামে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। ... ... যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী ‘এক্সক্লুশন’ (ভাবার্থ : বহিষ্করণ, পরিবর্জন) শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া গর্ব অনুভব করি। ... ... সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মাত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এই-সকল ভীষণ পিশাচগুলি যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত। তবে ইহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত; এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি, এই ধর্ম-মহাসমিতির সম্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহাই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতন এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।”[৪]

****

আমরা যদি স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত প্রথম দিনের ভাষণ বিশ্লেষণ করি তাহলে তাঁর ভাষণের মূল সুরটি খুঁজে পাব—উদারতা ও সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা। পরধর্মসহিষ্ণুতা নয়, স্বামীজীর কথায় : “সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।” ইহা যেন শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত কথারই প্রতিধ্বনি—”যত মত, তত পথ”।

দ্বিতীয়ত, সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, ধর্মোন্মাত্ততা প্রভৃতির বিষময় ফল সম্পর্কে সতর্ক উচ্চারণ। কারণ এগুলিই মানবসভ্যতার প্রগতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় বাধা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখনও জগতের বহু স্থানেই এই বিষবৃক্ষের বীজ রয়ে গেছে এবং একশ্রেণির মানুষের প্রশ্রয়ে সেগুলি কোথাও কোথাও অঙ্কুরিত হয়ে মহীরূহের আকার

নিয়েছে, আমাদের দেশেও সেগুলি দুর্লভ নয়, অথচ দূরদর্শী স্বামীজীর মননে তা কত আগেই ধরা পড়েছিল, ভাবলে অবাক হতে হয়।

****

শিকাগো ধর্মমহাসভা বিশ্বের ধর্মের ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বধর্মসভায় খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠা। ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তা কমিটির সভাপতি জন হেনরি ব্যারোজের কথায়—"We believe that Christianity is to supplant all other religions, because it contains all the truth there is in them and much besides, revealing a redeeming God."[৫] অন্য আরেকজন আর্চ বিশপ লেখেন—"In my judgment, no Christian believer should hesitate one moment to make the presentation of the Religion of Jesus Christ grand and impressive, so that it may make itself felt powerfully in the comparison of religions… Who can tell but that the great Head of the Church may, in his providence, make use of the immense gathering to usher in the triumph of his truth, when at the name of Jesus every knee shall bow?"[৬]

স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতা অভিনন্দনের উত্তরে বলেছেন : "এই চিকাগো ধর্মমহাসভা একটি বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে বহু নগর হইতে আমরা এই সভার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিয়াছি। তাহারা আমাদের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদার্হও বটে। কিন্তু এই ধর্ম-মহাসভার যথার্থ ইতিহাস যদি জানিতে চাও, যথার্থ উদ্দেশ্য যদি জানিতে চাও, আমার নিকট শোন। তাহাদের ইচ্ছা ছিল—নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সেখানকার অধিকাংশ লোকের ইচ্ছা ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য ধর্মগুলিকে হাস্যাস্পদ করা।"[৭] চিঠিতে লিখেছেন : "The Parliament of Religions was organised with the intention of proving the superiority of the Christian religion.."[৮] ধর্মমহাসভার মঞ্চেও খ্রিস্টান দুনিয়ার মাতব্বরি মানসিকতা বজায় ছিল। কিন্তু ইতিহাসে গভীর জ্ঞান থাকা স্বামী বিবেকানন্দ তাদের এই অন্যায় মাতব্বরি নীরবে সহ্য করবেন তা হতেই পারে না।

ধর্মমহাসভার নবম দিন ১৯ সেপ্টেম্বর তিনি খ্রিস্টান মুরুব্বিয়ানার বিরুদ্ধে ফেটে পড়লেন—"আমরা যাহারা প্রাচ্য জগৎ হইতে আসিয়াছি, তাহারা এখানে দিনের পর দিন বসিয়া আমাদের প্রতি এইসব মুরুব্বিয়ানার কথা শুনিয়াছি যে, আমাদের খ্রীষ্টান হইয়া যাওয়া উচিত ; কারণ খ্রীষ্টান জাতিরা সর্বাধিক ঐশ্বর্যশালী। আশে-পাশে তাকাইয়া আমাদের চক্ষু পড়ে সর্বাধিক ঐশ্বর্যবান খ্রীষ্টান রাজ্য ইংলন্ডের প্রতি, যাহা পঁচিশ কোটি এশিয়াবাসীকে পদদলিত করিয়া রাখিয়াছে। অতীত ইতিহাসের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া আমরা দেখি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইওরোপের অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয় স্পেন দেশ হইতে ; আর স্পেনের ঐশ্বর্যের সূত্রপাত হয় মেক্সিকো আক্রমণ হইতে। একই রক্তমাংসের মানুষের গলা কাটিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম ঐশ্বর্য অর্জন করে। এমন মূল্যের বিনিময়ে হিন্দুরা ঐশ্বর্য চায় না।"[৯] বলাবাহুল্য,

স্বামীজীর কথাগুলিকে আমেরিকার সত্যানুসন্ধী শ্রোতার দল উচ্চ করতালি ধ্বনিতে অভিনন্দিত করেছিল।

ধর্মমহাসভার নবম দিনে তিনি পাঠ করেন তাঁর 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধ। প্রসঙ্গত জানানো যায়, ধর্মমহাসভার রীতি অনুযায়ী প্রতিটি ধর্মের প্রতিনিধিকেই তাঁদের নিজ নিজ ধর্মের উপর লিখিত বক্তব্য পেশ করতে হয়েছিল। স্বামীজী ১৯ সেপ্টেম্বর ঐ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

হিন্দুধর্ম বিষয়ে স্বামীজী লিখিত বক্তব্যটি এককথায় অনবদ্য। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার প্রথম খণ্ডে সংকলিত সেই বক্তৃতা আগ্রহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন। আমরা কেবল এ বিষয়ে সিস্টার নিবেদিতার মন্তব্য লক্ষ করতে পারি—"ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—যখন তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল 'হিন্দুদের ধর্মভাবসমূহ', কিন্তু যখন তিনি শেষ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম নূতন রূপ লাভ করিয়াছে। ...কেননা সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে তাঁহার নিজের কোন অনুভূতির কথা উদ্‌গত হয় নাই, এমনকি এই অবসরে নিজ গুরুর প্রসঙ্গ অবতারণা করিবার সুযোগও তিনি গ্রহণ করেন নাই। এই দুইটি বিষয়ের পরিবর্তে ভারতের ধর্মচেতনাই তাঁহার মধ্য দিয়া বাঙময় হইয়া উঠিয়াছিল—ভারতের সমগ্র অতীতের দ্বারা সুনির্দিষ্ট তাঁহার দেশের সকল মানুষের বাণী!"[১০]

****

ধর্মমহাসভার শেষদিনেও স্বামীজী সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন : "যদি এই ধর্ম-মহাসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তো তাহা এই : সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতির মধ্যেই অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

"এই-সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখেন যে অন্যান্য ধর্ম লোপ পাইবে এবং তাঁহার ধর্মই টিকিয়া থাকিবে, তবে তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র ; তাঁহার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তাঁহাকে আমি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছি, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির বাধাপ্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে : 'বিবাদ নয়, সহায়তা ; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'"[১১]

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে স্বামীজী কেন বারংবার গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন? এর কারণ আর অন্য কিছু নয়, মানবচরিত্র তার ভাবালুতা, আবেগ প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা এবং সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর ইতিহাসবোধ। ক্রুসেডের হাজার বছর ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস তাঁর জানা। কীভাবে খ্রিস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্টদের উদ্ভব হল তাও তিনি জানতেন। আবার হিন্দুদের নানা শাখা-উপশাখা ও তাদের গোঁড়ামি সম্পর্কেও তিনি

সচেতন ছিলেন। কিন্তু এসবই ঘটে কেবলমাত্র সত্যজ্ঞানের অভাবে—নিজের ও জগতের যথার্থ স্বরূপবোধের অভাবে। তাই তিনি এইসব গোঁড়ামি পরিহার করে সত্যোপলব্ধির দিকে নজর দিয়েছেন।

****

খ্রিস্টধর্মের একটি মূলকথা—আদিম পাপ বাদ, যার মূল কথা হল মানুষ জন্মগতভাবেই পাপী। খ্রিস্ট ও পবিত্র ক্রুশের উপাসনা তাকে ঐ পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে। বলাবাহুল্য, বাইবেলের এই মতবাদ যুক্তিসিদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে বেদান্ত অনুসারে সকল মানুষই স্বরূপত ব্রহ্ম বা পূর্ণ। ভ্রমবশত আমরা আমাদের অপূর্ণ মনে করি।

এ প্রসঙ্গে ঠাকুরের কিছু কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। ১৮৮২ খ্রি. ২৭ অক্টোবর কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে নৌকায় ভ্রমণের সময় ঠাকুর বলছেন : "খ্রীষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে, আমি পড়ে শুনাতে বললুম। তাতে কেবল 'পাপ আর পাপ'| (কেশবের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপ'| যে ব্‌্যক্তি 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বারবার বলে, সে বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হয়ে যায়।"[১২]

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'হিন্দুধর্ম প্রবন্ধে খ্রিস্টানদের এই পাপবাদকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে বললেন : " "Children of immortal bliss"—what a sweet, what a hopeful name! Allow me to call you, brethren, by that sweet name—heirs of immortal bliss—yea, the Hindu refuses to call you sinners. Ye are the Children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divinities on earth—sinners! It is a sin to call a man so ; it is a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep ; you are souls immortal, spirits free, blest and eternal ; ye are not matter, ye are not bodies ; matter is your servant, not you the servant of matter."[১৩]

****

স্বামী বিবেকানন্দ যে শিকাগো ধর্মমহাসভার সর্বাধিক জনপ্রিয় বক্তা এবং তাঁর বক্তৃতাসমূহ যে চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে আলোড়ন ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল—এটি এখন সুবিদিত সত্য। দেশবিদেশের সংবাদপত্র তা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছিল।

আজ এত বৎসর পরে আমরা যখন স্বামীজীর এই অলৌকিক সাফল্যের পর্যালোচনা করি, তখন সর্বাগ্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি কথা মনে পড়ে : "কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগ্য নাই, দুই-চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার।

"লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন। ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায়, তাহলে লোকশিক্ষা দিতে পারে।"[১৪]

আবার ১৮৮৪ খ্রি. ঠাকুর শশধর পণ্ডিতকে উদ্দেশ্য করে বলছেন : "তুমি লোকের মঙ্গলের জন্য বক্তৃতা করছ, তা বেশ। কিন্তু বাবা, ভগবানের আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা হয় না। ওই দুদিন লোক তোমার লেকচার শুনবে, তারপর ভুলে যাবে। হালদার-পুকুরের পাড়ে লোক বাহ্যে করত; লোক গালাগাল দিত কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই। অবশেষে সরকার যখন একটি নোটিস মেরে দিলে, তখন তা বন্ধ হল। তাই ঈশ্বরের আদেশ না হলে লোকশিক্ষা হয় না।"[১৫]

বলাবাহুল্য, নরেন্দ্র সাধনসাগরে ডুব দিয়েছিলেন। তুলে এনেছিলেন উপলব্ধির মণিমাণিক্য। তাই আমরা বলতে পারি যে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভার প্রথমদিন নিজে বক্তৃতা প্রস্তুত করে আনেননি বলে আত্মধিক্কার দিচ্ছেন, আসলে জীবন সাধনার ক্ষেত্রে তিনি সর্বাধিক প্রস্তুতি নিয়েই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র :

১. Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples, 6th Edition, p. 405

২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, খণ্ড-৬, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, সংস্করণ, পৃ. ৩৮০-৩৮১

৩. পত্রাবলী, পৃ. ৯২

৪. বাণী ও রচনা, খণ্ড-১, ৪র্থ সং, পৃ. ৭-৮

৫. Swami Vivekananda in the West New Discoveries, part one, Marie Louise Burke, Advaita Ashrama, Calcutta, 4th Edition 1992, p. 72

৬. ঐ পৃ. ৭১

৭. বাণী ও রচনা, খণ্ড-৫, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৫৮

৮. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol-5, Advaita Ashrama, Kolkata, Subsidizaed Edition 1989, p.64

৯. যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ২য় খণ্ড, স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ ১৩৯৩, পৃ. ৩২-৩৩

১০. ঐ, পৃ. ৩৬-৩৭

১১. বাণী ও রচনা, খণ্ড-১, পৃ. ২৭-২৮

১২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (অখণ্ড), শ্রীম কথিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ৮৮

১৩. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol-1, Advaita Ashrama, Kolkata, Subsidizaed Edition 1989, p.11

১৪. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (অখণ্ড), শ্রীম কথিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ১০৬৪

১৫. ঐ, পৃ. ১০৬৪

ভারতীয় সমাজে শিকাগো বক্তৃতার প্রভাব

দেবব্রত মণ্ডল

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগো শহরের বিখ্যাত কলম্বাস হলে প্রদত্ত এক সন্ন্যাসীর ভাষণ ও সুদূর সমুদ্রপারে দেশ ভারতবর্ষের জেগে ওঠার কাহিনি যে এমন ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে উঠবে তা আধুনিক ঐতিহাসিক অথবা সমাজতাত্ত্বিকের ক্ষুরধার মস্তিষ্কেও বোধ হয় কল্পনার অতীত ছিল। আমেরিকায় বিস্ফোরণ হলে আমেরিকার মাটি কেঁপে উঠবে এতো স্বাভাবিক কিন্তু বিস্ফোরণ হবে আমেরিকায় আর মাটি কাঁপবে ভারতবর্ষে – এও কি সম্ভব ? হ্যাঁ, সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বিজয়ের ঘটনা তারই জীবন্ত ঐতিহাসিক প্রামাণ। স্বামীজীর শিকাগো বিজয়ের ঘটনা আসলে বিশ্বসভায় ভারতবর্ষের আত্মপ্রকাশের ইতিহাস,একটি দেশের জেগে ওঠার ইতিহাস, এক পরাধীন জাতির আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার ইতিহাস। ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের আতীত ইতিহাসে এমনটি আর কাখনও ঘটেনি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় সমাজে স্বামী বিবেকানন্দের সেই শিকাগো ভাষণের পরবর্তী প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব।

আলোচনার পূর্বে প্রথমেই তাই স্বামীজীর শিকাগো ধর্মসম্মেলনে যাবার পূর্বের ভারতবর্ষ কেমন ছিল তার একটু খতিয়ান নেওয়া দরকার। পরবর্তীকালের ভারতীয় সমাজে এই ধর্মসম্মেলন ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব নির্ণয়ে যা সহায়ক হবে।

সমকালীন ভারতবর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দের সমকালীন ভারতবর্ষ তখন এক পরাধীন দেশ,ভারতবাসী এক আত্মবিশ্বাসহীন জাতি। উন্নতির তৃষ্ণাহীন, আত্মমর্যাদাবোধশূন্য, চেষ্টাহীন, অপরের অনুকরণপ্রিয়, উদ্যমশূন্য, পরমুখাপেক্ষি, উৎসাহহীন, আশাহীন, বলশূন্য শত শত বৎসরের দাস এক জাতির অন্তঃসারশূন্য চিল চীৎকারে পূর্ণ শ্মশানভূমি তৎকালীন ভারতবর্ষ। স্বামীজীর নিজের বর্ণনাতেই পাওয়া যায়, "দুর্ভেদ্য তমসাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই,মনে বল নাই,অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা,স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলের 'যেন তেন প্রকারেণ' সর্বনাশ-সাধনে একান্ত ইচ্ছা,আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহন। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য-প্রদর্শনে,ভক্তি স্বার্থ সাধনে, জ্ঞান অনিত্যবস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিত্ব কটু-ভাষণে, ভাষার উৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লীলতা-বিকিরণে"।[১] বাস্তবের চাঁছাছোলা বর্ণনা – এক নির্ভিক সান্ন্যাসীর কলমে। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল নিজ অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি স্মরণে লজ্জা আর বিদেশীদের মদিরাতে পর্যন্ত শ্রদ্ধা। পাশ্চাত্য অনুকরণ মোহ দিন দিন এমন বাড়ছিল যে ইংরেজ যা বলে তাই ভাল, ইংরেজ যা ভাবে তাই মূল্যবান। এ দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল মূল্যহীন ও কুসংস্কারপূর্ণ। তার কোন দাম ছিল না। বেদ উপনিষদ যেন চাষার গান মাত্র, তার মধ্যে কোন মূল্যবান কিছু নেই। কারণ ইংরেজরা বেদ উপনিষদ পাঠ করে না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু মানুষের দেশীয় পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে খাদ্যাভ্যাস ও রীতি-নীতিতে পর্যন্ত ঘৃণা এমন পর্যায়ে বাড়ছিল যে হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যাতা ও সংস্কৃতি যেন দেশ ত্যাগ করে হিমালয়ের গিরি গুহায় নির্বাসনে যাবার উপক্রম। অন্যদিকে পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, বেশ-ভুষা আচার প্রভৃতি অবলম্বনে আমরা পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় উন্নত হব – এই রকম ধারণা সমাজদেহে দৃঢ় হচ্ছিল দিন দিন। স্বামীজীরই বলে যাওয়া তৎকালীন একটি ঘটনা এ বিষয়ে আলোকপাতের জন্যে যথেষ্ট, "কোন অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'বুঝি কোন ইংরেজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল'।"[২] স্বামীজী হতাশা ব্যক্ত করেছেন এসব দেখে। আর লিখেছেন, "হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য-অনুকরণ-মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি বিচার শাস্ত্র বা বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে,তাহাই মন্দ..."।[৩] পরিস্থিতি এমনই হয়ে উঠেছিল দিন দিন। এ পর্যন্তও মানা যায় যদি নিজস্ব প্রতিভায় উজ্জ্বল, নিত্য নতুন উদ্ভাবনী শক্তিতে ভরপুর,স্বাধীনতার নেশায় পাগল, উন্নতির আশায় ফুটন্ত এক প্রাণপ্রদ বলবীর্য চিহ্ন ভারতীয় জাতির মধ্যে লক্ষ করা যেত সে সময়। কিন্তু তা দূর-অস্ত। পরিবর্তে আশাহীন, ভরসাহীন, বিশ্বাসহীন, আত্মমর্যাদাবোধশূন্য, দরিদ্র, দুর্বল, অস্থি-কঙ্কালসার কোটি কোটি এদেশীয় শরীর যেন

শ্মশানের দ্বারপ্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ভারতবর্ষের গলি থেকে রাজপথে, নগর থেকে গাঁয়ে-গঞ্জে। এই ছিল সেদিনের ভারতবর্ষ। মানুষের মনে পরাধীনতার জ্বালা নেই, দাসত্ব শৃঙ্খল দূর করার কোন চেষ্টা নেই, কোন পরিকল্পনা নেই, নিজেদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করার কোন উদ্যম নেই, উদ্যোগ নেই, এমনকি পূর্বপুরুষগণের কাছ থেকে পাওয়া কৃষিজমিতে কিভাবে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগে আরও উন্নততর উপায়ে ফলন বাড়ানো যায় সে সম্বন্ধে কোন চিন্তাভাবনা নেই, স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের শক্তি অথবা সাহস কোনোটাই নেই। পরিবর্তে নিজস্ব জমিতে দুটো হাড় জিরজিরে বলদ আর পিতৃ-পিতামহের কাছ থেকে পাওয়া লাঙ্গলের ফলা নিয়ে চাতক পাখির মত বৃষ্টির জলের প্রত্যাশায় কোনমতে চাষটি সম্পন্ন করে সারা বছর ধরে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে বসে হুঁকোসহ তাস দাবা পাশা আর গালগল্পে দিন কাটানো ছিল। বাইরের দুনিয়া যে কত এগিয়ে গেল,কত নিত্য নতুন আবিষ্কারে সভ্যতার কত পরিবর্তন ঘটে গেল, কত শিল্পবিপ্লব, যন্ত্রবিপ্লবে পৃথিবী তোলপাড় হয়ে উঠল—সে সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, কোন চর্চা নেই। আর তার ফল–হাজার বছরের দাসত্ব আর তার সাথে হীনমন্যতা। বিদেশীদের সব ভাল আর আমাদের সব মন্দ। ভাল না হলে তারা এত প্রবল হল কি করে ? বিদেশীদের বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, বর্ণময় পরিচ্ছদ, গর্বোদ্ধত ভোগ বিলাসিতা আর আমাদের অর্ধ উলঙ্গ আদুড় গা, আধ পেটা আহার, আর কুসংস্কারে পরিপূর্ণ পুরাতনী রীতি রেওয়াজ—হীনমন্যতা বাড়াল দিন দিন।

ঠিক সেই সময়ে সুদূর সমুদ্রপার থেকে বার্তা এল– হিন্দু সন্ন্যাসী আমেরিকায় গিয়ে বিভিন্ন ধর্মের শ্রেষ্ঠ বক্তাদের মাঝে আমাদের ধর্ম ও দর্শনকে তুলে ধরে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করেছেন। চমকিত হল বিশ্ব, ততোধিক চমকিত হল ভারতবাসী। জনে জনে বার্তা রটে গেল – আমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ, আমাদের প্রতিনিধি শ্রেষ্ঠ। বিদ্যুতের চমক খেলে গেল কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর দিকে দিগন্তরে। কৌতুহলী নয়নে ভারতবাসী একবার মাথা তুলে দাঁড়াল। কে এই সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ যার উদাত্ত আহ্বানে জগৎ মাতোয়ারা? কে এই প্রতিভাবান বাগ্মী যার বসন প্রান্ত স্পর্শের জন্য আমেরিকার বাছা বাছা শিক্ষিত তরুণ-তরুণী পাগল ? ইনি আমাদেরই একজন? ভাবতেও অবাক লাগে ভারতবাসীর। তারপর এল সেই দিন – ১৫ জানুয়ারি, ১৮৯৭, স্বামীজীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাহেন্দ্রক্ষণ। স্বামীজী কলম্বোয় প্রথম ভারতের মাটিতে পদার্পণ করলেন।

প্রথম শিহরণ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল গোটা দেশ—

এদিকে ভারতবর্ষে বসে বাংলা, ইংরেজী, স্বদেশী, বিদেশী নানান সংবাদপত্র পাঠে সুদূর আমেরিকায় ভারতীয় সন্ন্যাসীর বিজয়গাথা শুনে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল একটা গোটা দেশ। আত্মসম্বিত ফিরে পেল এক মৃতপ্রায় জাতি। আপামর হিন্দুস্থান জেগে উঠল। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ আসমুদ্রহিমাচলে যেন একটা সাড়া জাগল। এক ঘুমন্ত দৈত্য যেন আপন গম্ভীর দীর্ঘনিদ্রা পরিত্যাগ করে জেগে উঠতে শুরু করল। আর সেই জাতীয় জীবনে প্রাণের চঞ্চলতা ও শক্তির স্পন্দন সৃষ্টি হল স্বামীজীর স্বাদেশ প্রত্যাবর্তনে। পরবর্তীকালে

সে ঘটনার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ‘চিরজীবী বিবেকানন্দ’ পুস্তিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়— “... বার বার দেশে ফেরার ডাক, দীর্ঘদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম ও প্রতিনিয়ত ভারতের অগণিত অবহেলিত নিরন্ন মানুষের দুঃখে অস্থির হয়ে স্বামীজী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে ব্যস্ত হল। তখন ইংলণ্ডে, হঠাৎ ঘোষণা করলেন তিনি ভারতে ফিরছেন আর রওনা হয়ে পড়লেন। ভারতে সে সংবাদ পৌঁছালে আনন্দের ঢেউ উঠল। কেমন করে ভারতের এ হেন সন্তানকে সম্বর্ধনা দেওয়া যায় তার পরিকল্পনা চলতে লাগল সর্বত্র। স্বামীজীকে নিয়ে জাহাজ এসে কলম্বো বন্দরে পৌঁছাল। বিপুল জনতা স্তোত্র পাঠ ও বাদ্যবাদনের মধ্যে তাঁকে স্বাগত জানাল। বহু ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হয়ে পদধূলি গ্রহণ করল। গঙ্গাবারি প্রোক্ষণ ও পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল। বহু সধ্বজ সুসজ্জিত তোরণ পথে শোভাযাত্রা সহকারে সভাস্থলে নিয়ে গেলে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সম্বর্ধনা দিলেন। স্বামীজী শান্তভাবে সব দেখে উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন, এক ভিখারী সন্ন্যাসীকে এমন রাজকীয় সম্বর্ধনা দেওয়া থেকে এ দেশের নরনারীর আধ্যাত্মিক সম্পদের পরিচয়ই প্রকাশিত হয়। এমনই চলল সর্বত্র। রামনাদে স্বামীজীর গাড়ীর ঘোড়া সরিয়ে রামনাদের রাজা সহ অনেকে তাঁর গাড়ী টানলেন। স্বামীজীর মন কিন্তু পড়ে আছে কী করে ভারতের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙবে, কি করে ভারত আবার নিজের পায়ে দাঁড়াবে, কী করে অগণিত মূর্খ দরিদ্রদের দুঃখ দূর হবে। ভারতকে সেই বাণী শোনাতে থাকলেন কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত”।[৪] জাগানিয়া গান গেয়ে চললেন স্বামীজী। “বিশ্বাস বিশ্বাস, নিজেদের উপর বিশ্বাস! তোমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতায় ও বিদেশ থেকে নবাগত সমস্ত দেবতায় বিশ্বাস থেকেও যদি নিজের প্রতি বিশ্বাস না থাকে, তবে তোমাদের মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। নিজেদের প্রতি বিশ্বাস জাগাও ও সে বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে ওঠ। যারা সমাজ সংস্কার করতে চাও, দেশপ্রেমী হতে চাও, তারা কি সহানুভূতি করতে জান? তোমরা কি কোটি কোটি মানুষের অশেষ দুর্গতি প্রাণে অনুভব কর? যারা যুগ যুগ ধরে অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, যারা চিরকাল অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়ে আছে তাদের কথা ভাবতে ভাবতে তোমাদের কি ঘুম চলে গেছে ? তোমরা কি পাগল প্রায় হয়েছ ? তাদের দুরবস্থার চিন্তায় কি তোমরা নিজেদের নাম, যশ, স্ত্রী পুত্র, সম্পদ, এমন কি নিজেদের দেহের কথা ভুলেছ ? এমন হয়ে থাকলে দেশপ্রেমী হবার চেষ্টায় প্রথম ধাপে পা দিয়েছ। শতাব্দির পর শতাব্দি তাদের শুধু বলে আশা হয়েছে, তারা কিছু নয়, সারা দুনিয়ায় তাদের বলা হয়েছে তারা মানুষ নয়। তাদের কখনও সব শক্তির উৎস অবিনাশী আত্মার কথা শোনানো হয় নি। প্রত্যেক স্ত্রী পুত্র বালক বালিকাকে, জাতি জন্ম শক্তিমত্তা বা দুর্বলতা বিচার না করে শোনানো প্রয়োজন যে উচ্চ নীচ সকলের ভেতরেই এক অনন্ত সত্তা আছে যা প্রত্যেকের ভেতরের অনন্ত সম্ভাবনা ও ক্ষমতাকে জাগিয়ে সৎ ও মহৎ করে তুলতে সমর্থ। ওঠ, ওঠ, জাগো! দুর্বলতার মোহ নিদ্রা থেকে জেগে ওঠ। আসলে কেউ দুর্বল নয়। সকলের সত্তাই অনন্ত, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞানের আধার। দাঁড়িয়ে উঠে নিজের সত্তাকে ঘোষণা কর, অস্বীকার কোরো না। ... ...বিবেকানন্দের হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত ভাব বজ্রকণ্ঠ নিনাদে প্রকাশিত হয়ে জাতীয় জীবনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করল, ধমনীতে নতুন রক্তপ্রবাহ, স্নায়ুতে অচেনা অনুরণন। পরাধীনতার শৃঙ্খলভার

অসহনীয় হয়ে উঠল, মানব-মর্যাদার অবমাননা মনকে দহন করতে থাকল। নানা ভাবে নানা খাতে প্রতিবিধানের পন্থা গড়ে উঠতে লাগল।"[৫]

ভারতের নবজাগরণ

ভারতের নবজাগরণে এই উন্মাদনা এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করল, জাতীয় জীবনে শক্তির স্পন্দন সৃষ্টি হল। পরাধীন ভারতবর্ষে আর কোন ঘটনা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী আসমুদ্রহিমাচলে এমন চঞ্চলতা এনে দেয়নি। বাংলা, ইংরেজি, স্বদেশি, বিদেশি সংবাদপত্রে এই ঘটনার সবিস্ময় উল্লেখ ও প্রশংসা, ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে জাতির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে ধন্যবাদ সভা আয়োজন, ভারতীয়দের বিদেশযাত্রা (সমুদ্রযাত্রা) বিষয়ে উৎকট ধারণার বিবর্তন, জাতি হিসেবে হাজার বছরের কূপমণ্ডূক মানসিকতার পরিবর্তন, বিদেশীদের কাছ থেকেও শেখার মানসিকতার সৃষ্টি, সর্বোপরি জাতির জীবনে আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা নিল। কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত স্বামীজীর যুগোপযোগী বক্তৃতামালার সুদূরপ্রসারী প্রভাব এ দেশের নবজাগরণে নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করল। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ত্বরান্বিত হল।

ত্বরান্বিত স্বাধীনতা আন্দোলন

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিটি রক্তবীজ থেকে শত শত দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর প্রাণ প্রস্তুত হতে লাগল। ঢাকায় বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ ও তার দলবলের স্বামীজীর সাথে সাক্ষাৎকার, অনুশীলন সমতির সদস্যদের উপর স্বামীজীর প্রভাব, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) সাথে স্বামীজীর সাক্ষাৎকার ও তাঁর উপর স্বামীজীর প্রভাব, বেলুড় মঠে তৎকালীন প্রথম সারির লোকপ্রিয় কংগ্রেসি নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকের সাথে স্বামীজীর একাধিকবার সাক্ষাৎকার ও একান্ত আলাপচারিতা (যার ফলস্বরূপ তাঁর কংগ্রেসি নরমপন্থী আবেদন নিবেদন নীতি থেকে 'স্বরাজ ছিনিয়ে আনার' চরমপন্থায় মত পরিবর্তনের মত উল্লেখযোগ্য ঘটনা), স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্নিকন্যা নিবেদিতার প্রত্যক্ষ সাহচর্য, মাষ্টারদা সূর্য সেন, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামীজীর মেজভাই), প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার থেকে শুরু করে রাসবিহারী বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, রাজা গোপালাচারি, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবর্গের উপর স্বামী বিবেকানন্দ নামক দেশপ্রেমের জ্বলন্ত আগুনের প্রত্যক্ষ প্রভাব, বহু নরমপন্থী, চরমপন্থী, কংগ্রেসি, অ-কংগ্রেসি, বিপ্লবী সমিতি, সোসাইটির ইতিহাস, বহু জীবনীর অজানা তথ্য আজ সাক্ষ্য দেয় স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় শত শত বিপ্লবীর প্রাণ প্রস্তুত হওয়ার ঘটনার। যার সম্মিলিত ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হয়। এসবই এত দ্রুত (মাত্র প্রায় পঞ্চাশ বছরে) ঘটত না, যদি না শিকাগো মহাসভাখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সর্বভারতীয় সমাজ জীবনে পড়ত, যদি না স্বামীজীর প্রেরণায় শত শত যুবক দেশের কল্যাণে আত্মবলিদানে প্রস্তুত হত। স্বামীজী রচিত 'স্বদেশ মন্ত্রে'র 'ভুলিও না, তুমি জন্ম

হইতেই মায়ের (দেশ মায়ের) জন্য বলি প্রদত্ত’ এই মহাবাক্য সেদিন বহু যুবকের জীবনের বেদবাক্য হয়েছিল।

আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্র শিল্পায়নে তৎপরতা

শুধু তাই নয়, একটা দেশ স্বাধীন বা পরাধীন যাই হোক না কেন, উন্নত হতে গেলে চাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নতি, কৃষি ও শিল্পে আধুনিক বিজ্ঞানের মেলবন্ধন। শিল্প ও আধুনিক বিজ্ঞানে উন্নত আমেরিকাসহ পাশ্চাত্য দেশগুলিকে দেখে একথা ভাল ভাবেই বুঝেছিলেন স্বামীজী। শুধু তাই নয়, আরও স্পষ্টভাবে বললে বলা যায় যে একথা শিখতেই স্বামীজীর পাশ্চাত্য দেশে গমন (অবশ্য আমেরিকায় পৌঁছানোর আগেও স্বামীজী এই মত পোষণ করতেন। পাশ্চাত্যে যাবার পথে জামসেদজী টাটার সাথে স্বামীজীর সাক্ষাৎকার ও জামসেদজীর এ দেশে কারখানা স্থাপনের ইতিহাসই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ)। সে যাই হোক, স্বামীজীর পাশ্চাত্য গমনের উদ্দেশ্যই ছিল ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করার উপায় অনুসন্ধান করা। কীভাবে পাশ্চাত্য এত উন্নত হল, কেনই বা ভারতবর্ষ এত পিছিয়ে, উন্নত দেশগুলির উন্নতির রহস্য কী, দরিদ্র নিরন্ন ভারতবাসীর অন্নাগমের নিত্য নতুন রাস্তা কী, পারলৌকিক নয় ইহলৌকিক উন্নতির উপায় কী—এসব জানতেই স্বামীজীর পাশ্চাত্য যাত্রা। একথা স্বামীজী নিজেই বলেছেন। আর তাই শিকাগো মহাসভা পরবর্তীকালে তিনি বললেন, দেশকে প্রগতির পথে পা বাড়াতে হলে তাকে আধুনিক বিজ্ঞান সহযোগে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যে উৎসাহী হতে হবে। বিভিন্ন ঘরোয়া আলোচনায়, ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে, প্রবন্ধে এ বিষয়ে স্বামীজী ক্রমাগত উৎসাহ প্রদান করেছেন। দেশের জনগণকে Material Development, Science and Technology বিষয়ে উৎসাহী করা, ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের জন্য Technical Education, Industry, Workshop নির্মাণে জোর দেওয়া, শিল্প ও কৃষির অন্ধি-সন্ধিতে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া ইত্যাদি বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সন্ন্যাসী হয়েও স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা ও আবদান ছিল তৎকালীন বহু রাজনৈতিক নেতৃবর্গ অপেক্ষাও অনেক অনেক বেশি আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক। এক্ষেত্রে উদাহারণস্বরূপ পূর্বে কথিত জামসেদজী টাটার রাঁচী হাজারিবাগ অঞ্চলে বৃহৎ শিল্প কারখানা স্থাপন বিষয়ে স্বামীজীর পরামর্শের কথা স্মরণ করা যায় (ঘটনাটি অবশ্য স্বামীজীর পাশ্চাত্য গমনের সময় জাহাজেই ঘটেছিল)। কিন্তু স্বামীজীর সাথে জামসেদজী টাটার সাক্ষাৎ না ঘটলে কারখানাটি হয়তো এদেশে হয়েই উঠত না। এ বিষয়ে স্বামীজীর মেজভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের সাক্ষ্য অত্যন্ত মূল্যবান। দ্বিতীয় ঘটনাটি হল আমেরিকা ফেরত স্বামীজীর ওই একই ব্যক্তিকে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপনেও একইভাবে উৎসাহ ও পরামর্শদান। বর্তমানে যা TIFR (Tata Institute of Fundamental Research) নামে আধুনিক ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানসহ দেশের শোভা বর্ধন করছে। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধি প্রমুখ প্রথমসারির রাজনৈতিক নেতৃবর্গও যখন কুটির শিল্প দ্বারা আধুনিক ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে আস্থাশীল তার বহু আগেই স্বামীজী বৃহৎ শিল্প কারখানা

স্থাপনের মধ্য দিয়ে আধুনিক ভারতের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গঠনে সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক বিশ্বের উন্নত দেশগুলির দিকে তাকালে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে দেশের জনগণের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ও সমৃদ্ধির জন্য পুঁজিপতি ও তাদের বৃহৎ Industry, Workshop প্রভৃতির কোন বিকল্প এখনও তৈরি হয়নি। এ বিষয়ে স্বামীজীর চিন্তাধারা তাই পথিকৃতের।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এবং তার প্রভাব

ভারতীয় সমাজে শিকাগো ফেরৎ স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব আলোচনা করতে গেলে স্বামীজীর নিজ হাতে গড়া রামকৃষ্ণ সংঘের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। ১৮৯৭ সালের ১ মে কোলকাতার বাগবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাধন্য বলরাম বসুর বাড়িতে ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ অ্যাসোসিয়েশন বা ‘রামকৃষ্ণ প্রচার’ সমিতি প্রথম গঠিত হয় স্বামীজীর উপস্থিতি ও তত্ত্বাবধানে। যদিও ইতিপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধান পর্ব থেকেই রামকৃষ্ণ সংঘ প্রায় একপ্রকার ঠাকুরের তত্ত্বাবধানেই বলা যায় মঠ আকারে পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু নিয়মানুসারে এর কোন সাংগঠনিক চেহারা এতদিন ছিল না। অন্যদিকে ঠাকুরের তিরোধানের পর থেকেই স্বামীজী ভাবছিলেন কীভাবে তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে পাওয়া মহান ভাব ও আদর্শ ভবিষ্যৎ ভারত কল্যাণের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা যায় ও তাকে সমাজ কল্যাণোপযোগী করে ব্যবহার করার জন্য একটা কার্য্যকরী পন্থা নির্ধারণ করা যায়। স্বামীজী প্রায়ই বলতেন, ‘আমি এমন একটা যন্ত্র স্থাপন করে যেতে চাই যা ভবিষ্যতে বহুকাল ভারতবর্ষের কল্যণের জন্য কাজ করে যাবে।’ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন হল স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সেই যন্ত্র যা সমাজ ও জাতির কল্যাণে স্বামীজী স্থাপন করেছিলেন। স্বামীজী নির্দেশিত এর কার্যপ্রণালীর মধ্যে আন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ছিল ‘মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি’ সাধন।[৬] এদেশের প্রাক স্বাধীনতাপর্ব থেকেই নিস্বার্থ জনসেবাকার্য থেকে শুরু করে, বিপ্লবীদের স্নেহ আশীর্বাদদান ও প্রয়োজনে নীরবে নিভৃতে তাঁদের আহার ও আশ্রয়দান, জনসচেতনতা প্রসারে পত্র পত্রিকা পরিচালনা, উচ্চাঙ্গের প্রকাশনা সংস্থা পরিচালনাসহ বহু জীবন ও চরিত্রগঠনে সহায়ক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ সর্বোপরি বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ত্রাণ ও সেবাকার্য পরিচালনা ও এদেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে দীর্ঘকালব্যাপী সুনাম অর্জনকারী নানান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনাসহ নানাবিধ সমাজকল্যাণকারী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে একশত বছরেরও অধিক কাল ধরে এই সংঘের ত্যাগী সন্ন্যাসীমণ্ডলী ভারতবর্ষের উন্নতি ও সেবাকল্পে নিস্বার্থভাবে ‘শিব জ্ঞানে জীব সেবার’ মহতী আদর্শে নিরবিচ্ছিন্ন পরিশ্রমে কাজ করে চলেছেন। ভারতবর্ষীয় সমাজে রামকৃষ্ণ সংঘের এই অবদান ও প্রভাবের কথা নত মস্তকে স্বীকার করতে হয়। যার প্রকাশ্য ও নিভৃত প্রভাবে ভারতীয় সমাজ-দেহের নানান দিকে ও নানা খাতে অগণিত তরতাজা জীবনের ফুল সমাজকে শক্তিশালী করতে নিজ নিজ জীবনের সুগন্ধ সৌরভ বিস্তার করেছে বহু ভাবে বারে বারে।

প্রভাব থেমে থাকল না এখানেও। স্বাধীন দেশ, স্বাধীন বেশ; গণতন্ত্রের ধ্বজা নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বার বার হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে লাগল সৎ, দেশপ্রেমিক, খাঁটি, চরিত্রবান মনুষ্যত্বের অভাবে। স্বাধীন দেশে আবারও প্রয়োজন হল স্বামীজীর মানুষ তৈরির চিন্তাধারার। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতার কুড়ি বছর পর শহর কলকাতায় গড়ে উঠল দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত যথার্থ মানুষ তৈরির মহতী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্বামীজীর নামে এক অরাজনৈতিক যুব প্রতিষ্ঠান–অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল। কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ও প্রান্তে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী যুবকদের নিয়ে স্থানে স্থানে গড়ে উঠেছে এর বিভিন্ন শাখা সংগঠন, যাদের একমাত্র লক্ষ্য হল দেশের আশা ভরসা স্বরূপ যুবকদের সংগঠিত করে সৎ চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে স্বদেশ ও সমাজ কল্যাণে নিয়োজিত করে দেশের আশু কল্যাণকে ত্বরান্বিত করা। বর্তমানে দেশে একমাত্র অভাব হল চরিত্রবান মানুষের। যথার্থ ভাল মানুষের অভাবে আজ সরকারের বহু পরিকল্পনা ও অর্থ নষ্ট হচ্ছে দিকে দিকে। দেশে আইন অনেক আছে, মতবাদ অনেক, পরিকল্পনা অনেক; কিন্তু সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করবে যে মানুষ তারা যদি সৎ, চরিত্রবান, পরকল্যাণকারী ও হৃদয়বান না হয় তবে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। হচ্ছেও তাই বর্তমানে। এজন্যই স্বামীজী বারবার বলতেন, "পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ কোন আইন দ্বারা কখনো কোন জাতি উন্নত বা ভাল হয় না, কিন্তু সেই জাতির অন্তর্গত লোকগুলো উন্নত ও ভাল হলেই জাতি বা দেশের ভাল হয়"।[৭] আর এ জন্যই স্বামীজী বলতেন, "মানুষ চাই, মানুষ চাই,আর সব হইয়া যাইবে।" বলতেন, "...অতএব আগে মানুষ তৈরি কর।" এই মানুষ হওয়া ও মানুষ গড়ার মহতী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিগত পাঁচটি দশক ধরে অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল দেশের যৌবনোজ্জ্বল যুবশাক্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার কাজটি করে চলেছে নীরবে নিরলসে। ইতিমধ্যেই দেশের যেখানে যেখানে এই সংগঠন গড়ে উঠছে সেখানে সেখানে সমাজের বুকে তার ইতিবাচক ও সমাজ কল্যাণকারী প্রভাব পরিলক্ষিত হতে দেখা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। রাজনৈতিক সংস্রব সম্পূর্ণ পরিহার করে দেশের যুব সমাজকে সৎ, চরিত্রবান, পরকল্যাণকারী ও হৃদয়বান সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলার এই মহতী প্রয়াস অনাগত ভবিষ্যতে কতটা সুফল এনে দেয় দেশের আগামী প্রজন্ম তার উত্তর জরিপ করবে।

তথ্যসূত্র :

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড
২। ঐ, পৃ. ১৯৩
৩। ঐ, পৃ. ১৯৩
৪। 'চিরজীবী বিবেকানন্দ', পৃ. ১৬-১৮
৫। ঐ, পৃ. ২০-২৩
৬ স্বামি শিষ্য সংবাদ, পূর্ব কাণ্ড, সপ্তম বল্লী, পৃ. ৩৭
৭। বাণী ও রচনা ৯, পৃ. ২৮৭

১৮৯৩ সালের শিকাগো ধর্মমহাসভা : এক অখ্যাত সন্ন্যাসীর বিখ্যাত হয়ে ওঠার কাহিনি

অতনু কুণ্ডু

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর।
আমেরিকার শিকাগো শহরের আর্ট ইন্সটিটিউটের বিখ্যাত কলম্বাস হল।
মঞ্চে উপবিষ্ট পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মের বাছাই করা প্রতিনিধিগণ। রয়েছেন আমেরিকার রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মযাজক কার্ডিনাল গিবনস। সম্মুখে আমেরিকা তথা সারা বিশ্ব থেকে আগত প্রায় সাত হাজার বিদগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী। এহেন পরিবেশে সভামঞ্চে আসীন আপাদমস্তক গৈরিক বসনাবৃত দীর্ঘদেহী ত্রিশবর্ষীয় এক সন্ন্যাসী। মুখমণ্ডলে তাঁর অপূর্ব দীপ্তির বহিপ্রকাশ। দর্শকগণ স্বাভাবিকভাবেই বিচিত্র পোষাক পরিহিত এই তরুন সন্ন্যাসীর প্রতি আকর্ষিত হলেও তাঁর মনে কিন্তু চিন্তার দোলাচল। এতদিন পর্যন্ত যিনি কখনই সেই অর্থে বক্তৃতা করেননি, যিনি তৈরি করা ভাষণের বুলি আওড়াতে মোটেই অভ্যস্ত নন, স্বদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে আগমন যাঁর কাছে এই প্রথম, তিনি এই সুবৃহৎ জনতার সামনে বক্তব্য রাখবেন কী করে! ভাবলেই যেন গলা শুকিয়ে যায় স্বামী বিবেকানন্দের। তার উপর অহরহ নিনাদিত হচ্ছে বাঘাবাঘা সব ধর্মপ্রচারকগণের বজ্রগম্ভীর বাক্যচ্ছটা। কাজেই ত্রিশ

জনের পর ডাক পড়লেও স্বামীজী এগোতে সাহস করলেন না। "না, এখন নয়" বলে তিনি বেশ কয়েকবার পাশ কাটিয়ে গেলেন। অবশেষে উক্তদিবসের অধিবেসনের অন্তিমলগ্নে সভাপতি মহাশয় একপ্রকার জোর করেই তাঁকে বক্তৃতাদানের জন্য আহ্বান জানালেন। স্বামীজীও অনন্যোপায় হয়ে আসন ত্যাগ করে সুবৃহৎ দর্শকমণ্ডলীর সামনে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখমণ্ডল তখন রক্তিম আভায় রঞ্জিত। দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করে সম্মুখস্থ জনতার উদ্দেশ্যে একপ্রকার স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যেন বেরিয়ে গেল আমেরিকাবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর সেই বিখ্যাত সম্বোধন "Sisters and Brothers of America"। মুহূর্তমধ্যে তুমুল করতালিতে নিনাদিত হয়ে উঠল সেই সভাকক্ষ আর তা প্রায় দু'মিনিট ধরে চলতে লাগল। এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে – "I was at the Parliament of Religions in Chicago in 1893 … When that young man (Swami Vivekananda) got up and said, 'Sisters and Brothers of America', seven [?] thousand people rose to their feet as a tribute to something they knew not what." [১] আরো দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে স্বামীজী বলে যেতে লাগলেন এক উদার ও বিশ্বজনীন ধর্মের কথা যার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র নেই। মুগ্ধ বিস্ময়ে বিশ্ববাসী শুনতে লাগল অশ্রুতপূর্ব সেই সমস্ত চিন্তাধারা যা ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের মূল ভিত্তি। মাত্র পাঁচ মিনিটের এক বক্তৃতায় বস্তুত তিনি যেন সারা বিশ্বকেই জয় করে ফেললেন।

স্বামীজীর শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান ছিল এক সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ঘটনা। ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য তাঁর না ছিল কোনো আমন্ত্রণ পত্র, না তিনি ছিলেন কোনো বিশেষ ধর্মের সক্রিয় ধর্ম-প্রচারক। এক প্রকার দৈব নির্দেশেই যেন স্বামীজীর আমেরিকায় আগমন ও ধর্মমহাসভায় যোগদান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বপ্নাদেশ, শ্রীমা সারদাদেবীর সম্মতি, কিছু অন্তরঙ্গ ব্যক্তিবর্গের সবিশেষ উৎসাহ, খেতড়ির মহারাজা অজিত সিংহ তথা কিছু মাদ্রাজী যুবকের অর্থানুকূল্য এবং সর্বোপরী নিজ ইচ্ছাশক্তির বশবর্তী হয়ে স্বামীজীর আমেরিকায় আগমন। ধর্মমহাসভা আয়োজনের সংবাদ পাবার পরেই স্বামীজী অজ্ঞাতসারেই তাঁর গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেছিলেন – "এই যে আমেরিকায় এইসব যোগাড়যন্ত্র হচ্ছে শুনেছ, তা সব এইটের (নিজের শরীর দেখিয়ে) জন্য। আমার মন আমায় এ-কথা বলছে, শীঘ্রই দেখতে পাবে।" [২]

তবে নিছক ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্যই কিন্তু স্বামীজীর আমেরিকায় গমন নয়। স্বামীজীর পাশ্চাত্য গমনের উদ্দেশ্য ছিল বহুবিধ। মেরী লুই বার্কের মতে, "The Swami himself felt a deep urge to go to America, not so much to represent Hinduism as to obtain financial help and thus put his plan into operation." [৩] স্বামীজীর নিজের কথাতেও যেন তার সমর্থন পাওয়া যায়। মাদ্রাজে প্রদত্ত 'আমার সমরনীতি' শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী স্পষ্টতই বলেছেন – "তোমরা অনেকেই জানো, আমেরিকায় ধর্মমহাসভা হইয়াছিল বলিয়া আমি সেখানে যাই নাই, দেশের জনসাধারণের দুর্দশা দূর করিবার জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল। আমি অনেক বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি, কিন্তু আমার স্বদেশবাসীর জন্য কাজ করিবার কোন সুযোগ পাই নাই। সেই জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়াছিলাম। তখন তোমাদের মধ্যে যাহারা আমায় জানিতে,

তাহারা অবশ্য একথা জানো। ধর্মমহাসভা লইয়া কে মাথা ঘামায়? এখানে আমার নিজের রক্তমাংস-স্বরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে, তাহাদের খবর কে লয়?"[৪] আবার বিখ্যাত বিবেকানন্দ গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা গমনের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ – "প্রথমতঃ, পরিব্রাজক অবস্থায় তাঁর ভিতরে যে-প্রচণ্ড শক্তির স্ফূরণ হয়, এবং তিনি বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে নিজ প্রতিভা সম্বন্ধে প্রশস্তি শুনে যে-প্রবল আত্মবিশ্বাস বোধ করেন – সেই শক্তি 'একটা কিছু করতে হবে' এই যন্ত্রণায় তাঁকে অস্থির করে তোলে – সেই 'একটা কিছু'র মধ্যে পাশ্চাত্ত্যযাত্রা পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি অনুভব করতে পারেন – ভারতীয় ধর্মের যথার্থ রূপ বাইরে প্রচার করা দরকার। খ্রীস্টান মিশনারিদের বিকৃত ব্যাখ্যা, তাতে ভারতীয় সংস্কারকগণের সলজ্জ সমর্থন, তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকেছিল। এবং এ-ব্যাপারে আরও বড় কথা, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে যা পেয়েছিলেন তাকে উন্মোচন করবার উৎকণ্ঠা বোধ করছিলেনই। সকল রামকৃষ্ণ-ভক্ত অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্ববাণীকে তিনিই পূর্ণাঙ্গিকভাবে অনুভব করেছিলেন; বুঝেছিলেন যে, কেবল ভারতীয় ধর্মজাগরণে ব্যবহার করাই নয়, ঐ মেসেজ বৃহত্তর বিশ্বে প্রচারের প্রয়োজন আছে – সেজন্য পাশ্চাত্ত্যে যাওয়া দরকার।"[৫]

স্বামীজীর ধর্মমহাসভায় যোগদানের পথ কুসুমাস্তীর্ণ মোটেই ছিল না, বরং তা ছিল বহুলাংশে কন্টকাকীর্ণ। আমেরিকা যাবেন বলে মনস্থির করার পরেও স্বামীজী বেশ কিছু অসুবিধার মধ্যে পড়েন। মূল অসুবিধা হল আমেরিকা যাবার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা এক কপর্দকহীন সন্ন্যাসী পাবেন কোথা থেকে? হরিপদ মিত্রের স্মৃতিকথা থেকে পাই – "একদিন স্বামীজী বললেন, '...শিকাগোয় ধর্মসভা হবে, যদি তাতে যাবার সুবিধা হয় তো সেখানে যাব।' আমি চাঁদার লিস্ট করে টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব করায় তিনি কি ভেবে স্বীকার করলেন না। সে-সময় স্বামীজীর ব্রতই ছিল, টাকাকড়ি স্পর্শ বা গ্রহণ করবেন না।"[৬] আবার আমেরিকার ধর্মমহাসভায় যোগদান ও তার জন্য অর্থজনিত চিন্তার কথা স্বামীজী জুনাগড়ের জনৈক উকিল শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে বসবাসকালে একদা ব্যক্ত করেন। স্বামীজীর অন্যতম জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখছেন – "শিকাগো-ধর্মসভায় যোগদানের যে অভিপ্রায় স্বামীজীর অন্তঃকরণে জুনাগড় ও পোরবন্দরে অঙ্কুরাকারে উদ্গত হইয়াছিল, এখানে তাহা আরও বর্ধিতাকারে আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি শুনিয়াছিলেন, পরবৎসর (১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে) ঐ সভার অধিবেশন হইবে এবং বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি উহাতে সমবেত হইবেন, তাই ঐ বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি হরিদাসবাবুকে একদিন বলিলেন, 'কেউ যদি আমার যাতায়াতের খরচ দেয় তো সব ঠিক হয়ে যাবে এবং আমি যেতে প্রস্তুত।' "[৭] যাই হোক শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই যে মূলত মহিশূর, রামনাদ ও খেতড়ির মহারাজগণের বদান্যতায় এবং আলাসিঙ্গা প্রমুখ শিষ্যবৃন্দের টাকা জোগাড়ের মাধ্যমে স্বামীজীর আমেরিকা গমনের পথ প্রশস্ত হয় ও শেষ পর্যন্ত স্বামীজী ধর্মসভায় যোগদানের নিমিত্ত আমেরিকা মহাদেশে উপস্থিত হন।

আমেরিকায় পৌঁছে স্বামীজী কী দেখলেন? দেখলেন সেখানকার ভয়াবহ শীত, জিনিষপত্রের প্রচণ্ড দাম, আর সম্পূর্ণ অপরিচিত জনতা। তাছাড়া যে কাজের জন্য তাঁর

আমেরিকায় আগমন সেই ধর্ম-মহাসভার প্রতিনিধি নির্বাচনের তারিখ পেরিয়ে গেছে। ফলে তিনি প্রচণ্ড সমস্যায় পড়লেন। কিন্তু তিনি যে অন্য ধাতুতে গঠিত। সহজে হাল ছেড়ে দেওয়া তো তাঁর স্বভাব নয়। উপায় খুঁজতে লাগলেন। আর খরচ কিছুটা কমানোর জন্য শিকাগো ছেড়ে অপেক্ষাকৃত কম খরচের জায়গা বোষ্টনে এসে থাকবেন বলে স্থির করলেন। আর সেই বোষ্টন যাবার সময়ই ট্রেনে মিস কেট স্যানবর্ণ নামে এক বৃদ্ধার সাথে তাঁর আলাপ হয়। আর সেই প্রথম আলাপেই বৃদ্ধা তাঁকে নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যান। অযাচিতভাবে এইরকম একটি সুযোগ এসে যাওয়ায় স্বামীজী আর দ্বিতীয়বার চিন্তা না করেই বৃদ্ধার বাড়িতে উপস্থিত হন। তবে মিস স্যানবর্ণ স্বামীজীর পাণ্ডিত্যের প্রতি যত না আকর্ষিত হয়েছিলেন তার চেয়ে ঢের বেশি আকর্ষিত হয়েছিলেন স্বামীজীর ওই অদ্ভুত বেশভূষায়। তিনি তাঁর স্বদেশীয় বন্ধুবর্গকে প্রাচ্যদেশ থেকে আগত এক 'অদ্ভুত জীব'-কে দেখানোর জন্যই যেন স্বামীজীকে তাঁর বাড়ীর অতিথি করেছিলেন। স্বামীজীর নিজের কথায় শোনা যাক সেই কাহিনি – "আমি এক্ষণে বস্টনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধ মহিলার অতিথিরূপে বাস করিতেছি। ইঁহার সহিত রেলগাড়িতে হটাৎ আলাপ হয়। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকট রাখিয়াছেন। এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে; আর তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন!!!" [৮] স্বামীজীর কাছে নিঃসন্দেহে এ ছিল এক নিদারুন যন্ত্রণা স্বরূপ। কিন্তু তিনি তাঁর লক্ষ্যে অবিচল আর তিনি জানেন "যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়" [৯]। আর তাই তিনি লিখছেন – "এ সব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেই। আমাকে এখন অনাহার, শীত, অদ্ভুত পোশাকের দরুন রাস্তার লোকের বিদ্রূপ – এইগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে। প্রিয় বৎস! জানিবে। কোন বড় কাজই গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার ব্যতীত হয় নাই।" [১০] তাই শত কষ্টের মধ্যেও স্বামীজী কখনও ধৈর্যচ্যূত হননি। ইতিমধ্যে তিনি পরিচিত হন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক জে এইচ রাইট মহাশয়ের সাথে। স্বামীজীর অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ রাইট সাহেব মন্তব্য করেন – "To ask you, Swami, for your credentials is like asking the sun about its right to shine" [১১] অর্থাৎ স্বামীজীর নিকট নিদর্শন চাওয়া আর সূর্যকে তাহার কিরণ দিবার অধিকার কি জিজ্ঞাসা করা – একই কথা। অধ্যাপক রাইট অতঃপর স্বামীজীকে ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি করার জন্য তাঁর বন্ধু তথা ধর্ম-মহাসভার প্রতিনিধি-নির্বাচন-সভার সভাপতির উদ্দেশ্যে লেখেন, "Here is a man more learned than all our learned professors put together" [১২] অর্থাৎ স্বামীজীর বিদ্যা আমেরিকার সকল অধ্যাপকদের একত্রিত বিদ্যার চেয়েও অনেক বেশি। তিনি স্বামীজীকে শিকাগো যাবার একটি টিকিটও কিনে দেন। মুগ্ধ স্বামীজী কৃতজ্ঞ চিত্তে রাইট সাহেবের নিকট থেকে বিদায় নেন।

তবে ঘটনা এখানেই শেষ নয়। স্বামীজীর ধর্মমহাসভায় যোগদানের ইতিহাস ঠিক সিনেমার কাহিনির মতো। অধ্যাপক রাইটের দেওয়া পরিচয় পত্র তিনি শিকাগোগামী ট্রেনে হারিয়ে ফেলেন, সুতরাং শিকাগোতে পৌঁছে তাঁকে আরও অনেক সমস্যার মুখে পড়তে

হয়। তাঁর সাথে মুখোমুখি কথা বলতে কেউ রাজি নয়। স্বামীজীর অদ্ভুত পোষাকও মানুষজনের মধ্যে একটা আলাদা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সর্বোপরি শিকাগোতে নেমে স্বামীজী যে এলাকায় পৌঁছান উক্ত এলাকাটি জার্মান অধ্যুষিত হওয়ায় স্বামীজীর বাক্যালাপেরও অসুবিধা হয়। নিতান্ত নিরূপায় হয়ে দিনের শেষে স্বামীজী রেলের একটি ওয়াগণের ভেতর আশ্রয় নিয়ে রাত্রি কাটাতে বাধ্য হন। অভূক্ত অবস্থায় সারারাত্রি কাটানোর পর পরেরদিন সকালে নিকটবর্তী এলাকাতে ভিক্ষার জন্য বের হন। কিন্তু আমেরিকাতে কেই বা তাঁকে ভিক্ষা দেবে? অনেক ঘোরাঘুরির পরেও খাবার জোগাড় করতে না পেরে ক্লান্ত, অবসন্ন স্বামীজী ফুটপাতের উপর বসে পড়েন এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট সমর্পণ করেন। ঠিক সেই সময়ই সামনের বাড়ি থেকে এক সহৃদয় মহিলা এসে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি কি না। স্বামীজীর সব কথা শোনার পর ঐ মহিলা যথোচিত মর্যাদা সহকারে স্বামীজীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং তাঁকে প্রাতরাশ করান ও তাঁর দেখাশোনা করেন। স্বামীজীর বিশ্রামলাভের পর তিনি স্বয়ং তাঁকে নিয়ে ধর্ম-মহাসভার সভাপতি ডক্টর ব্যারোজের নিকট উপস্থিত হন। ওই সহৃদয় মহিলা হলেন মিসেস জর্জ ডাব্লিউ এল যিনি ডক্টর ব্যারোজের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। এরপর স্বামীজী যথেষ্ট মর্যাদা সহকারে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে গৃহীত হন এবং মিস্টার ও মিসেস জন বি লায়নের বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। এই হেল পরিবার ও লায়ন পরিবারের সাথে স্বামীজীর সখ্যতা আজীবন বজায় ছিল। এরপর স্বামীজীকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। তিনি আরও একবার উপলব্ধি করেন তাঁর গুরুদেব তাঁর সাথে সাথেই আছেন। স্বামীজী ধর্ম-মহাসভায় যোগ দেন আর জগতের নিকট তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কর্তৃক প্রদর্শিত বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শ জগতের নিকট তুলে ধরেন।

১১ সেপ্টেম্বর বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। আর সেই প্রথম প্রকাশেই তিনি যেন সকলের মন জয় করে নিলেন। অখ্যাত ভারতীয় সন্ন্যাসী রাতারাতি হয়ে উঠলেন বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ। এর পরের বক্তৃতাগুলিতে যেন ভিড় আছড়ে পড়তে লাগল। মাত্র কয়েক মিনিটের বক্তৃতা শোনার জন্যও শ্রোতৃবর্গ আকুল আগ্রহে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকত। এরপর স্বামীজী ১৫ সেপ্টেম্বর 'Why We Disagree' শীর্ষক একটি ছোট্ট বক্তৃতা দেন যার মূল বিষয় হল ভ্রাতৃভাব, আর এই বক্তৃতাতেই স্বামীজী তাঁর সেই বিখ্যাত 'কুয়োর ব্যাঙ' এর গল্পটি বলেন। শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর দেওয়া মূল বক্তৃতাটি ছিল ১৯ সেপ্টেম্বর যেদিন তিনি 'Paper on Hinduism' শীর্ষক একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। এরপর ২০ সেপ্টেম্বর 'Religion Not the Crying Need of India' এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর 'Buddhism, the Fulfilment of Hinduism' শীর্ষক দুটি বক্তৃতা দেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ধর্ম-মহাসভার বিদায়ী অধিবেশনেও স্বামীজী একটি ছোট্ট বক্তৃতা দেন যা শেষ করেন এই বলে – "…upon the banner of every religion will soon be written, in spite of resistance : "Help and not Fight," "Assimilation and not Destruction," "Harmony and Peace and not dissension." "[১৩] আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে তাঁর স্তুতি বেরোতে লাগল। আমেরিকার বিখ্যাত সংবাদপত্র 'Chicago

Times' ১২ সেপ্টেম্বর লিখল "The face and dress which attracted the most notice especially from the ladies, was that of Swami Vivekananda, a young man exceptionally handsome and with features that would command attention anywhere. His dress was bright orange, and he wore a long coat and regulation turban of that color. Vivekananda is a Brahmin monk, and Prof. Wright of Harvard is quoted as saying that he is one of the best educated men in the world."[১৪] অপর সংবাদপত্র 'Chicago Advocate' লিখল (২৮ সেপ্টেম্বর) – "In certain respect the most fascinating personality was the Brahmin monk, Swami Vivekananda with his flowing orange robe, saffron turban, smooth-shaven, shapely, handsome face, large, dark subtle penetrating eye, and with the air of one being inly-pleased with the consciousness of being easily master of his situation. His knowledge of English is as though it were his mother tongue."[১৫]

বস্তুত স্বামীজী যেন 'এলেন, দেখলেন আর জয় করে নিলেন' লক্ষ লক্ষ বিশ্ববাসীর হৃদয়। শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজী যে মহাসত্য তথা যে আশার বাণী তুলে ধরলেন জগত যেন তার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে ছিল। ইংরাজী জীবনীকারগণের মতে যীশুখ্রীষ্টের পর আর কেউ এইরকম ওজস্বিনী ভাষায় আশার বাণী প্রচার করেননি। সতেরো দিন চলা ধর্ম-মহাসভায় সহস্রাধিক প্রবন্ধ পঠিত হলেও স্বামীজীর মতো প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য আর বিশেষ লক্ষ করা যায়নি। অন্যান্য বক্তাগণের অধিকাংশ প্রবন্ধই ছিল নীরস ও অসার। সুতরাং এই সমস্ত নীরস বক্তব্য শুনতে শুনতে শ্রোতৃবর্গ যখন ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠত, সেই সময় সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করতেন – "সবশেষে স্বামী বিবেকানন্দ ৫|১০ মিনিট বক্তব্য রাখবেন।" আর তা শোনার জন্যই শ্রোতৃমণ্ডলী ধৈর্যসহকারে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করত। স্বামীজীর বাংলা জীবনীকার 'বস্টন ইভিনিং ট্রান্সক্রিপ্ট' নামক সংবাদপত্রে উল্লিখিত খবরের বাংলা তর্জমা করে লিখলেন – "ধর্ম-মহাসভায় অধ্যক্ষেরা লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দকে রাখিয়া দিতেন। যদি কোন গরমের দিন – কোন নীরস বক্তা বেশীক্ষণ ধরিয়া বকিলে শত শত লোক চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিত, সভাপতি অমনি উঠিয়া বলিতেন, 'স্বস্তিবাক্য-উচ্চারণের অব্যবহিত পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিবেন।' আর কথা নাই, সেই শত শত ব্যক্তি শান্তভাবে অপেক্ষা করিতেন। এইরূপে কলম্বস হলের চারি সহস্র শ্রোতা শেষকালে বিবেকানন্দের পনর মিনিট বক্তৃতা শুনিবার জন্য সহাস্য বদনে দুই ঘন্টা হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত ও অবিরাম পাখা নাড়িত। সভাপতি 'যত শেষ তত বেশ' – এই প্রাচীন নীতিটি বেশ বুঝিতেন।"[১৬]

এইভাবে একজন অখ্যাত তথা অপরিচিত সন্ন্যাসী শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বীয় প্রতিভাবলে হয়ে উঠলেন এক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তাঁর নাম লোকের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল। শিকাগো শহরের নানা স্থানে শোভা পেতে লাগল তাঁর প্রতিকৃতি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত তাঁর পদতলে বসে শুনতে লাগল ভারতীয় বেদান্তের সেইসব অশ্রুতপূর্ব মর্মকথা তথা এক বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে চাপরাশ দিয়েছিলেন সেদিনের সেই অখ্যাত মানুষটিকে যেন নুতন পরিচয় পত্র দিল এই শিকাগো ধর্ম-মহাসভা যাঁরা তাদের 'প্রফেট'-কে মুহূর্তে চিনে নিলেন। তাঁদের উপলব্ধি 'ইনি হয়

বুদ্ধ, নয় যীশু'। আর স্বামীজীও উজাড় করে দিলেন তাঁর বেদান্তের জ্ঞান-ভাণ্ডার। পরিস্কার আকাশে সহসা কালবৈশাখীর আবির্ভাবের মতই অখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে উঠলেন 'The Cyclonic Hindu Monk of India', আর সেই ঝড়ে বিশ্ব থেকে বিদায় নিতে থাকল সংকীর্ণ মানসিকতা, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সমাজের আনাচে কানাচে প্রচলিত হাজারো কু-সংস্কার; পরিবর্তে এল বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, বিশ্বশান্তি ও ঐক্যবোধের ধারণা এবং সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের মহান আদর্শ যা যুগ যুগ ধরে মানুষকে পথ দেখাতে সক্ষম।

তথ্যসূত্র :

১। Swami Vivekananda in the West New Discoveries, Vol. I, Marie Louise Burke, Advaita Ashrama, April-2013, p. 81
২। স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, উদ্বোধন কার্যালয়, জুন-২০১০, পৃ. ৪
৩। Swami Vivekananda in the West New Discoveries, Vol. I, Marie Louise Burke, Advaita Ashrama, April-2013, p. 14
৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, আগষ্ট-২০১০, পৃ. ৮৯
৫। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মণ্ডল বুক হাউস, আগষ্ট-২০১৪, পৃ. ৮
৬। স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, উদ্বোধন কার্যালয়, জুন-২০১০, পৃ. ৭৬
৭। যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, এপ্রিল-২০০৭, পৃ. ২৮৫
৮। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, আগষ্ট-২০১০, পৃ. ২৮৪
৯। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, আগষ্ট-২০১০, পৃ. ২০৮
১০। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, আগষ্ট-২০১০, পৃ. ২৮৪
১১। Swami Vivekananda : A Biography, Swami Nikhilananda, Advaita Ashrama, May-2012, p. 128
১২। Swami Vivekananda : A Biography, Swami Nikhilananda, Advaita Ashrama, May-2012, p. 128
১৩। The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol – 1, Advaita Ashrama, January-2009, p. 24
১৪। Swami Vivekananda in the West New Discoveries, Vol. I, Marie Louise Burke, Advaita Ashrama, April-2013, p. 87
১৫। Swami Vivekananda in the West New Discoveries, Vol. I, Marie Louise Burke, Advaita Ashrama, April-2013, p. 87
১৬। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম ভাগ, প্রমথনাথ বসু, উদ্বোধন কার্যালয়, সেপ্টেম্বর-২০১৭, পৃ. ৩২৫